নজরুল-কাব্যে প্রেম ও প্রকৃতির স্বরূপ

রহিমা খাতুন

এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এপ্রিল, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল-কাব্যে প্রেম ও প্রকৃতির স্বরূপ

(LOVE AND NATURE IN NAZRUL'S POETRY)

রহিমা খাতুন

এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এপ্রিল, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল-কাব্যে প্রেম ও প্রকৃতির স্বরূপ

(এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ)

তত্ত্বাবধায়ক,	গবেষক,
ড. হোসনে আরা	**রহিমা খাতুন**
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ	রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ১৩২
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	শিক্ষাবর্ষ: ২০১৭-২০১৮
	বাংলা বিভাগ,
	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এপ্রিল, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে এম.ফিল. ডিগ্রি অর্জনের জন্য **'নজরুল-কাব্যে প্রেম ও প্রকৃতির স্বরূপ'** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এবং গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক ডক্টর হোসনে আরা, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ-এঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অভিসন্দর্ভটি আমার একক ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো ডিগ্রি অর্জন বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে আমার এ অভিসন্দর্ভটি পূর্ণ বা আংশিক রূপে উপস্থাপিত হয়নি।

রহিমা খাতুন
এম.ফিল গবেষক
বাংলা বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

আমি ঘোষণা করছি যে রহিমা খাতুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে এম.ফিল. ডিগ্রি অর্জনের জন্য **'নজরুল-কাব্যে প্রেম ও প্রকৃতির স্বরূপ'** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছেন। অভিসন্দর্ভটি একটি একক ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। এ বিষয়টি নিয়ে পূর্বে কেউ পূর্ণাঙ্গ গবেষণা করেননি। অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো ডিগ্রি অর্জন বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে তার এ অভিসন্দর্ভটি পূর্ণ বা আংশিক রূপে উপস্থাপিত বা প্রকাশিত হয়নি।

(অধ্যাপক ড. হোসনে আরা)

বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সাহিত্য পড়বার আকণ্ঠ তৃষ্ণা এবং সাহিত্যের প্রতি গভীর ভালোবাসা থেকেই বাংলা সাহিত্যে প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা করা এবং বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সৎ, সাহসী, প্রথাবিরোধী কণ্ঠস্বর নজরুলকে নিয়ে আরো খানিকটা পড়বার নিমিত্তেই এম.ফিল কোর্সে ভর্তি হওয়া। কিছু জাগতিক প্রাপ্তির চিন্তা যে একান্তই ছিল না তা বলা যাবে না। এই যাত্রায় যিনি কর্ণধার হয়ে সাথে ছিলেন, যাঁর স্থিতপ্রজ্ঞ নমনীয়-স্নেহময় নির্দেশনায় এতোটা পথ পাড়ি দেয়া গিয়েছে তিনি আমার গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক ডক্টর হোসনে আরা। আমি হাল ছেড়ে দিব দিব অবস্থায়ও যিনি সাহস এবং প্রেরণা দিয়ে আমাকে এগিয়ে নিয়েছেন। বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলীদের অনেকেই বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, নির্দেশনা দিয়েছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। বিভাগের শ্রদ্ধেয় বড় আপু নীপা জাহান বিভিন্ন সময়ে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন, তাঁর কাছে ঋণী। বিভাগের সেমিনার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র লাইব্রেরি, নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী ছাত্রীনিবাস গ্রন্থাগার, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি গ্রন্থাগারসহ যেসকল গ্রন্থাগার থেকে গ্রন্থ সহায়তা নিয়েছি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। সর্বংসহা মা, ভাই-বোনসহ আত্মীয় পরিজন, বন্ধুস্বজন অনেকেই এই কর্মযজ্ঞের জন্য সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, বিভিন্ন সময়ে সয়ে নিয়েছেন আমাকে তাঁদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ। সর্বোপরি, মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে সকল প্রাপ্তির জন্য অশেষ শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা জানাই, তাঁর অপরিসীম দয়ার জন্যই এই পথচলা, সকল প্রশংসা তাঁর জন্যই।

রহিমা খাতুন

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণাপত্রের 'এ্যাবস্ট্রাক্ট'

শিরোনাম: নজরুল-কাব্যে প্রেম ও প্রকৃতির স্বরূপ

(Love and Nature in Nazrul's Poetry)

গবেষক

নাম: **রহিমা খাতুন**

শিক্ষাবর্ষ: ২০১৭-২০১৮

রেজিষ্ট্রেশন নাম্বার: ১৩২

বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

নাম: **ড. হোসনে আরা**

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যাকাশের এক বিস্ময়কর নক্ষত্র। বিস্ময়কর এই নক্ষত্রের যে সকল ক্ষেত্রে অবাধ বিচরণ ছিল তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কবিতা। তাঁর কবিতার দুটি প্রধানতম শাখার একটি প্রেম ও প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা। যে সময়ে নজরুলের ভারতবর্ষে আবির্ভাব সে সময় ভারতীয় উপমহাদেশ সহ অধিকাংশ পৃথিবী ঔপনিবেশিকতা নামক এক কালসাপের করাল গ্রাসে আচ্ছন্ন ছিল। নজরুল এই প্রেক্ষাপটে এনেছিলেন ব্যক্তি মানুষসহ, সামাজিক রাজনৈতিক, ধর্মীয় মুক্তির বার্তা। এর সাথে যে প্রধান সুরটি তাঁর কাব্যবীণায় বেজেছিল তা তাঁর হৃদয়ের গভীর প্রদেশের। খানিকটা আড়ালে থেকে যাওয়া এ প্রদেশে খানিকটা আলো ফেলার প্রয়াস এবং নজরুলকে আরো একটু জানবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এই অন্বেষণ যাত্রার শুরু।

পরিসরে স্বল্প হলেও প্রেমের যে কবিতাগুলো নজরুলে পাওয়া যায় তা কোনো তত্ত্বাক্রান্ত নয়, নয় কোনো আরোপিত বাণী। কবিতার শব্দে শব্দে উঠে এসেছে নজরুল-হৃদয়ের আকর-ধ্বনি। সেই ধ্বনি কালপ্রবাহে হয়ে উঠেছে বিশ্বমানবের সর্বজনীন হৃদয়-কথার প্রতিধ্বনি। 'ছায়ানট'-'দোলন-চাঁপা'র তাঁর প্রথম সময়ের কবিতাগুলোতে যেমন থরোথরো আবেগ ধরা দেয়, শেষের দিকের 'নতুন চাঁদ' বা 'শেষ সওগাত'-এর কবিতাগুলোতে একটু প্রাজ্ঞতার প্রলেপ পড়েছে মাত্র। নজরুলীয় মূল বৈশিষ্ট্যগুলো পূর্বাপর সকল কবিতাতে প্রায় একই।

প্রেমের কবিতায় নজরুল মূলত চোখের জলের কবি। তবে বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিক বিরহ আর নজরুলের বিরহ এক নয়। তিনি কাঁদেন বটে কিন্তু ভেঙে পরেন না। পুরুষ হিসেবে নারীর প্রেমকে তিনি স্বীকার করেছেন, মূল্যায়ন করেছেন, নিজেকে সমর্পণ করেছেন। বিপরীতে আহত যেখানে হয়েছেন প্রবলভাবে আক্রমণও করেছেন। প্রচণ্ড হৃদয়াবেগ মিশ্রিত কবিতাগুলোতে অনেক সময়ই বিভিন্ন উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত উপাদানের ছাপ পাওয়া যায়। পারস্য সুফিবাদের প্রভাব যেমন আছে, আছে ভারতীয় বৈষ্ণবীয় প্রেমতত্ত্বের প্রভাব। এসব উপাদানের আড়ালে তাঁর একান্তই নিজস্ব মনকথাই যেন কবিতার মূল কথা।

বিরহের কবি তাঁর কবিতায় স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি নিজেই নিজের ব্যথা করেন সৃজন। এই সৃজিত ব্যথায় তিনি প্রায় সর্বদাই অতৃপ্ত, বুভুক্ষু। তাঁর এই সদা অতৃপ্ত প্রেমের প্রিয়া কখনো এই পাশ দিয়ে হেটে ফেরা সাধারণ মেয়েটা যাকে আমরা সচরাচরই দেখতে পাই। কখনো সে এক কল্পলোকের নির্মিত মানবী যাকে নজরুল কখনো খুঁজে পাননি, যেমন পায়না কেউই।

প্রেমের কথকতাকে শব্দ দিতে গিয়ে যে সকল উপাদানের আশ্রয় কবি নিয়েছেন তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে অসীম প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় উপাদান। মনের দোসর খুঁজতে খুঁজতে তিনি স্থিত হয়েছিলেন নিঃসীম প্রকৃতির বুকে, যেমন করে স্থিত হয় সকল অন্বেষী সত্তা। প্রকৃতির উপাদানে কখনো তিনি নিজেকেই প্রোথিত করেছেন। একলা পাখি, ভগ্ন-পক্ষ চক্রবাক যেন নজরুলেরই প্রতিরূপ। উত্তাল বা শান্ত সমুদ্র, জানালার পাশের সুপারি গাছের সারি, আকাশে দীপ্যমান একলা চাঁদ সবই এসেছে তাঁর কবিতার অনুষঙ্গ হয়ে। নজরুল মর্মে মর্মে একজন রোমান্টিক কবি ছিলেন, আর রোমান্টিক কবিদের সকলেই প্রকৃতির কোলেই আশ্রয় নিয়েছেন। প্রকৃতির পটেই তাঁরা এঁকেছেন তাঁদের বিরহব্যথা, হৃদয়কথা।

নজরুলের কবিতার অন্যতম শক্তিমত্তার জায়গা হচ্ছে তাঁর নিরেট অকৃত্রিমতা। তিনি একান্তই নিজস্ব আবেগের শতভাগ সৎ কবি। নজরুলের ভাব যেমন সমকাল এবং পরবর্তী কালের প্রায় সকলের চেয়ে আলাদা, তেমনি স্বতন্ত্র তাঁর ভাষাও। তাঁর গান, কবিতা, প্রবন্ধ প্রভৃতি থেকে অনায়াসেই তাঁর অকৃত্রিম প্রবণতাগুলো বের করে ফেলা যায়। তিনি নিজেই একটা সাহিত্যিক ধারার প্রবর্তক এবং একমাত্র তিনিই যেন এর অনুসারী। তাঁর এই অনন্যতাকে অনুসরণ বা অনুকরণ করতে পেরেছেন কম জনই।

সর্বোপরি, মানুষের হৃদয়ের যে বহুমাত্রিক অনুভূতি সেই অনুভূতির সৎভাষ্যই যেন নজরুলের প্রেমের কবিতাগুলো। প্রেমপ্রকাশে হৃদয়ের দোসর হিসাবে অনিবার্যভাবেই এসেছে প্রকৃতির বিভিন্ন অনুষঙ্গ। প্রেম-প্রকৃতি বিষয়ক কাব্যের কবিতাগুলো হয়ে উঠেছে ব্যক্তি নজরুলকে ছাপিয়ে সকল মানুষের হৃদয়কথা।

–●–●●–●–

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	অধ্যায় / পরিচ্ছেদ নম্বর	অধ্যায় / পরিচ্ছেদের নাম	পৃষ্ঠা ব্যাপ্তি
০১.		প্রারম্ভিক কথা	০১-০৩
০২.	অধ্যায় এক	নজরুল-পূর্ব কবিতায় প্রেম-প্রকৃতি	০৪-১৪
০৩.	অধ্যায় দুই	প্রেম-প্রকৃতির কবিতায় নজরুলের পূর্বঋণ	১৫-২৩
০৪.	অধ্যায় তিন	নজরুলীয় প্রেমের ধরন	২৪-৩১
০৫.	অধ্যায় চার	নজরুলের প্রকৃতি চেতনার ধরন	৩২-৩৬
০৬	অধ্যায় পাঁচ	রোমান্টিকতা ও নজরুল	৩৭-৪৮
০৭.	অধ্যায় ছয়	প্রেম ও প্রকৃতি বিষয়ক কাব্যালোচনা	
০৮.	পরিচ্ছেদ এক	দোলন-চাঁপা	৪৯-৮৯
০৯.	পরিচ্ছেদ দুই	ছায়ানট	৯০-১৩৪
১০.	পরিচ্ছেদ তিন	সিন্ধু-হিন্দোল	১৩৫-১৬১
১১.	পরিচ্ছেদ চার	চক্রবাক	১৬২-১৯৬
১২.	পরিচ্ছেদ পাঁচ	পূবের হাওয়া	১৯৭-২০৩
১৩.	পরিচ্ছেদ ছয়	জিঞ্জির, নতুন চাঁদ , বার্ষিক সওগাত,	২০৪-২২৫
১৪.	অধ্যায় সাত	প্রেম-প্রকৃতির কবিতায় নজরুলের প্রবণতা ও স্বাতন্ত্র্য	২২৬-২৩১
১৫.		যবনিকা	২৩২-২৩৪
১৬.		তথ্যসূত্র	২৩৫-২৪১

প্রারম্ভিক কথা

বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) বিপ্লব, বিদ্রোহ, সাম্যবাদ, বা মানবতাবাদের কবি হিসেবেই সমধিক পরিচিত। তিনি যে একজন শক্তিমান প্রেমের কবি এ দিকটি খানিকটা অনালোকিতই রয়ে গেছে। বিচ্ছিন্নভাবে আংশিক আলোচিত হলেও তাঁর প্রেম-প্রকৃতির কবিতার উপর সামগ্রিক কোনো গবেষণা নেই। প্রেম মানুষের মৌল-মানবিক অনুভূতি এবং সর্বকালীন ও সর্বদেশীয় সাহিত্যেই এর প্রভাব ছিল, আছে এবং থাকবে। বিশিষ্ট নজরুল বোদ্ধাদের অনেকেই বলেছেন নজরুলের প্রবল প্রেমবোধ এবং সেখান থেকে প্রাপ্ত বিরহ-বেদনাই তাঁর বিদ্রোহের বীণায় ঝংকার তুলেছে। নর-নারীর প্রেমের প্রখর বোধ যেমন তাঁর ছিলো, তেমনি ছিলো আর্ত-মানবতার প্রতি গভীর মমতা। জীবনবোধ এবং শিল্পদৃষ্টি উভয় দিকের বিচারেই নজরুল ইসলাম ছিলেন একজন রোমান্টিক কবি। রোমান্টিক কবিদের প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য— নিপীড়িত মানবাত্মার প্রতি গভীর সহানুভূতি ও তৎজাত বিদ্রোহ এবং তীব্র প্রেমবোধ; এই উভয় বৈশিষ্ট্যই নজরুলের কবিতায় প্রবলভাবে উপস্থিত। একাধারে তিনি যেমন সমাজ, রাজনীতি ও ধর্মের অন্যায় ও কলুষিত দিক নিয়ে বিপ্লব-বিদ্রোহ ও সাম্যবাদের কবিতা লিখেছেন তেমনি লিখেছেন উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ নিয়ে প্রেমের কবিতাও। তাঁর রোমান্টিক মানসের কল্পজগতে তিনি যে সুন্দর সাম্যাবস্থার পৃথিবীর ছবি আঁকতেন বাস্তবে তার বিপরীত দেখে তাঁর কাঙ্ক্ষিত সমাজ নির্মাণে তিনি হাতে তুলে নিয়েছেন পরশুরামের কঠোর কুঠার, অন্যদিকে বাঞ্ছিত প্রেম না পেয়ে তিনি আর ধ্বংসাত্মক হয়ে নতুন প্রেমকাঠামো বিনির্মাণের পথে আগাননি, এখানে তিনি যেন এক পরাজিত সৈনিক। প্রেম, সে তো নিজেরই প্রতিরূপ; নিজের সাথে তো প্রতিপক্ষের অবস্থান নেয়া যায় না, নেননি নজরুলও। এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরি, আরেক হাতে রণতূর্য নিয়েই তিনি সাহিত্যজগতে প্রবেশ করেছেন। তাই তাঁর এক হাতকে বাদ দিয়ে আরেক হাতকে মূল্যায়ন করলে আংশিক মূল্যায়নই করা হবে।

নজরুলের সহজ-সুন্দর সাহিত্যকর্মের প্রতি গভীর বিমুগ্ধতা এবং তাঁর কবিতার এই অনালোকিত অংশে খানিকটা আলো ফেলবার নিমিত্তেই এই গবেষণা করা। প্রেমের

নানামাত্রিক দিকের মধ্যে বিরহ দিয়েই তাঁর কবিতা আচ্ছাদিত। মানুষকে তিনি ভালোবাসতেন, মানুষের অবমাননা তাঁকে যন্ত্রণা দিতো। তাঁর জীবন অধ্যয়ন করলে বোঝা যায় তিনি প্রেম দিতে এবং প্রেম পেতে এসেছিলেন। সেই প্রেম পাননি বলে তিনি অভিমান করেছেন। সেই প্রেম যে শুধুই নর-নারীর প্রেম তা নয়, বৃহদার্থে তা মানবপ্রেমও বটে। মানুষের প্রতি উৎপীড়ন-নিপীড়ন অনুভব করে লিখেছেন এক ধরনের কবিতা। মানব-মানবীকে কেন্দ্র করে যে প্রেম সে প্রেমের হৃদয়জাত যন্ত্রণায় তিনি ভুগেছেন, ভুগেছেন দেহজ যন্ত্রণায়। ফলে তাঁর কবিতায় হতাশা এসেছে, এসেছে ব্যর্থতা। অভিমান, অভিযোগ আর বঞ্চনার শাব্দিক অনুরণন যেন তাঁর প্রেম বিষয়ক প্রতিটি কবিতার শরীরে শরীরে গাঁথা। তিনি নিজের অনুভূতির প্রতি প্রচণ্ড সৎ থেকেছেন, কোথাও তিনি আরোপিত ভাব প্রয়োগ করেননি তাঁর কবিতায়। যে বঞ্চনা পেয়ে বা দেখে তিনি বিদ্রোহের কবিতায় কবিতার তীব্র প্রতিবাদের ঝড় তুলেছেন প্রেমে সেই বঞ্চনাই তাঁকে বানিয়েছে চির বিরহী। তবে বিরহী নজরুল কখনো বিরহে কাতর হয়ে ভেঙে পড়েন না, বিরহ তাঁকে করে শক্তিশালী এবং সবশেষে তিনি একটা আশাবাদ ধরে রাখেন। এই আশাই তাঁকে সঞ্জীবিত রেখেছিল, যেমন রাখে সকল মানুষকেই। হৃদয়ের এই গভীরতর অনুভূতি প্রেমকে প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি প্রথম দিকে প্রকৃতির আশ্রয় নিলেও পরবর্তীতে তাঁর প্রিয়া আর প্রকৃতি এক হয়ে গিয়েছে। তাঁর নিজের এবং প্রেমাস্পদের সত্তা প্রোথিত হয়েছে প্রকৃতির বিভিন্ন অনুষঙ্গে। নিজের মনোবেদনাকে তিনি সঞ্চারিত করে দিয়েছেন নিসর্গের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে। স্বর্গ-মর্ত-পাতাল আন্দোলিত করেছেন তিনি তাঁর হৃদয়াবেগের সাথে।

এই প্রকাশে তিনি দ্বারস্থ হয়েছেন ভারতীয় পুরাণ, মধ্যপ্রাচ্যীয় ঐতিহ্যসহ পূর্ববর্তী বিভিন্ন লেখক এবং লেখা কাঠামোর উপাদানের কাছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে উপাদান সংগ্রহ করলেও তা দিয়ে নজরুল নির্মাণ করেছেন একান্তই তাঁর নিজস্ব ধাঁচের শিল্প। কোনো আরোপিত কাঠামো নয়, তাঁর কবিতায় শিল্পরূপ পেয়েছে তাঁর অকৃত্রিম মনের সহজ আবেগ এবং রক্তমাংসের মানুষের বল্গাহীন মনের অসংযত রূপ। কোথাও বেঁধে দেয়া কবিতার কাঠামো নিষ্প্রাণ করেনি তাঁর একটা কবিতাকেও। প্রতিটা কবিতায় যেন ব্যক্তি নজরুল আর শিল্পী নজরুল একাকার হয়ে অবস্থান করছেন। এতো বছর পরেও তাঁর কবিতাগুলো পড়লে তাঁর মনের স্বরূপ আমাদের সামনে জীবন্ত হয়ে ওঠে। মনের যে

অব্যক্ত কথা, অপ্রকাশিত ব্যথা কাউকে পারেননি বলতে কোনোদিন; তারই শব্দরূপ দিয়ে গিয়েছেন তিনি কবিতার আঙ্গিকে ও গানের সুরে। 'দোলন-চাঁপা' কাব্যের ভূমিকা লিখতে গিয়ে 'দুটি কথা' শিরোনামে শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় যেমনটি বলেছিলেন 'তারপর একদিন যখন বাংলার যুবক আবার জলদমন্দ্রে বাধা-বন্ধহারা হয়ে স্বাধীনচিত্ত ভরে বাংলার চিরশ্যামল চিরঅমলিন মাতৃমূর্তি উন্মাদ আনন্দে বক্ষে টেনে নেবে, সেই শুভ আরতিলগ্নে ইমনকল্যাণ সুরে যে নহবতের রাগিণী বেজে উঠবে, তাতে হে কবি, তোমার প্রেম-বৈভব-গাথা—তোমার অন্তর-বহ্নি-ব্যথা সন্ধ্যা-রাগ রক্তে আপনি বেজে উঠবে; জননীর শ্যামবক্ষে তোমার স্মৃতি ব্যথা-ভারাতুর হয়ে সকল পূজার মাঝে বারেবারে তোমাকেই স্মরণ করিয়ে দেবে, — হে কবি, সে আজ নয়।' সে-ই 'আজ' আজ এসেছে। জাতীয়, রাষ্ট্রীয় এমনকি বৈশ্বিক সংকটে আজ আমরা উপলব্ধি করি একজন নজরুল কী চেয়েছিলেন এবং কী বলে গিয়েছিলেন। স্বকালে তিনি যেভাবেই মূল্যায়িত হন না কেন আজ সকল নিপীড়িত মানুষের মুখপত্র হয়ে যেন তাঁর কবিতাই ধ্বনিত হয়। এই মহান হৃদয়ের মানুষের অন্তর্যাতনাকে আমরা তাঁর প্রেমের কবিতার মধ্য দিয়ে দেখার চেষ্টা করব এবং শাশ্বত মানবের মনের সাথে সে বেদনার যোগসূত্র কোথায় সে জায়গাটাও খুঁজবার প্রচেষ্টা থাকবে।

অধ্যায় এক

নজরুল-পূর্ব কবিতায় প্রেম-প্রকৃতি

মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশের জন্য, বক্তব্য প্রকাশে আড়াল ব্যবহারের জন্য বক্তব্যে, লেখায় প্রাচীন সময় থেকেই প্রকৃতির শরণাপন্ন হয়ে এসেছে। প্রকৃতি সৃষ্টির আদি এবং মৌলিক উপাদান এবং প্রেমও মানুষের আদি এবং মৌল অনুভূতি। জৈব তাড়নার অনুভবের হৃদয়জাত টান থেকেই প্রেম ধারণার উদ্ভব। মানুষ প্রাণী বটে তবে তার শরীরী প্রক্রিয়া পশুদের মতো অবাধ নয়, সে তার জৈবিক চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং হৃদয়ের চর্চা করতে পারে। এই প্রবণতা থেকেই ভাষা পেয়েছে অচরিতার্থ বা চরিতার্থ প্রেমানুভব আর সেই প্রেমানুভবকে ভাষা দিতেই অবিচ্ছেদ্যভাবে এসেছে প্রকৃতির বিভিন্ন অনুষঙ্গ। বাংলা সাহিত্যেই যদি আমরা দেখি প্রাপ্ত প্রাচীনতম সাহিত্যিক দলিল 'চর্যাপদ'। এ গ্রন্থের প্রায় সকল পদেই কোনো না কোনো ভাবে প্রকৃতির অনুষঙ্গ এসেছে। অধিকাংশ পদেই বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনার গূঢ় তত্ত্ব বোঝাতে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে প্রকৃতির বিভিন্ন অনুষঙ্গ। যেমন একদম শুরুতে ১ নম্বর পদেই 'কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল'র মাধ্যমে সরাসরি শরীর/দেহকে তরুর সাথে তুলনা করে তার পাঁচটি ডাল বা ইন্দ্রিয়ের কথা বলা হচ্ছে। ৫ নং পদে বিশ্বসংসারকে বোঝাতে আনা হয়েছে নদীর প্রসঙ্গ। সুখ-দুঃখরূপী দুই তীরের মাঝখানে জীবন-নদী যেন বহমান। ৬ নম্বর পদে ভুসুকুপা নিজের শরীরকে তুলনা করছেন হরিণের শরীরের সাথে। হরিণ এখানে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আবার চর্যাপদের বিখ্যাত পদ ৩৩ নং পদে যে বালিকা পাহাড়ে বাস করে তার সাজসজ্জার অনুষঙ্গ প্রকৃতির এবং পাহাড়ের টিলায় বসবাসের কারণে তার যে দুঃখবেদনা তা প্রকাশিত হয়েছে। উপমায় এবং রূপকে প্রকৃতি এসেছে, এসেছে প্রেমের অনুষঙ্গ-ও চর্যাপদের বিভিন্ন পদে। ২৮ নম্বর পদের আধুনিক বাংলা তরজমা এমন দাঁড়ায় যে, 'উঁচু পর্বতে শবরী বালিকা বাস করে। তার মাথায় ময়ুরপুচ্ছ, গলায় গুঞ্জমালিকা। নানা তরু মুকুলিত হলো । তাদের শাখা প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত হলো । শবর- শবরীর প্রেমে পাগল হলো। কামনার রঙে তাদের হৃদয় রঙিন ও উদ্দাম । শয্যা পাতা হলো । শবর-

শবরী প্রেমাবেশে রাত্রিযাপন করল। এছাড়া ৩৩ নম্বর চর্যায় 'টিলার উপর আমার ঘর, কোন প্রতিবেশী নেই/ হাড়িতেও ভাত নেই, তবু নিত্য অতিথি আসে।' — এর দ্বারা নর-নারীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এছাড়াও মানব-মানবীর পার্থিব প্রেমের তীব্র আকুতিতে মূর্ত গুঞ্জরীপাদের একটি পদ —'যোগীনি, তোমাকে ছাড়া মুহূর্তকালও বাঁচবোনা/ তোমার মুখচুম্বন করে কমলরস (পদ্মমধু) পান করব ।' আবার ২ নম্বর চর্যায় চর্যাকার কুক্কুরীপা লিখেছেন 'দিবসহি বহুড়ী কাউ হি ডর ভাই।/ রাতি ভইলে কামরু জাই ॥' অর্থাৎ 'দিনের বেলায় যে গৃহবধূ কাকের ভয়ে ভীত থাকে, সেই বধূই রাতের বেলায় অভিসারে চলে যায়।' এভাবেই বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শনে প্রেম ও প্রকৃতি বিভিন্ন অনুষঙ্গের উপস্থিতি পাওয়া যায়।

পরবর্তী নিদর্শন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের মূল উপজীব্যই প্রেম এবং এই প্রেম প্রকাশের প্রধান পট অবশ্যই প্রকৃতি। আসলে প্রেম যেমন মানবমনের অবিচ্ছেদ্য অংশ তেমনি প্রকৃতিও এই ভুবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। রাধা-কৃষ্ণের আড়ালে বৈষ্ণব মতবাদে জীবাত্মা এবং পরমাত্মা বন্ধনের রূপকায়ন হলেও সাধারণ মন রাধাকে মানবী এবং কৃষ্ণকে মানব বিবেচনায় আপাতভাবেই এ কাব্যের রস আস্বাদন করে। রাধা-কৃষ্ণের নামের মধ্যেই আত্মস্থ হয়ে আছে দেব-ভাব, ভক্ত-ভগবানের প্রেম। যদিও এ কাব্যে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু এ প্রেম সর্বতোভাবে অতীন্দ্রিয় বা অলৌকিক প্রেমের স্পর্শহীন। এ কাব্যে কৃষ্ণ বার বার নিজেকে দেবতা বলে প্রচার করলেও বাস্তবে রাধা-কৃষ্ণ নিছক সমাজ সংসারে সংস্থাপিত দুটি নর-নারী চরিত্র। এ চরিত্র থেকে বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের খোলস ছাড়িয়ে নিলে নিছকই গ্রাম্য যুবক-যুবতীর চটুল প্রেমের কাব্য হিসেবেই সামনে আসে। এ কাব্যের রাধা-কৃষ্ণ রক্তমাংসে গঠিত এবং তাদের আচরণ, বাক্য, ব্যবহার সবই সাধারণ মানুষের মতোই। প্রেম এখানে তীব্র শরীরী আকর্ষণ নিয়ে উপস্থিত। সাধারণ তত্ত্ববিহীন পাঠক এটাকে মানবীয় প্রেমের কাব্য হিসেবে পড়েই স্বাচ্ছন্দ্য পাবেন, বোদ্ধা সাধক বা পাঠকদের প্রসঙ্গ ভিন্ন। কদম গাছ, যমুনা নদী, বর্ষা ঋতু, বৃন্দাবন, তাম্বুল, কালীয় নাগ এসকল প্রকৃতির অনুষঙ্গ এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য অবিচ্ছেদ্য সূত্রে গাঁথা। কদম গাছ আর যমুনা নদী যেন কৃষ্ণপ্রেমেরই প্রতিরূপ। আদিরসের আধিক্যসমৃদ্ধ এ

কাব্যটিতে শেষের দিকে করুণ রসেরই প্রাধান্য এসেছে। কৃষ্ণবিরহী রাধার যে বুকভাঙা আর্তনাদ সেটা যেন বাংলা সাহিত্যের এবং বাঙালি মননের ক্লাসিক বিরহ। তাই রাধাবিরহ হয়ে ওঠে সকল প্রিয়বঞ্চিত নারীহৃদয়ের প্রতিধ্বনি।

বাংলা সাহিত্যের শুরুর দিকের সম্পদগুলোর মধ্যে অনুবাদ সাহিত্য বেশ প্রভাব বিস্তার করেছে। পৌরাণিক কাহিনি নিয়ে যে ধর্মীয় অনুভূতিমূলক সাহিত্য রচিত হয়েছিল সংস্কৃত ভাষায় তার মধ্যে প্রথমেই আসে 'রামায়ণ'-এর নাম। বাল্মিকী রচিত সংস্কৃত ভাষার 'রামায়ণ'-এর প্রথম বাংলা অনুবাদ করেন কৃত্তিবাস ওঝা। বাংলার ঘরে ঘরে প্রবল ভক্তি নিয়ে তৎকালীন সময়ে রামায়ণ-কাহিনি পাঠ করা হতো। রামের নির্বাসন, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, সীতার নির্বাসন, প্রভৃতি বিষয় যুগপৎভাবে এসেছে প্রেমের এবং প্রকৃতির অনুষঙ্গে। বীররস, আদিরস, শান্তরসের পাশাপাশি করুণ রসের প্রাধান্য এসেছে কাব্যটিতে। সীতাবিহনে রামের বিলাপের অংশ:

"সীতার বিয়োগে মরি চিত্ত ধরিতে নারি
শুন প্রাণের ভাইরে লক্ষ্মণ।।
প্রাণের পরাণ সীতা জানকী জনকসুতা
প্রেম বিলাসিনী রসবতী।
হেন প্রেম নিবারিয়া কোথায় রহিলা গিয়া
ডাকিলে না দেহ অনুমতি।।
তোমা বিনে একেশ্বর তনু মোর জরজর
বিদরিয়া যায় মোর প্রাণ।
দারুণ মদন বাণে হৃদয় চাপিয়া হানে
শরে পূর্ণ অনঙ্গ কামান।।"[১]

রামায়ণে পৌরাণিক কাহিনির আড়ালে বাংলার প্রকৃতি, হৃদয়াবেগই মুখ্য হয়ে এসেছে এ গ্রন্থে।

বাংলা সাহিত্যের আরেক অনূদিত মহাকাব্য 'মহাভারত', যার মূল রচয়িতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং কাশীরাম দাসের অনুবাদে বাংলা ভাষাভাষী মানুষেরা এর স্বাদ আস্বাদন করেছে। ১৮ টি পর্বের ১৭,০০০ শ্লোকে রচিত এ মহাকাব্যে স্থান পেয়েছে নানা আখ্যান-উপাখ্যান। ধর্ম, প্রেম, রাজনীতি, যুদ্ধ, পরিবার, সমাজ প্রভৃতি নানান দিকের বয়ান আছে এ গ্রন্থে। পরবর্তীকালের বিভিন্ন লেখকেরা এ গ্রন্থের কাহিনি থেকে তাঁদের লেখার উপাদান সংগ্রহ করেছেন, ভিন্নভাবে লিখেছেন। মহাভারতের চরিত্র-কাহিনি হয়ে উঠেছে সাহিত্য ও জীবনের ক্লাসিক অনুষঙ্গ। এছাড়া, ভাগবত পুরাণও ছিলো কৃষ্ণবিষয়ক গ্রন্থ। এখানে 'রাসলীলা', 'বসন্তলীলা' প্রভৃতি বর্ণনায় শৃঙ্গার রস এবং মধুর রস যুগপৎভাবে এসেছে। এসব প্রেম-বর্ণনার ধারা ধরেই পরবর্তী প্রেমকাব্যগুলো তাদের পথ নির্মাণ করেছে।

মঙ্গলকাব্যেও এসেছে প্রেম ও প্রকৃতি। মনের আবেগ, আনন্দ, বিরহ প্রকাশ করতে প্রকৃতির আশ্রয় নিয়ে মঙ্গলকাব্যের কবিরা। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে ব্যাধ কালকেতু এবং তার স্ত্রী ফুল্লরার উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে। মাঝখানে কালকেতু বাজার থেকে স্বর্ণগোধিকা নিয়ে আসেন এবং স্বর্ণগোধিকার রূপে মূলত দেবী চণ্ডী আসেন এবং কালকেতুর বাড়িতে এসে তিনি নারীমূর্তি ধারণ করেন। সংসারের সহজাত নিয়মে স্ত্রী ফুল্লরা বিরহ-ব্যথায় আক্রান্ত হন। নায়িকাদের এমন দুঃখময় সময়ে কবিরা বারমাস্যার বর্ণনায় বার মাসের প্রেক্ষিতে দুঃখ বর্ণনা করতেন। তেমনি এক বর্ণনা:

"আষাড়ে গর্জএ ঘন নাচএ মউর
নবজলমদ-মত্ত ডাকএ দাদুর।...
সঙ্কট সময় বড় ধারা শ্রাবণ
সাধ লাগে অঙ্গে দিতে রবির কিরণ।...
ভাদ্রপদ মাসে বড় দূরন্ত বাদল
নদন্দী একাকার আট দিগে জল।"[২]

'মনসামঙ্গল' কাব্যেও প্রেমের প্রসঙ্গ আছে, আছে প্রকৃতির অনুষঙ্গ। মধ্যযুগের সাহিত্যের অন্যতম শক্তিশালী ধারা ছিলো অনুবাদ সাহিত্য। মধ্যযুগে অনুবাদকৃত রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো দৌলত উজির বাহরাম খাঁর 'লায়লী-মজনু'

(মূল লেখক : ইরানী কবি জামি), শাহ মুহম্মদ সগীরের ‘ইউসুফ-জোলেখা’ (মূল : মহাকবি ফেরদৌসী), মহাকবি আলাওলের ‘পদ্মাবতী’ (মূল : মালিক মুহম্মদ জায়সীর ‘পদুমাবৎ’), দোনা গাজী, আলাওল, মালে মুহাম্মদের ‘সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামান’ (আদি উৎস : আলিফ লায়লা), 'শিরি-ফরহাদ' প্রমুখ। মধ্যযুগের 'লায়লী-মজনু', 'ইউসুফ-জোলেখা', 'পদ্মাবতী', 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল' এই চারটি প্রণয়োপাখ্যানই খুব বেশি প্রভাবশালী ছিল। যদিও কবিরা এসব উপাখ্যান অনুবাদ করেছেন কিন্তু সেগুলোকে তারা অনুবাদের পারঙ্গমতায় প্রায় মৌলিক পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। তারা প্রয়োজনে কাহিনীর সঙ্কোচন ও সংযোজন করেছেন। সৃষ্টি করেছেন নতুন চরিত্রও। এ অনুবাদ হুবহু অনূদিত না হয়ে ভাবানুবাদ হয়েছে বিধায় মূল রচনার পরিবেশ ও প্রতিবেশ বদলে দিয়েছেন লেখকরা। তার পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে আমাদের চিরচেনা প্রকৃতি ও পরিবেশ। এখানে আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে যেমন ধর্মতত্ত্ব ছিল, তেমনি মধ্য যুগের সাহিত্যে ছিল দেবী বন্দনা, যেটি প্রত্যক্ষভাবে আধ্যাত্মিকতাকেই স্থান করে দেয়। ধারণা করা হয়, আমাদের অনুবাদকৃত সাহিত্যগুলো সুফিদের সৃষ্টি। আর সুফিদের সৃষ্টিতে আধ্যাত্মিকতার মিশেল থাকবে এমনটাই স্বাভাবিক। খানিক আধ্যাত্মিক মিশেল দিয়ে মানব-মানবীর প্রেমের যে দারুণ উপাখ্যান রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানে বর্ণিত হয়েছে তার শিল্পমূল্য অনেক। এগুলোতে মানব-মানবীর রূপতৃষ্ণা, মিলন-বিরহ, হতাশা, ক্রোধ, নিষ্ঠাবান প্রেম, প্রেমের জন্য ত্যাগ, দুঃখভোগ ইত্যাদিরই প্রাধান্য আছে। এসকল আখ্যান পরবর্তী লেখকদের লেখার রসদ জুগিয়েছে।

পরবর্তীকালে পদাবলী সাহিত্যেও যুগপৎভাবে এসেছে প্রেম ও প্রকৃতির অনুষঙ্গ। এখানেও রাধা-কৃষ্ণের রূপকের অন্তরালেই মানবপ্রেমই প্রকাশিত হয়েছে। তখনকার সময়ে কানু ছাড়া গীত ছিলো না বললেই চলে। ফলে, মানুষ এক রাধা-কৃষ্ণকে অবলম্বন করেই মনের প্রেমভাব প্রকাশ করতেন। অবলম্বন রাধা-কৃষ্ণ হলেও সেখানে কোনো তত্ত্ব নয়, মানুষের হৃদয়াবেগই প্রকাশিত। আর এই প্রকাশে অনিবার্য ভাবেই প্রকৃতির আশ্রয় নিয়েছেন কবিরা। তবে সে প্রকৃতির চরিত্র প্রায় একই ধাঁচের। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাসসহ অন্যান্য পদাবলীর কবিরাও প্রকৃতির আশ্রয় নিয়েছেন তাঁদের

পদ রচনায়। বিদ্যাপতির রাধাবিরহ বিষয়ক সেই বিখ্যাত পদটির দিকে তাকালেই আমরা দেখি কী তীব্রভাবে প্রকৃতি মানবমনে প্রভাব বিস্তার করে। বিদ্যাপতির সেই প্রসিদ্ধ পদ 'এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর/ এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর/ শূন্য মন্দির মোর' -এর পুরোটা জুড়েই ভাদ্র মাসের ভরা বৃষ্টির দিনে যখন প্রবল মেঘ, বর্ষণ, বজ্রপাত, তখন মত্ত ব্যাঙ ডাকছে, ময়ূর নাচছে; বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে এমন পরিবশে কৃষ্ণবিরহী রাধার বা একাকী রাধার আবডালে একাকী মানবের মনের অবস্থা কবি প্রকাশ করেছেন। রূপ বর্ণনার পদেও প্রকৃতির ব্যবহার আছে:

"কী রূপ হেরিনু কালিন্দী কূলে।
অপরূপ মেঘ কদম্বমূলে।।
অপলা চপলা সহিত তায়।
মৃগাঙ্গ-বিহীন শশাঙ্ক ভায়।।
নাচিছে ময়ূর জলদোপরি।
অলিকূল সব চান্দকে ঘেরী।।"[৩]

অনুবাদ সাহিত্যের মধ্যে অন্যতম আলাওলের 'পদ্মাবতী' কালিদাসের বিখ্যাত 'মেঘদূত' কাব্যেরও প্রধান উপজীব্য প্রেম। 'মেঘদূত'-এর মূল উপজীব্য বিরহী যক্ষের বিরহ গাঁথা। এখানে কালিদাসও প্রকৃতির শরণাপন্নেই কাব্যের উৎকর্ষতা এনেছেন। মেঘ কাজ করেছে এখানে প্রেমের দূতী হিসেবে, রামগিরি পর্বতে নির্বাসিত যক্ষের আষাঢ় মাসের প্রথম দিবসে প্রকৃতিতে মেঘের ঘনঘটা দেখে মনে বিরহ জাগে। তিনি সেই মেঘকেই দূতী করে তার মনের কথা পাঠান অলকাপুরীতে তার প্রিয়ার কাছে। সংস্কৃত এ কাব্য বাংলা ভাষায় বহুলভাবে অনূদিত হয়েছে এবং পরবর্তী বাংলা কবিতার ধারার পুষ্টি যোগাতে ভূমিকা রেখেছে।

প্রাচীন এবং মধ্যযুগে অনেক অমূল্য সাহিত্য রচিত হলেও তা একটা নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সেই সময়ের সাহিত্যে প্রেম ও প্রকৃতির প্রকাশ একেবারেই প্রথাবদ্ধ ছিল। দীর্ঘদিন প্রেম প্রকাশের কাঠামোটা প্রায় একই রকম ছিলো। এই প্রেমের স্বরূপ সম্পর্কে গবেষক বলেছেন:

> "এতে প্রেম ধরার ধূলির মালিন্যের ঊর্ধ্বে, সংসারের সকল প্রয়োজন অস্বীকার করে এবং জীবনের কঠোর বাস্তবরূপ অতিক্রম করে একরূপ বাষ্পীয় পদার্থরূপে কল্পিত হয়েছে। এরূপ প্রেমে যে বাঞ্ছিতা সে, 'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ' — অর্থাৎ সকল প্রকার বাস্তব প্রয়োজন ও সম্পর্কের ঊর্ধ্বে, শুধুমাত্র মানসরঙ্গিনী ও মানসসহচরী।" (মোবাশ্বের আলী, ১৯৬৯: ৮৭-৮৮)

যুগ-সন্ধিক্ষণের কবি ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর অনেক কবিতায় সুখ-দুঃখের বর্ণনায় ছয় ঋতুর ব্যবহার করেছেন। তাঁর কবিতায় প্রথম ব্যক্তির হাহাকার-ধ্বনি ধ্বনিত হয়েছে। তাঁর 'আত্মবিলাপ' কবিতায় প্রথম ব্যক্তির বিষাদের সুর শোনা যায়।

মধ্যযুগীয় সাহিত্যের ধারা থেকে বের হয়ে এসে উনিশ শতকে যাঁরা ব্যক্তি মানুষকে প্রাধান্যে এনে সাহিত্য রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে শুরুতেই আসে মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাম। তাঁর কবিতায় প্রেমানুষঙ্গ তুলনামূলক কম এলেও প্রকৃতির অনুষঙ্গ কম ব্যবহৃত হয়নি। কিন্তু প্রকৃতি সেখানে বাইরের অনুষঙ্গ হিসেবেই এসেছে, অন্তর্জগতে কোনো প্রভাব বিস্তার করেনি। বিভিন্নভাবে আলংকারিক প্রয়োজনে তিনি প্রকৃতিকে ব্যবহার করেছেন। তাঁর রচিত সনেটগুলোতে বাংলার প্রকৃতিতে তিনি ভিন্নভাবে অবলোকন করেছেন। 'কপোতাক্ষ নদ' বা 'বঙ্গভূমি'র দিকে তাকালে আমরা তা বুঝতে পারি।

পরবর্তীকালে 'ভোরের পাখি' বলে খ্যাত বিহারীলাল চক্রবর্তী তাঁর গীতিকবিতায় প্রেম ও প্রকৃতির অনুষঙ্গ এনেছেন ব্যাপকভাবে। তিনি ছিলেন রোমান্টিক গীতিকবি। তিনি আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার উদগাতা, জনক, পথ প্রদর্শক হিসেবে নিজেকে স্বতন্ত্র আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে সফল হয়েছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেলী, কীটস প্রমুখ ইংরেজ কবির সাথে বিহারীলালের পরিচয় থাকলেও পাশ্চাত্য প্রভাব তার উপর খুব একটা পড়েনি। রোমান্টিক কবি বিহারীলালের ‘বঙ্গসুন্দরী’ তে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেই দেখা যায় কবির বিচিত্র অনুভূতির বাসনা। কখনো মনে হয় সমস্ত গ্রাম, নগর, বন্দর ছেড়ে একটি অজ্ঞাত নির্জন স্থানে বাস করতে পারলেই তার আনন্দ। প্রকৃতির এমনি এক বিচিত্র আবেষ্টনীর মধ্যে বনের পশু পাখির সাথে মিত্রভাবে বসবাসের যে আনন্দ তা কবিকে

প্রলুব্ধ করেছে। কখনো বা সমুদ্র উপকূলে বিক্ষুব্ধ তরঙ্গরাজি সৈকত ভূমিতে আছড়ে মরছে, সেখানে বাসের উদগ্রবাসনাও কবিকে আকর্ষণ করছে। শ্যামল মাঠের উপর বয়ে যাওয়া প্রত্যুষের বায়ুর সাথে সাথে মাঠে বেড়ানোর আনন্দ, সন্ধ্যাকালে বাঁশীতে গ্রাম্য গানের সুরে কালো হয়ে আসা দিগ-দিগন্ত ভরে কুটিরে ফিরে আসার যে আনন্দ, ঘোর বর্ষার রাতে যখন বজ্রের গর্জনে বিদ্যুতের ঘনঘটায় প্রকৃতির এক ভীষণ মূর্তি প্রকটিত তার ভেতর দিয়ে মাঠের প্রান্তে একটি জীর্ণ কুটিরে রাত্রি যাপন, এ সবই যেন কবি হৃদয়কে মুগ্ধ করেছে। বিহারীলালের কবিতা বাংলা সাহিত্যের কৃত্রিম ক্লাসিক যুগের অবসান ঘটিয়ে রোমান্টিক নতুন যুগের সূচনা করেছে। রোমান্টিকতার অন্যতম লক্ষণ প্রকৃতির পানে ফিরে তাকানো। বিহারীলালের মধ্যে নিজস্ব দৃষ্টি দিয়ে প্রকৃতির দিকে তাকাবার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। বাঙালির যে মানস বৈশিষ্ট্য তা একমাত্র গীতিকবিতায়ই ধরা সম্ভব হয়েছে। প্রকৃতির অপরূপ মায়াঘেরা এই ভূখণ্ডের মানুষ স্বভাবতই আবেগপ্রবণ। অপ্রাপণীয়ের জন্য রোমান্টিক দুঃখবিলাস এ জনপদের মানুষের হৃদয়জাত বৈশিষ্ট্য। উনিশ শতকে যে সকল কবির হাত ধরে গীতিকবিতার উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে তার মধ্যে বিহারীলাল অন্যতম। বাংলা কবিতার জগতে তিনিই প্রথমে ব্যক্তিগত অনুভূতি, কল্পনা, সৌন্দর্য ও সংগীতের আশ্রয়ে রসঘন সংগীতযুক্ত গীতিকবিতার সৃষ্টি করেছেন। প্রকৃতির আরাধনা করে 'নিসর্গসন্দর্শন' নামে তিনি একটি কাব্যই রচনা করেছেন। এ কাব্যের কবিতাগুলোতে তিনি প্রকৃতির পটে ব্যক্তিসত্তাকে আরোপ করেছেন। এ কাব্যে বিহারীলালের প্রকৃতির প্রতি মুগ্ধতার প্রকাশ দেখা যায়, প্রকৃতি-রমণীর সঙ্গে প্রণয়ের কথা তিনি এই কাব্যে স্বীকার করেছেন। এই কাব্যের ‘সমুদ্র দর্শন’, ‘নভোমণ্ডল’, ‘ঝটিকা-সম্ভোগ’ ইত্যাদি কবিতায় তাঁর এই প্রকৃতি-প্রীতির পরিচয় মেলে। ‘ঝটিকা সম্ভোগ’ কবিতার শেষ তিনটি সর্গে এক অপরূপ ঝড়ের বর্ণনা দিয়েছেন কবি। মানবমনের বিরহ বেদনা নিয়েও তাঁর অনেক কবিতা রয়েছে। মানবমনস্তত্ত্বকে তিনি বাইরের প্রবাহ থেকে অন্তর্জগতে নিয়ে আসেন। 'প্রেমপ্রবাহিনী', 'সারদামঙ্গল' প্রভৃতি কাব্যে প্রকৃতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। 'বঙ্গসুন্দরী'তে তিনি বলেছেন:

"প্রকাশ পাইল সে আলো-মালায়
অমরাবতীর বিনোদ বন;
কত অপরূপ তরু শোভে তায়,
চরে অপরূপ হরিণীগণ।

বিমল সলিলা নদী মন্দাকিনী,
দুলে দুলে যেন মনেরি রাগে;
ভাঁজি কুলুকুলু মধুর রাগিণী,
খেলা করে তার মেখলা ভাগে।”[৪]

কাব্যভাবনা এবং রীতিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নজরুল সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার এবং যতীন্দ্রনাথ সেনের উত্তরসূরী হলেও তাঁর নিজস্ব ধারা এবং প্রকাশভঙ্গিতে তিনি ছিলেন অনন্য। নজরুল-পূর্ব সময়ে প্রেমের প্রকাশ এবং নজরুলীয় প্রকাশের প্রসঙ্গে গবেষক বলেছেন:

> "পুরুষের প্রথম যৌবন-চেতনায় ব্যক্তিনিরপেক্ষ নির্বিশেষ বাসনার ব্যাকুলতা বাংলা কাব্যে এর পূর্বে এমনভাবে প্রকাশ পায়নি। যৌবনাগমে মানসিক উচাটন ভাব থেকে মন-কেমন-করা বিষণ্ন সন্ধ্যাসঙ্গীত এবং হৃদয়ের তারে কড়ি ও কোমল সুরে বিচিত্র মূর্ছনায় উদাস ভাব উদয়ের কথা পাওয়া গেছে বড় অবদমিত পরিমার্জিত অভিব্যক্তির মাধ্যমে। তার স্বরূপ চিনতে পারা কঠিন। নজরুলের লেখনীতে নিঃসৃত হয়ে থর-থর ভূধর কাঁপানো আবেগ বাংলা কবিতাকে এই প্রথম প্রকম্পিত করেছে। বড়ু চণ্ডীদাসে, ভারতচন্দ্রে বা পুঁথিসাহিত্যে দেহগত কামনার যে বিবরণ তা আত্মনিষ্ঠ রচনা নয় বলে এ আলোচনায় প্রসঙ্গ-বহির্ভূত। তবু বলা যায়, সে সকল কাব্য এবং সংস্কৃত কাব্যের বলিষ্ঠ দেহবাদের জাজ্বল্যমান আদর্শ সত্ত্বেও ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বাংলা সাহিত্যেই এই আবেগ এড়িয়ে চলবার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। তার কারণ — পাশ্চাত্য শিক্ষা সভ্যতার প্রভাবে নব-গঠিত রুচিবোধ। নব-শিক্ষায় দিনে দিনে এই বাস্তব-অনুভূতি রুচিগর্হিত বলে একটা সংস্কারের প্রাচীর গড়ে উঠেছিল। অবশ্য এই ভাব-বর্ণনায় বিশেষ কবিগোষ্ঠীর বোধের অতিমাত্র স্থূলত্বও এই বিমুখতার এক কারণ হতে পারে।" (সনজিদা, ২০১৮: ৩৩-৩৪)

প্রেম ও প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা নজরুলের আগে যাঁদের হাতে পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছে তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অগ্রগণ্য। প্রেমকে তিনি পূজার পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন, প্রকৃতিকে দেখেছেন সাধকের অন্তর্দৃষ্টি এবং ঋষির মনোভঙ্গি দিয়ে। প্রেমের সাধনা আর সৌন্দর্য বিনির্মাণের পাশাপাশি সূক্ষ্ম তাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে তিনি দেখেছেন এ সম্পর্ককে। তাঁর দৃষ্টিতে পুরুষ গড়েছে নারীকে তার অন্তরের সৌন্দর্য দিয়ে, নারী সে 'অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা'। নারীসত্তাকে কবিতা-গানে বা অন্যান্য লেখায় রবীন্দ্রনাথ যেভাবে আরাধনা

করেছেন তেমনটা সাহিত্যে বিরল। 'প্রেম ও প্রকৃতি' শিরোনামের ১০১ টি অনুকবিতাই তিনি লিখেছেন, অন্যান্য কবিতাতে যুগপতৎভাবে তো এসেছেই। এ শিরোনামের ৯৩ সংখ্যক কবিতায় তিনি বলেছেন:

"রিমিকি ঝিমিকি ঝরে ভাদরের ধারা—
মন যে কেমন করে, হল দিশাহারা॥
যেন কে গিয়েছে ডেকে,
রজনীতে সে কে দ্বারে দিল নাড়া—
রিমিকি ঝিমিকি ঝরে ভাদরের ধারা॥
বঁধু দয়া করো, আলোখানি ধরো হৃদয়ে।
আধো-জাগরিত তন্দ্রার ঘোরে আঁখি জলে আঁখি যায় যে ভ'রে।
স্বপনের তলে ছায়াখানি দেখে মনে মনে ভাবি, এসেছিল সে কে—
রিমিকি ঝিমিকি ঝরে ভাদরের ধারা॥"[৫]

সর্বোপরি বলা যায়, প্রেমের অনুভব এবং প্রকাশের সাথে প্রকৃতির সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এ অনুভবকে যখন থেকে মানুষ শাব্দিক রূপ দিয়েছে তখন থেকে তো বটেই শব্দরূপের পূর্ব থেকেই মানবের ইতিহাস যতদিনের ততদিনেরই এই সম্পর্ক। মানুষ এই বিস্তীর্ণ প্রকৃতিরই অংশ, তাই ভবিষ্যতে যতদিন মানবের ধারা অব্যাহত থাকবে ততদিনই শব্দে, সুরে এবং অনুভবে প্রেমের সাথে প্রকৃতি জড়িয়েই থাকবে।

টীকা

১.আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড), বাংলা একাডেমি, ২০১৮; পৃষ্ঠা- ৩৫১

২.সুকুমার সেন সম্পাদিত, চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, দিল্লী, ১৯৯৩, পৃ- ২৯২

৩. মধ্যযুগের বাঙলা গীতিকবিতা, মুহাম্মদ আব্দুল হাই এবং ডক্টর আহমদ শরীফ সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ, পৃ-৬৫

৪. শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লি., কলকাতা, ১৯৫৯, পৃ- ১৯

৫. isid.ac.in

অধ্যায় দুই

প্রেম-প্রকৃতির কবিতায় নজরুলের পূর্বঋণ

মানুষ পৃথিবীতে আবির্ভাবের পরে এখানকার জল-হাওয়া দিয়েই পরিপুষ্টি লাভ করে। পৃথিবী থেকে সে গ্রহণ করে এবং তার মেধা-মনন প্রচেষ্টামতো পৃথিবীকে প্রদান করে। নজরুলের লেখনীর ক্ষেত্রেও সে কথা প্রযোজ্য। তিনি প্রাচীন আমল থেকে প্রাপ্ত বাংলা সাহিত্য থেকে শুরু করে পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তের সাহিত্য দ্বারা কমবেশি প্রভাবিত হয়েছেন। তবে নজরুল প্রবলমাত্রায় স্বকীয় আবেগের কবি হওয়া তাঁর লেখায় তাঁর ধাঁচই বেশি। এর মধ্যেও আমরা খেয়াল করলে সেখানে অনেক উপাদান এবং উপকরণ পাই যা তিনি গ্রহণ করেছেন বিদ্যমান পূর্ব-ভাণ্ডার থেকে। এটি তাঁর বিপ্লব, বিদ্রোহ, মানবতার কবিতায় যেমন সত্য তেমনি সত্য প্রেম ও প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাও। সকল বড় কবিই তাঁর পূর্বসূরীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন তবে সাময়িক সময় পরে যিনি যতখানি তাঁর নিজস্বতা তৈরি করতে পেরেছেন ততখানিই তিনি মৌলিক হয়ে উঠেছেন। নজরুলের প্রেম ও প্রকৃতির কবিতায় কতখানি পূর্ব-প্রভাব আছে আমরা অল্প পরিসরে তা দেখবার চেষ্টা করি।

নজরুল যেমন বাংলা ভাষায় অকল্যাণ, অবিচারের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন, তেমনি ইংরেজি ভাষাতে এসবের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন পি.বি.শেলী। অনেকেই নজরুল বিপ্লব-বিদ্রোহের কবিতায় শেলীর কবিতার প্রভাব আছে বলে মনে করেন। বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলাম বিশুদ্ধ বঞ্চিত মানুষের কবি। মানুষ যেখানেই বঞ্চিত, অপমানিত হয়েছে সেখানেই তিনি তাঁর অগ্নিবীণা বাজিয়েছেন। স্বার্থবাদী, ভণ্ড সমাজ ও শাসকদের আক্রমণ করেছেন। আক্রমণ করেছেন ধর্মকে জীবিকা করা গোষ্ঠীকে। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে মানুষের ঐক্য চেয়েছেন তিনি। কায়মনোবাক্যে তিনি ভারতের স্বাধীনতা চেয়েছেন, কলম ধরেছেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে। একাধিকবার কারাবরণ

করেছেন এ কারণে। অবহেলিত নারী সম্প্রদায়ের মর্যাদার দাবিতে তাঁর কাব্যভাষা ঝংকৃত হয়েছে। ঠিক এমনিভাবে শেলীও তাঁর কবিতায় অন্যায় এবং অসাম্যের বিরুদ্ধে লড়েছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অন্যায়ের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন, সত্য এবং সুন্দরের জয়গান গেয়েছেন।

নজরুলের প্রথম কাব্যচর্চার হাতেখড়ি হয়েছিল লেটোগানের দল থেকে। লেটোর দলে তৎক্ষণাৎ যে পদ রচনা করতে হয় সেটা সহজাত কবিতা রচনার প্রতিভাকে শাণিত করেছিল নিশ্চয়ই:

> "নজরুলও তাঁর কবিসত্তায় কবিগানের ঐতিহ্য ও সম্পদকে ধারণ করেছিলেন। তবে সে-কবিগান কলকাতা ও তার আশেপাশের নাগরিক কবিগান নয়। সেটি বর্ধমানের গ্রাম্য এলাকার। সেখানকার কবিগান লোককবিতার আদিম পবিত্রতা থেকে দূরে সরে যায়নি, নাগরিক কলুষতাকে আলিঙ্গন করেনি। যাত্রা ও কবিগানের আঙ্গিক জড়িত-মিশ্রিত হয়ে সে-এলাজায় লেটো নামে একধরনের লোককবিতার সৃষ্টি হয়েছিল। সেই লেটোর দলেই নজরুলের কবিতাচর্চার হাতেখড়ি।" (যতীন, ২০১১: ১৪৪)

নজরুল হরহামেশাই ভারতীয় পুরাণ, মধ্যপ্রাচ্যীয় পুরাণ এবং পাশ্চাত্য পুরাণ থেকে প্রসঙ্গ এনে তাঁর লেখায় ব্যবহার করেছেন। প্রেম-প্রকৃতির কবিতায় পুরাণের ব্যবহার তুলনামূলক কম হলেও লক্ষ্য করা যায়। 'পূজারিণী' কবিতায় কবি তাঁর আরাধ্য মানবীকে নানান পৌরাণিক চরিত্রের সাথে তুলনা করে তিনি ভাব প্রকাশ করেছেন। প্রসঙ্গত তিনি এনেছেন সীতা প্রসঙ্গ, রাধা-কৃষ্ণের লীলাভূমি মথুরার প্রসঙ্গ, গৌতম বুদ্ধ, মহাভিক্ষু, প্রভৃতি পুরাণের অনুষঙ্গ। এছাড়াও 'চক্রবাক' কাব্যের বিভিন্ন কবিতাতেও এসেছে পৌরাণিক বিভিন্ন অনুষঙ্গে। যেমন:

১. "কানন-কাঁদানো তুমি তাপস-বালিকা
অনন্তকুমারী সতী; তব দেব-পূজার থালিকা
ভাঙিয়াছি যুগে যুগে, ছিঁড়িয়াছি মালা
খেলা-ছলে; চির-মৌনা শাপভ্রষ্টা ওগো দেব-বালা!"

(পূজারিণী/ দোলন-চাঁপা)

২. "মথুরায় গিয়া শ্যাম, রাধিকায় ভুলেছিল যবে,
মনে লাগে — এই সুর এই গীত রবে কেঁদেছিল রাধা;"
(পূজারিণী/ দোলন-চাঁপা)

৩. "দুষ্মন্তের খোঁজে-আসা তুমি শকুন্তলার মৃগ?
মহাশ্বেতা কি বসিয়াছে সেথা পুণ্ডরীকের ধ্যানে?"
(কর্ণফুলী / চক্রবাক)

৪. 'মরবে হরি হিংসা-লাজে', 'বিষ্ণুজয়ী ভালোবাসা'
(ব্যথা-গরব)

নজরুল যে সময়ে বাংলা সাহিত্য-জগতে প্রবেশ করেন সেই সময়কার সাহিত্যিকদের একটা প্রভাব তাঁর লেখনীতে থাকা স্বাভাবিক। এ প্রসঙ্গে গবেষক বলেছেন:

> "একথা ঠিক যে, সত্যেন্দ্রনাথের যদি কেউ সার্থক উত্তরাধিকারী থেকে থাকেন, তবে সর্বদিক দিয়ে বিচার করলে তিনি কাজী নজরুল। যতীন্দ্রনাথ ও মোহিতলালের উপরও মোহিতলালের প্রভাব ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের চারণ-কবির ভূমিকাটি একমাত্র নজরুল ছাড়া আর কেউ গ্রহণ করতে পারেননি। সত্যেন্দ্রনাথের বিদ্রোহের সুরকে নজরুলই জাতির মর্মমূলে পৌঁছে দিয়েছিলেন।" (সুশীলকুমার, ১৯৯৭: ২৭)

'যতীন্দ্রীয় বন্ধুরতা, গোবিন্দীয় স্থূলতা, এবং দেবেন্দ্রীয় পেলবইন্দ্রিয়জাগরতা নজরুল কাব্যে আছে তবে প্রধানভাবে নয়।' তাঁর উপর রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ এবং মোহিতলাল ছায়া ফেলে গেছেন। 'অগ্নি-বীণা' শিরোনামটি রবীন্দ্রনাথ থেকে নেয়া, 'অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন করে...' – গীতালির ৫৫ সংখ্যক কবিতা। 'হার-মানা হার' শব্দবন্ধও গীতিমাল্যের ২৪ সংখ্যক গানে বিদ্যমান, 'হার-মানা হার পরাব তোমার গলে...'
সত্যেন্দ্রনাথের 'বর্ষা' ও 'কুহু ও কেকা'র সাথে নজরুলের 'স্তব্ধ বাদল' ও 'ছায়ানট' ; ফুল-সাঞ্চি'র সাথে 'ফাল্গুনী' মিলিয়ে পড়েন অনেকে।

নিসর্গে শারীরিক বাসনার সঞ্চার ও নরাত্বরোপ কালিদাসের কবিতার একটি প্রধান লক্ষণ, এ বৈশিষ্ট্য নজরুলের প্রেম-প্রকৃতির কবিতাতেও প্রবল।

নজরুলের কবিতায় বৈষ্ণব সাহিত্যের অনেক উপাদান বিদ্যমান। তাঁর জন্মস্থান বর্ধমানের ধর্মীয় সম্প্রীতি সম্পর্কে আনন্দবাজার পত্রিকায় কলামলেখক 'সহিষ্ণুতার বীজ বোনা হয়েছে প্রাচীন কালেই' শিরোনামে বলেছেন:

> "আসলে বর্ধমানে দেখা যায় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের এক সহাবস্থান। হিন্দু-মুসলমান, শিখ-জৈন, বাঙালি-অবাঙালি মানুষের এক মিশ্র চরিত্র আর এই নানা ধর্মীয় মত অনুসারে মানুষের মধ্যে এক সুন্দর ভারসাম্য রক্ষা করে চলতেন এখানকার প্রশাসকেরা। লাহৌর থেকে আসা অবাঙালি রাজপরিবারের রাজারা সব সময়েই চেষ্টা করতেন ধর্মীয় সহিষ্ণুতার বাতাবরণ বজায় রাখতে। তাঁরা কখনই তাঁদের ধর্মমতকে অপরের উপরে চাপিয়ে দিতে তৎপর হননি। তাই মন্দির, মসজিদ, গুরুদ্বার, সবার অবস্থান রয়েছে সগৌরবে। একই সঙ্গে মানুষের মনের সঙ্কীর্ণতাকে দূর করার লক্ষ্যে প্রশাসনের উদ্যোগে শুরু হয়েছিল শিক্ষা প্রসারের কাজ। রাজ পরিবারের আনুকূল্যে এক দিকে যেমন, ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের জন্য স্থাপিত হয়েছে নানা প্রতিষ্ঠান, তেমনই বহু সংস্কৃত টোল, মাদ্রাসা, স্কুলও পেয়েছে রাজ পৃষ্ঠপোষকতা।
>
> প্রায় ৩০০ বছর ধরে এই রাজপরিবার ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও ঐক্যকে বজায় রাখার জন্য এমন কিছু ঐতিহ্য গড়ে তোলেন যা আজও প্রাসঙ্গিক।"
>
> (https://www.anandabazar.com/editorial/the-seeds-of-tolerance-have-been-sown-in-ancient-times-in-bardhaman-1.1110720)

তাঁর কিছু কবিতা অনায়াসে পদাবলীর সাথে মিলিয়ে পড়া যায়। রাধা-কৃষ্ণ সরাসরি এসেছেন কোথাও, শ্যাম, বৃন্দাবন, মথুরা, কদমতলা, বাঁশি প্রভৃতি উপাদান বারংবার ব্যবহৃত হয়েছে তাঁর কবিতায়। 'দুপুর-অভিসার' কবিতায় অবুঝ বালিকা সাঁঝ ভেবে কলস ছাড়াই পানি আনবার ছলে পুকুর পাড়ে যাচ্ছে প্রিয় অভিসারে। এখানে পদাবলীতে

বিদ্যমান অভিসার বিষয়ক পদের ছায়াপাত আমরা দেখি। এছাড়াও নীপবন, বাঁশি, রাধাবিরহ, রূপবর্ণনা প্রভৃতি বিষয়ের ছাপ এসেছে। এসেছে প্রত্যক্ষ উল্লেখ:

"মথুরায় গিয়া শ্যাম, রাধিকায় ভুলেছিল যবে
মনে লাগে এই সুর এই গীত রবে কেঁদেছিল রাধা।"
(পূজারিণী, দোলন-চাঁপা)

'বাসন্তী' কবিতাতেও শীত না যেতেই প্রকৃতিতে লাল-নীল ফুলের সমাহার দেখা যায়। এই যে বসন্তের ছোঁয়া পেতে না পেতেই ফুল-পাতার আগমন এটাকে রাধা-কৃষ্ণের রূপকে প্রকাশ করেছেন:

"পউষের রিক্ত শাখায়
বঁধু যেই বংশী বাজায়,
নীলা বন লাল হয়ে যায়,
ফুলে হয় ফুলেল আকাশ।
এলে শ্যাম বংশী-ধারী
গোপনের গোপ-ঝিয়ারি
ফুল সব শ্যাম-পিয়ারি
ভুলে যায় ছার গেহ-বাস।।"
(বাসন্তী)

প্রেমে সব পেয়েও সব হারাবার যে ভয় তা গোবিন্দদাসের পদে পাওয়া যায়, 'জনম অবধি হাম রূপ নেহারনুঁ/ নয়ন না তিরপিত ভেল.../ লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনুঁ/ তব হিয়া জুড়ান না গেল।' অর্থাৎ জনম জনম রূপ দেখেও নয়ন জুড়াইল না এবং যুগের পর যুগ প্রাণ প্রাণ-সংলগ্ন থেকেও হৃদয় শান্ত হয় না। এবং 'দুঁহু ক্রোড়ে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া' — দু'জন এক বন্ধনেই আছে তবুও আসন্ন বিচ্ছেদ ভেবে কেঁদে আকুল। নজরুলের লেখাতেও আমরা পাই 'চক্রবাক' কাব্যের 'সাজিয়াছি বর মৃত্যু উৎসবে' কবিতায় 'এত কাছে তুমি গলা জড়াইয়া/ কেন হু হু করে ওঠে তবু হিয়া,/ কী যেন নাই, কিসের অভাব এ বুক ব্যথা বিধুর।/ চোখ-ভরা জল, বুক ভরা কথা, কণ্ঠে আসে না সুর।' 'অবেলার ডাক' কবিতার পুরোটা জুড়েই দাস্যভাবে তিনি ভাবিত:

"আমিও গো মা ফিরিয়ে দিলাম চিনতে নেরে দেবতারে।
ভিক্ষুবেশে এসেছিল রাজাধিরাজ দাসীর দ্বারে।।...
দেবতা-আমার নিজে আমায় পূজল ষোড়শ-উপাচারে।
পূজারীকে চিনলাম না মা পূজা-ধূমের অন্ধকারে।।"

(অবেলার ডাক)

'বাদল-দিনে' কবিতায় পড়ার সাথে সাথে বিদ্যাপতির রাধাবিরহ বিষয়ক পদ 'এ সখি হামারি দুখের নাহি ওঁর... 'কবিতার কথা মনে আসে। 'বাদর দর-দর/ বিদরে হিয়া মম/ বিদেশে প্রিয়তম/ জলদ-দামা বাজে জলদে তালে তালে/ কাজরি-নাচা নাচে ময়ূর ডালে ডালে' এসকল শব্দবন্ধ বা পঙক্তিতে বিদ্যাপতির সরাসরি প্রভাব আছে বলে আমাদের প্রতীয়মান হয়।

মধ্যপ্রাচ্যীয় ঐতিহ্য: 'জিঞ্জির' কাব্যের 'বার্ষিক সওগাত'সহ অন্যান্য আরো কবিতায় আরব্য ঐতিহ্য এসেছে। 'বার্ষিক সওগাত' কবিতায় দেখা যায় প্রিয় মিলনের রাতে সাকি যে সওগাত (উপহার) এনেছে তা আরব্য উপহার। খাবার হিসেবে এসেছে মরুভূমির খাবার– পাকা খর্জুর, ডাঁশা আঙুর, টোকো-মিঠে কিসমিস।

নজরুল খুব সহজ আবেগের প্রেমের কবি। সহজেই বিরহকে বরণ করে নিয়েছেন তিনি, বিধিলিপিকে মেনে নিয়ে ভেসেছেন অপার দুঃখ-সাগরে। বোদ্ধারা তাঁর প্রবণতার নাম দিয়েছেন 'লীলাবাদ' বা Patheism. এই তত্ত্বে ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য, উত্থান-পতন সকলই স্রষ্টার লীলা। গানে তিনি বলেছেন 'শূন্যে মহা আকাশে, তুমি মগ্ন লীলা বিলাশে'। ভারতীয় সনাতন ধর্মদর্শনের যেমন এটি মূল কথা, মূল কথা ইসলামী ধর্মদর্শন সূফীবাদেরও। 'মুখরা', 'সাধের ভিখারিনী' কবিতায় সুফী সাহিত্যের প্রভাব আছে। 'মুখরা' কবিতায় নারীভাবে ভাবিত কবি নিজেকে ভিখারিনী সাজে সাজিয়ে নিজের সকল লাজ লজ্জা ফেলে প্রেমের কথা প্রকাশ করেছেন। মুখরা শব্দটি শুনলেই মনে পড়ে রাধার 'মুখরা' দশার কথা।

তাঁর প্রেমের কবিতার অনেক জায়গাতেই সুফী সাহিত্যের প্রভাব পাওয়া যায়। আশেক-মাশুক সুফীরা স্রষ্টাকেই পরম প্রিয় ভাবে ভাবিত হন এবং সাধনার চূড়ান্ত পর্যায়ে তারা স্রষ্টার সাথে একাত্ম অনুভব করেন এবং ধ্যানের মাধ্যমে নিজের অস্তিত্ব পরমাত্মার সাথে বিলীন করে দেন। 'পরশ-পূজা' কবিতাকে আমরা নর-নারীর প্রেমের কাঠামোয় ফেলে পড়তে পারলেও কবিতায় আত্মায় এক অধ্যাত্মবোধ ধ্বনিত যা সুফীবাদী তত্ত্বের কথাই মনে করিয়ে দেয়। কবি যখন প্রিয়তমর সাথে বিচ্ছেদাবস্থায় যাবেন তখন নিজের মধ্যেই অনুভব করবেন প্রিয়তমকে, নিজেকে চুমো দেবার মাধ্যমে প্রিয়তমকে চুমবার অনুভূতি পাবেন কারণ দেহ আলাদা হলেও আত্মায় আত্মা লীন হয়ে গিয়েছে:

"তখন মুকুর-পাশে একলা গেহে
আমারি এই সকল দেহে
চুমব আমি চুমব নিজেই অসীম স্নেহে গো,
আহা পরশ তোমার জাগছে যে গো এই সে দেহে মম।।"

(পরশ-পূজা)

'আপন-পিয়াসী' কবিতাতেও আমরা দেখি কবি এবং তাঁর প্রেমাষ্পদ একাকার হয়ে গিয়েছেন। তিনি নিজের মাঝেই নিজের প্রেমাষ্পদকে খুঁজে ফেরেন এবং সেটা তাঁরই তিয়াসী বাসনায়।

'গোপন-প্রিয়া' কবিতায় যে প্রিয়া কবিকে প্রেরণা দেন এমন সুর আমরা রবীন্দ্রনাথের গানে (আমার সকল ভালোবাসা, সকল আঘাত, সকল আশায় তুমি ছিলে আমার পাশে...) পাই। রবীন্দ্রনাথের 'রাহুর প্রেম' কবিতার প্রভাব 'আড়াল' কবিতায় আছে। রবীন্দ্রনাথে প্রেম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পূজার পর্যায়ে উত্তীর্ণ। তাঁর পূজা পর্যায়ের অনেক গানকেই প্রেমের গান বলে ভ্রম হয়। নজরুলের প্রেম প্রধানত রক্তমাংসের মানুষের প্রেম। তবে কিছু কিছু কবিতায় তিনি প্রিয়াকে দেবতা এবং দেবতাকে প্রিয়া করেছেন। 'অবেলার ডাক' কবিতায় কবি নিজেকে পূজারীর জায়গায় দেখেছেন। প্রিয় দেবতা এখানে:

"তাই মাগো তার পূজার ডালা
নিই নি, নিই নি মণির মালা
দেবতা আমার নিজে আমায় পূজল ষোড়স-উপাচারে,

পূজারীকে চিনলাম না মা, পূজা-ধূমের অন্ধকারে।"

(অবেলার ডাক, দোলন-চাঁপা)

জন্ম-জন্মান্তরে প্রিয়কে পাবার যে ধারণা নজরুলের কবিতায় আমরা দেখি এটাকে অনেকে রবীন্দ্র-প্রভাব বলে মনে করেছেন। 'চিনি প্রিয়া চিনি তোমা জন্মে জন্মে চিনি চিনি চিনি' (পূজারিণী) বা 'আমারি প্রেমের মাঝে রয়েছ গোপন, বৃথা আমি খুঁজে মরি জন্মে জন্মে করিনু রোদন' (অ-নামিকা), অথবা 'সাজিয়াছি বর মৃত্যু উৎসবে' কবিতায় যে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রিয়কে পাবার যে বাসনা তা যেন রবীন্দ্রনাথের চিরন্তন প্রেমেরই অনুরণন। 'দোলন-চাঁপা' কাব্যের 'বেলা শেষে' কবিতা সম্পর্কে আলোচক বলেছেন:

> "'কোন মেঘলোক', 'কোন্ বিরহিনী বনে', 'অনাদি কালের কোন্ অনন্ত বেদনা', 'যুগ-যুগ ধরি', 'কি জানি কখন কী হয়' ইত্যাদি শব্দের অনিশ্চয়তা, অস্পষ্টতা ও অমূর্ততা বাংলা কাব্যে রৈবিক পেটেন্ট। অন্যান্য অনেকের মতন নজরুলও রবীন্দ্র-সায়রে সিনান করেই এই সব কমল লুটতে পেরেছেন। তারপর রৈবিক বিশেষণের ছড়াছড়ি এই কবিতার ভিতর যৎপরোনাস্তি। 'সন্ধ্যা-দীপ-জ্বালা', 'আসি-বলে-চলে-যাওয়া', 'অনাদর-হানা', 'দেবতার-পায়-ঠেলা' ইত্যাদি বিশেষণের আমদানি রবীন্দ্র-খনি হতেই সম্ভব হয়েছে।"
>
> (উদ্ধৃত, মনিরুজ্জামান, ২০০০: ২১১)

নানান প্রভাব থাকা সত্ত্বেও নজরুলের নিজস্ব একটা ঢং ছিলো, নজরুল নিজেই একটা সাহিত্যযুগ এবং এক বিশেষ সাহিত্য ধারার প্রবর্তক ও ধারক:

> "নজরুল-সাহিত্যের মর্মমূলে দেশ-বিদেশের বিদ্রোহী, সংস্কারমুক্ত, মানবতাবাদী চেতনার ধারা প্রবাহিত। ইরানের ওমর খৈয়াম, হাফিজ, ইংল্যান্ডের শেলী, বায়রন, আমেরিকার ওয়াল্ট হুইটম্যান, রাশিয়ার ম্যাকসিম গোর্কী তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন। কিন্তু, কোনো ক্ষেত্রেই নজরুল কারো প্রভাবাধীন অনুগত শিষ্য নন। তাঁর চেতনায়-চিন্তায়, ভাষায়-ভঙ্গিতে স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা উজ্জ্বল।" (আতাউর, ১৯৯৭: ১১)

পরিশেষে বলা যায়, মানুষ তার বিদ্যমান জল-হাওয়া দিয়েই পরিপুষ্ট হয়; কিন্তু প্রতিটি মানুষের মধ্যেই একান্তই তার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে সেটাই তার স্বকীয়তা। কেউ যদি

নিজের অন্তঃকরণের দিকে পূর্ণ মনোনিবেশ করে তাহলে তার সেই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়। নজরুলেও তাই পরিলক্ষিত। লেখালেখি বা মনের ভাব প্রকাশের অঙ্গনে প্রবেশ করে কিছুটা বিদ্যমান মহল বা পূর্বমহলের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন ঠিকই কিন্তু এসবের মাঝে তাঁর নিজস্ব যে ধারা সে ধারাই বিকশিত এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অধ্যায় তিন

নজরুলীয় প্রেমের ধরন

প্রেম সাহিত্যের একটি অনবদ্য প্রসঙ্গ। সকল ভাষার প্রায় সকল সাহিত্যিকেরাই এ বিষয় নিয়ে লিখেছেন। বাংলা সাহিত্যের সূচনালগ্ন থেকেই সকল প্রাপ্ত সাহিত্যিক নিদর্শনে প্রেমের উপস্থিতি লক্ষণীয়। প্রত্যেক লেখকের প্রেমভাবনা এবং তা প্রকাশের নিজস্বতা রয়েছে। কাজী নজরুল ইসলাম ঔপনিবেশিক শাসনে জর্জরিত পরাধীন ভারতবর্ষের বঞ্চিত আত্মাদের প্রতিনিধি। এই অন্যায়, অবিচার, পরাধীনতার সাথে যখন প্রেমে অপ্রাপ্তি এসে মিলেছে তখন তা কতকগুলো স্পষ্ট ধারায় প্রকাশিত হয়েছে। নিচে আমরা দেখার চেষ্টা করব নজরুলের প্রেমভাবনা এবং তা প্রকাশের ধরনগুলো কেমন ছিল।

● শত বঞ্চনার মাঝেও নজরুল আশার আলো নিয়ে আসেন। নজরুল প্রেমের প্রায় সকল কবিতাতেই বিরহ শেষে একটা আশা ধরে রাখেন। এই আশাই হয়তো মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। যে প্রিয়তমকে তিনি চিনতে পারেননি ঠিক সময়ে তাঁর বিশ্বাস সে আবার আসবে। 'মাগো আমি জানি জানি/ আসবে আবার অভিমানী/ খুঁজতে আমায় গভীর রাতে এই আমাদের কুটির-দ্বারে' (অবেলার ডাক)। 'আশান্বিতা' কবিতার পুরোটাতেই তিনি আশাবাদী যে প্রেয়সী ফিরে আসবে। তিনি বলছেন, 'কপট! তোমার শপথ-পাহাড় বিন্ধ্যসম হোক না সে,/ ঝড়ের মুখে খড়ের মতন উড়বে তা মোর নিশ্বাসে!' 'চৈতী হাওয়া' কবিতাতেও দীর্ঘ কবিতা শেষে একটা আশাবাদ দিয়েই তিনি কবিতা শেষ করেছেন।

● নারী শক্তির আরাধনা এবং সমর্পণ নজরুলের প্রেমের কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় পুরাণ এবং ঐতিহ্যে নারী শক্তির অধিষ্ঠান হয়েছে অনেক আগেই। নজরুল অনেক শ্যামাসংগীত রচনা করেছেন যেখানে শ্যামা বা দুর্গাদেবীর আরাধনায় সমাজের অনাচার থেকে মুক্তি মেগেছেন। রাজনৈতিক দর্শনে একদিকে যেমন তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি থেকে ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতা চেয়েছিলেন অন্যদিকে প্রভাবিত ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সাম্যবাদী দর্শন দ্বারা। সাম্যবাদের মূল কথার মধ্যে

ছিলো নারীর সমানাধিকার। দেশ শাসন থেকে ফসল উৎপাদন সকল পর্যায়ে তারা নারীর স্বাধীন অংশগ্রহণে বিশ্বাস করতো। 'নারী' কবিতায় আমরা একচ্ছত্র নারী বন্দনা দেখি। তাঁর প্রেমের কবিতাতেও তিনি নিজের সকল বীরত্ব এবং বিদ্রোহ সমর্পণ করেছেন 'বিজয়িনী' প্রেয়সীর পদতলে। নারী শুধুই প্রেমের অনুষঙ্গ নয়, তাঁর সকল অর্জন এবং প্রেরণার কেন্দ্রে আছে নারী। নারীর প্রেমের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে নিজেকে তিনি 'দীন কাঙাল' (ব্যথা-গরব) বলেছেন। প্রেমে আসলে নজরুল কাঙালই থেকেছেন পূর্বাপর। মানুষের ভালোবাসায় তিনি উচ্ছ্বসিত শিশুর মতোই প্রতিক্রিয়া করেছেন। নিজেকে প্রেমাস্পদের পদতলে সঁপে দেওয়া আমরা নারী চরিত্রের আঙ্গিকেই পাই সাধারণত, কিন্তু পদ্মপায়ে আঘাত সহ্য করে নিজেকে প্রেয়সীর চরণ-তলে নিজেকে সমর্পণ করেছেন। (উপেক্ষিত, সমর্পণ) এগুলো একান্তই নজরুলীয় প্রেমের বৈশিষ্ট্য। 'কবি-রানি' কবিতায় কবি তাঁর সকল কবিত্বের কৃতিত্ব তাঁর প্রেয়সীকে দিচ্ছেন, প্রেয়সীর ভালোবাসাই তাঁকে কবি বানিয়েছে। 'বিজয়িনী' কবিতাতেও কবির 'বিজয়-কেতন' কবির রানির চরণ-তলে এসেই লুটায়। তাঁর 'সমর-জয়ী অমর তরবারি' এসে ক্লান্ত হয়ে পরাজয় বরণ করে রানির পায়ের কাছে। সংসারে নারী সর্বদাই অবহেলিত হয়েছে এবং মূল্যায়ন পায়নি। নজরুল তাঁর কবিতাতে নারীর মর্যাদাকে অনেক বেশি সমুন্নত করেছেন।

• বেদনাই যেন নজরুলের জীবনে সত্য। 'একটি শুধু বেদনা-মানিক আমার মনের মণি-কোঠায়,/ সেই তো আমার বিজন ঘরে দুঃখ-রাতের আঁধার টুটায়।।' 'ব্যথা-নিশীথ'- এ তাঁর হতাদর হানা বুকে কেবলই কী কথা স্মরণ করে চোখে জল আসে তা বলেছেন। তাঁর ব্যর্থ জীবনের বেদনা তিনি সারাদিন লুকালেও একলা গভীর রাতে লুকাতে পারেন না, উথলে উথলে ওঠে। এই উথলে উঠা চোখের জল, গুমরে গুমরে উঠা হৃদয়ের হাহাকার তাঁর কবিতায় অপ্রকাশিত থাকেনি। 'সিন্ধু' কবিতার তিনটি তরঙ্গেই নানাভাবে বিরহ এসেছে। সিন্ধুকে শুরুতেই তিনি 'চির-বিরহী' বলে সম্বোধন করেছেন। অসীম, শক্তিশালী সিন্ধুর উপর তিনি নিজের বিরহী সত্তা আরোপ করেছেন। প্রথম তরঙ্গের শেষে তিনি বলছেন 'এক জ্বালা এক ব্যথা নিয়া/ তুমি কাঁদো, আমি কাঁদি, কাঁদে মোর প্রিয়া'। চোখের জলের কবি, বিরহ-ব্যথার কবি চোখের জলে প্রার্থনা করেন যেন আসছে জনম এমনি কাটে তাঁর ভালোবাসার মানুষকে ভালোবাসে। তিনি প্রেমের কবি, প্রেম পেতে এবং প্রেম দিতে

এসেছেন। কিন্তু সেই মনঃপূত প্রেম না পেয়ে তিনি হতাশ হয়ে যান না। তিনি নিজের ত্রুটি স্বীকার করে চোখের জলে আসছে জনমে ভালোবেসে কাটাবার প্রার্থনা রেখে যাচ্ছেন 'শেষ প্রার্থনা' কবিতায়।

●দেহজ প্রেমের প্রকাশ তাঁর কবিতায় থাকলেও কবিতায় অসংযম বা অশ্লীলতা নেই। শরীরী প্রেমের প্রকাশ থাকলেও তাঁর কবিতায় সর্বত্রই আমরা আত্মার হাহাকার শুনি। দেহবর্জিত প্রেম বা প্লেটোনিক লাভ নজরুলে একেবারে নেই তা নয়, তবে প্রেমের দেহজ আবেগের জায়গাটাও তিনি অস্বীকার করেননি। তিনি ছিলেন স্বাভাবিক অনুভূতির সত্য কবি। কবিতায় জীবনসত্যকে প্রকাশ করার জন্য তিনি কোনো আবডালের ব্যবহার করেননি। প্রেমের দেহজ আবেগক বা আবেদনকে তিনি প্রকৃতির রূপকেই বেশি প্রকাশ করেছেন। অশ্লীলতার অভিযোগে তাঁর যে কবিতাটি সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়েছিল তা হলো 'মাধবী প্রলাপ'। বসন্তের আগমনের সাথে প্রকৃতি কেমন করে রসলীলায় মেতে ওঠে তা তিনি এ কবিতায় দেখিয়েছেন। প্রকৃতির রূপকের অন্তরালে এক মানবহৃদয়ের অনুভবই এখানে ব্যক্ত হয়েছে।

● নজরুল কখনো বিরহে কাতর হন না। তিনি বেদনার কবি, বিরহের কবি; কিন্তু এই বিরহ তাঁকে আরো বেশি শক্তিশালী করে। 'দোলন-চাঁপা' কাব্যের 'বেলাশেষে' কবিতায় বিরহ-ব্যথা-উপেক্ষায় প্রতীজ্ঞা করছেন 'প্রেয়সীর কণ্ঠে কভু এই ভুজ এই বাহু জড়াবে না আর,/ উপেক্ষিত আমার এ ভালোবাসা মালা নয়, খর তরবার।' 'সিন্ধু' কবিতার দ্বিতীয় তরঙ্গে ঘোষণা দিয়ে তিনি বলছেন 'প্রেম করে না দুর্বল ওরে করে মহীয়ান'। যে প্রিয়া তাঁকে ছেড়ে গিয়েছে 'অভিশাপ' কবিতায় বলছেন জীবনের বিভিন্ন ক্ষণে এবং ঘটনায় সে প্রিয়াকে তাঁকে মনে করতেই হবে। অন্যায়-অবিচার হানা বিধাতার বুকে যিনি পদচিহ্ন রেখে প্রতিবাদের হুঙ্কারধ্বনি ছাড়তে পারেন তিনি প্রেম-বিরহে কাতর হবেন না এটাই স্বাভাবিক। নজরুল শক্তিশালী হৃদয়ের চোখের জলের কবি। প্রেম হতে প্রাপ্ত বেদনা তাঁকে অশ্রুসিক্ত করলেও ভগ্নহৃদয় করতে পারেনি।

●নজরুলের প্রেমের কবিতায় আমরা যেমন সুফিবাদের প্রভাব দেখি তেমনি দেখি বৈষ্ণবীয় প্রেমতত্ত্বের প্রভাব। দুই ধর্মের দুই নামের এই দুই তত্ত্বের গূঢ় কথা আসলে একই। স্রষ্টা এবং সৃষ্টি এক ও অবিচ্ছেদ্য সূত্রে গাঁথা এবং প্রেমিক স্রষ্টার সাথে মানুষের আত্মার সংযোগ রয়েছে, সৃষ্টিগত বিচ্ছেদের কারণে তারা দুই হয়ে গিয়েছে। সর্বদাই তাই প্রেমিকের জন্য প্রেমিকার হাহাকার ধ্বনি ধ্বনিত হতে থাকে। বৈষ্ণব প্রেম তত্ত্বে পরমাত্মা কৃষ্ণের জন্য জীবাত্মা রাধাদের আর্তনাদ আর সুফি তত্ত্বে স্রষ্টা আশেকের লাগি সৃষ্টি মাশুকের আর্তনাদ। বিচ্ছেদ এবং পুনরায় মিলনের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা, এই নিয়েই এই দুই তত্ত্বের কাজ এবং নজরুল তাঁর প্রেমের কবিতার কিছু কিছু কবিতাতে এর প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সুফিবাদ এবং বৈষ্ণব প্রেমতত্ত্বের প্রভাব থাকায় তিনি কখনো কখনো কবিতায় নিজেকে নারীরূপে উপস্থাপিত করেছেন। 'মুখরা', 'সাধের ভিখারিনী', 'বিবাগিনী' কবিতায় আমরা কবিকে নারীরূপে প্রকাশিত হতে দেখি। 'আপন-পিয়াসী' এবং 'পরশ-পূজা' কবিতায় জীবাত্মা-পরমাত্মা বা আশেক-মাশুকের মতো প্রিয়র সাথে কবি একাকার, যেটা সুফিবাদী সাধনার সর্বোচ্চ স্তরের বৈশিষ্ট্য।

●নজরুলের প্রেমের কবিতা ও গানে হৃদয়াবেগের তীব্রতার প্রকাশ অনেক বেশি। কোনো তত্ত্ব নয়, আবেগই তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে বিদ্যমান। নজরুল অনেকবারই কবিতায় বা প্রবন্ধে বলেছেন তিনি মনে যা আসে লেখেন, কাব্যকলার সকল নিয়ম মেনে তিনি সাহিত্য রচনা করতে আসেননি। তাঁর এই মনোভাব তাঁর প্রেমের কবিতার মধ্যে পাওয়া যায়।

●প্রেমে প্রিয় মানুষের দেয়া বেদনাকে মধুর হিসেবে নেয়া বা দৈহিক মিলনে একটা মাত্রার মধ্যে অধিকার, দাবি, আবদার এবং ভোগের জায়গা থেকে খানিকটা জবরদস্তিকে কাঙ্ক্ষিত বলে মনে করে প্রেমিকমনস্তত্ত্ব অনেক সময়। এ প্রবণতাকে 'মর্ষকাম' (Sadism) বলে। 'কামাত্মক আবেগের মধ্যে প্রিয় ব্যক্তিকে প্রহার করিবার, তাহার প্রতি মন্দ ব্যবহার করিবার এবং তাহাকে অপমান করিবার প্রবৃত্তি বোঝায়'। এই মনোবৃত্তি বিদ্যমান থাকলে সাহিত্যের তাঁর প্রকাশ নগণ্য। নজরুলের কবিতার কয়েক জায়গায় আমরা এর প্রকাশ পাই:

১."হেনার মতন বক্ষে পিষিয়া করিনু তোমারে লাল,
ঢলিয়া পড়িলে দলিত কমল জড়ায়ে বাহু মৃণাল।"

(সাজিয়াছি বর মৃত্যু উৎসবে, চক্রবাক)

২. "তুমি না চাহিতে আসিয়াছি আমি — সত্য কি এইটুক?
ফুল ফোটা শেষে ঝরিবার লাগি ছিলে না কি উৎসুক?
নির্মম-প্রিয়- নিষ্ঠুর হাতে
মরিতে চাহনি আঘাতে আঘাতে?
তুমি কি চাহনি মিলনের মাঝে নিবিড় পীড়নজ্বালা?
তুমি কি চাহনি কেহ এসে তব ছিড়ে দেয় গাঁথা মালা?"

(আড়াল, চক্রবাক)

● নজরুলের প্রেম সদা অতৃপ্ত, যৌবন তৃষ্ণায় তৃষ্ণার্ত এ কবির কবিতায় সর্বদাই একটা না-পাওয়ার হাহাকার ধ্বনিত। তাঁর ব্যক্তিগত প্রেম এবং কবিতার প্রেমের মূল কথা তিনি বলেছেন 'প্রেম-পিয়াসী প্রণয়-ভুখা শাশ্বত যে আমিই তৃপ্তিহারা'। এই অতৃপ্তি নিয়ে তিনি আজন্ম খুঁজেছেন তাঁর কাঙ্ক্ষিত প্রেমাষ্পদকে। অন্য কবিতায় তিনি বলেছেন:

"পোড়া প্রাণ জানিল না কারে চাই,
চিৎকারিয়া ফেরে তাই — 'কোথা যাই,
কোথা গেলে ভালোবাসাবাসি পাই?'
হু-হু করে ওঠে প্রাণ, মন করে উদাস-উদাস,...
মোর চেয়ে স্বেচ্ছাচারী দুরন্ত দুর্বার!
কোথা গেলে তারে পাই
যার লাগি এত বড় বিশ্বে মোর নাই, শান্তি নাই।"

(পূজারিণী, দোলন-চাঁপা)

● তাঁর কবিতায় একই সাথে প্রেমের ক্ষণকালীন রূপ এবং চিরন্তন রূপ প্রকাশিত হয়েছে। ক্ষণিকে বা স্বল্পকালীন প্রেম প্রকাশে তিনি বলেছেন:

"চেনার বন্ধু পেলাম নাকো জানার অবসর
গানের পাখি বসেছিলাম দু'দিন শাখার পর।"

(গোপন প্রিয়া, সিন্ধু হিন্দোল)

চিরন্তন প্রেম বা জন্ম-জন্মান্তরের প্রেমেও তিনি বিশ্বাসী ছিলেন:

১. "চির-সহচরি!
এতদিনে পরিচয় পেনু, মরি মরি!
আমারি প্রেমের মাঝে রয়েছ গোপন,
বৃথা আমি খুঁজে মরি জন্মে জন্মে করিনু রোদন।"

(অ-নামিকা)

২. "না থাকিলে এই একটু বিরহ– এ জীবন হতো কারা,
দুই তীরে তীরে বিচ্ছেদ তাই মাঝে বহে স্রোত-ধারা।
গত জনমের ছাড়াছাড়ি তাই এ মিলন এত মিঠে
সেই স্মৃতি লেখা শুভদৃষ্টির সুন্দর চাহনিতে।"

(মঙ্গলাচরণ)

● নজরুল প্রেম প্রকাশে কখনো প্রিয়কে করেছেন দেবতা, দেবতাকে করেছেন প্রিয়। 'অবেলার ডাক' কবিতায় দেখি তাঁর প্রিয়তম হচ্ছে দেবতা। 'পূজারিণী' কবিতায় প্রিয়নাম ধরে তিনি ইষ্টমালা জপেন এবং প্রিয়তমা 'পূজারিণী' তাঁর কাছে কখনো কখনো। এ কবিতায় অবশ্য তিনি প্রিয়াকে অনেক নামেই ডেকেছেন এবং প্রেমের নানান বাঁক পেরিয়ে পেরিয়ে এগিয়েছে কবিতাটি। 'বিবাগিনী' কবিতায় নিজেকে পথের ভিখারি বলে প্রেমাষ্পদকে বলছেন 'সুন্দর সন্ন্যাসী'। প্রেম মহাযোগী এই নাথের জন্য কবির অনন্ত হাহাকার সব সময়ই ছিলো।

● নজরুলের প্রিয়া সর্বদাই নামহারা অজানা কেউ, যে প্রিয়াকে তিনি চেয়েছেন কিন্তু পাননি পূর্ণ করে। 'নাম-হারা সেই আমার প্রিয়া, তারেই চেয়ে জনম গোঁয়ায়।।' 'পূজারিণী' বা 'অনামিকা' কবিতাতেও আমরা দেখি কোনো নির্দিষ্ট মানবীর প্রতি তাঁর নিবেদন নয়।

তাঁর প্রিয়া তাঁর মানস তুলিতে আঁকা এক কল্পমানবী যার বিহার এ ভুবনেই কিন্তু কবির কাছে সে চির অধরা:

"শিল্পী আমি, আমি কবি,
তুমি আমার আঁকা ছবি,
আমার-লেখা কাব্য তুমি, আমার-রচা গান।
চাইব নাকো, পরান ভরে করে যাব দান।"

(গোপন প্রিয়া)

'অ-নামিকা' কবিতায় তাই তিনি ব্যক্ত করছেন 'প্রেম সত্য চিরন্তন, প্রেমের পাত্র সে বুঝি চিরন্তন নয়'।

তাঁর প্রেমিকার এক অনির্দিষ্টতা সম্পর্কে আলোচকের মন্তব্য:

"নজরুলের নিকট প্রিয়া অনন্যা নয়; তাই একের জন্য প্রেমানুভূতিতে তাঁর চিত্তের পূর্ণ নিমজ্জন ঘটেনি। প্রেমিকার আরাধনায় তাঁর কবিতা ও গান হয়েছে বিচিত্রগতি ও বহুবর্ণা। নজরুলের কাছে প্রেমিকা হচ্ছে 'বিরহের মধু-মঞ্জুরী ', মিলনের মধুমালা নয়।" (আব্দুল কাদির, ১৯৮৯: ১৫১)

● হিংসা প্রেমের অন্যতম অনুষঙ্গ, কারো প্রিয় মানুষ তাকে বাদ দিয়ে অন্যকে নিয়ে সুখ সময় অতিবাহিত করুক তা আপাতভাবে কারো কাম্য হতে পারে না। খুব গভীরভাবে প্রিয় মানুষের কল্যাণ কামনা করলে প্রিয়সঙ্গ বঞ্চিত হয়েও প্রিয়র ভালো থাকা হৃদয়ে এক ধরনের প্রশান্তির অনুভূতি দেয় বটে, কিন্তু মানুষ তো প্রেমে নিজের চরিতার্থতা চায়। তাই প্রিয়র বুকে একটুকুতেই হিংসা জাগে বলে কবির হয় না থামা পথে। আবার 'অভিশাপ' কবিতায় কবিকে ছেড়ে অন্যকে নিয়ে স্থিত হওয়া প্রিয়াকে তিনি বারংবার মনে করিয়ে দিচ্ছেন সে কবিকে ভুলে একাগ্রতার সাথে অন্য মানুষকে নিয়ে থাকতে পারে না, নানাভাবে কবি এবং কবির স্মৃতি তার সামনে আসবে এবং সেদিন তিনি উপলব্ধি করবেন।

উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, ব্যক্তি মানুষ হিসেবে নজরুল যেমন সৎ, শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের অধিকারী, অন্যায়ের প্রতি আপোষহীন ছিলেন এই বৈশিষ্ট্যগুলো তাঁর

প্রেমানুভব এবং তা প্রকাশেও ভূমিকা রেখেছে। ভেতর-বাহিরে নজরুল আপাদমস্তক একজন স্বচ্ছ মানুষ ছিলেন। আর স্বচ্ছতা ছিলো বলেই পৃথিবীর ক্লেদ তাঁকে বেশি আক্রান্ত করতো, আর এই আক্রমণে কখনো তিনি শক্ত হয়ে প্রতিহত করেছেন কখনো ব্যথাজর্জর হয়ে অশ্রুবিসর্জন করেছেন। সমাজ, রাজনীতি, প্রেম প্রায় সকল জায়গায় তিনি একই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন।

অধ্যায় চার

নজরুলের প্রকৃতি চেতনার ধরন

কবিতায় প্রকৃতির উপস্থিতি চিরন্তন। প্রাচীন কবিতা থেকে শুরু করে অদ্যাবধি সকল কালের সকল কবির কবিতাতেই প্রকৃতি এসেছে অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ হিসেবে। তবে কালে কালে বা কবিতে কবিতে বদলেছে তাৎপর্য এবং প্রকাশভঙ্গি। কেউবা নিছক অলংকরণ করতে এনেছেন, কেউ বর্ণনার ছলে এনেছে, কেউ দৃশ্যায়ন করেছেন। চর্যাপদ, যা একান্তই বৌদ্ধ সহজিয়া তাত্ত্বিকদের সাধনতত্ত্বের কবিতা/গান তাতেও প্রকৃতি ছায়া আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে বাইরের দৃশ্যায়নের প্রয়োজনে, প্রেমের বা মিলনের আবহ তৈরির প্রয়োজনে, রাধার বিরহকাতর মনের ভাব প্রকাশে প্রকৃতি এসেছে। বৈষ্ণব পদাবলী, পুথি-সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য (বারম্যাসা) থেকে শুরু করে একবিংশ শতাব্দীর কবিদের কবিতায় প্রকৃতি তার সমহিমা নিয়ে উপস্থিত। এর মধ্যে রোমান্টিক গীতিকবিরা প্রকৃতিকে সর্বাধিক এনেছেন তাঁদের ভাব প্রকাশে। কিন্তু সব পর্যায়েই প্রায় একটা কাঠামোর মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে প্রকৃতি। আধুনিক সাহিত্যে, বিশেষ করে বিংশ শতকের পরের কবিরা ইংরেজি সাহিত্যে এবং বাংলা সাহিত্যেও প্রকৃতির প্রসঙ্গের বিশেষ পরিবর্তন নিয়ে আসে। এখানে নজরুলের একটা স্বাতন্ত্র্য আছে:

> "প্রকৃতিপ্রেমগীতিতেও নজরুল পূর্বসূরীদের তুলনায় অনেক বেশি যুগধর্মের প্রতিভূ। নজরুলের প্রকৃতি প্রেমানুভূতি অপরের চেয়ে অধিকতর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ভোগোন্মুখ। মানবিক প্রেমকে তিনি বিচিত্রভাবে প্রকৃতির মধ্যে আস্বাদন করেছেন। তাঁর মানবিক ও প্রাকৃতিক প্রেম অনেক জায়গায় একাকার হয়ে গিয়েছে।" (সুশীলকুমার, ১৯৯৭: ৩৪৭)

●নজরুল কাব্যে বাংলাদেশের ছয় ঋতুর পায় সকল ঋতুরই দেখা মেলে:

১.গ্রীষ্ম — দুপুর অভিসার (ছায়ানট),

২.বর্ষা– বরষা, মাতাল-হাওয়া, বাদলা দিনে

৩.শরৎ — রাখী বন্ধন

৪. হেমন্ত — অঘ্রাণের সওগাত, সবুজ শোভার ঢেউ খেলে যায়

৫. শীত — পউষ (দোলন-চাঁপা), অ-কেজোর গান (ছায়ানট)

৬. বসন্ত– চৈতী হাওয়া (ছায়ানট), ফাল্গুনী, মাধবী-প্রলাপ

●প্রকৃতির বিচিত্র উপাদানকে কবি কল্পনা করেছেন তাঁর মানসপ্রিয়ার প্রতিরূপ সত্তায়। দেহজ কামবাসনার অধিকাংশই কবি প্রকাশ করেছেন প্রকৃতির অন্তরালে। তাঁর অশ্লীলতার অভিযোগে অভিযুক্ত কবিতা 'মাধবী-প্রলাপ' -এ পুরো বক্তব্যই প্রকাশিত প্রকৃতির রূপকে। বনের বিভিন্ন বসন্ত আয়োজনের বর্ণনার আড়ালে খুবই স্পষ্ট হয়ে আছে মানবীয় দেহজ প্রেম। বালিকার রজঃ প্রাপ্তির পর যে বিকাশমান যৌবন এবং দেহজ-মিলনের প্রচ্ছন্ন বাসনা তা বসন্ত প্রকৃতির রূপকে প্রকাশিত:

"আসে ঋতুরাজ, ওড়ে পাতা জয়ধ্বজা;
হলো অশোক শিমুলে বন-পুষ্প রজা।
তার পাংশু চীনাংশুক
হলো রাঙা কিংশুক,
উৎসুক উন্মুখ
যৌবন তার
যাচে লুণ্ঠন-নির্মম দস্যু তাতার!
(মাধবী-প্রলাপ)

ভগ্নপক্ষ চক্রবাক 'চক্রবাক' কাব্যে হয়ে উঠেছে কবির প্রতিরূপ। সিক্ত ডানার পাখি একাকী গাছের ডালে বসে যেমন করে সাথীকে ডেকে ফেরে তেমনি করে কবি খোঁজেন প্রিয়তমাকে। বাদল-রাতের একলা পাখি কেঁদে কেঁদে ফেরে তার সঙ্গীর জন্য তেমনি কবির ব্যথিত প্রাণও কেঁদে ফেরে তাঁর প্রিয়ার জন্য। 'বাতায়ন-পাশে গুবাক-তরুর সারি' কবিতায় তাঁর প্রিয়া আর সুপারি গাছের সারি যেন একই সত্তা। সুপারী গাছের পাতার পরশ একাকী রাতে যেন প্রিয়ার শীতল করতলের স্পর্শ। 'কর্ণফুলী' কবিতায় কর্ণফুলী নদীকে কখনো নারীর প্রতিরূপে কখনো নরের প্রতিরূপে দেখেছেন তিনি।

●মনের উপর প্রকৃতির প্রভাব অনস্বীকার্য, 'বাদল-দিনে' কবিতায় বর্ষার মেদুর দিনে, ঝর-ঝর বারি পতনে বিরহী নারী যার প্রিয়তম বিদেশে তার অন্তরতম বেদনা জেগে ওঠে।

প্রকৃতিতে যখন বসন্ত আসে, ফুল-পাতার সৌন্দর্যে ভরে ওঠে চারপাশ, তখন মানবমনও বসন্তের বাসন্তী রঙে রাঙিয়ে ওঠে।

প্রকৃতির রূপকে কবি বিরহ প্রকাশ করেছেন:

"ঘর-দুয়ার আজ বাউল যেন শীতের উদাস মাঠের মতো,
ঝরছে গাছে সবুজ পাতা আমার মনের-বনের যত।"

(উন্মনা)

●প্রকৃতি কবির অনুভবের দোসর হয়ে প্রায়ই তাঁর সাথে সাথেই বিরাজ করেছেন। 'সন্ধ্যাতারা'কে তাঁর মনে হয় প্রিয়-হারা আকাশ-বধূ। তিনি যেমন করে প্রিয়আশে পথ পানে চেয়ে প্রতীক্ষায় থাকেন, সন্ধ্যাতারাও যেন তাঁর অনুভূতির দোসর। সিন্ধুকে সম্বোধন করেন 'হে বন্ধু মোর' বলে। যে দেবতা একদিন নারীভাবে ভাবিত কবিকে প্রণয় নিবেদন করে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গিয়েছে সে প্রিয় যদি ভালোবাসার খবর পায় তাহলে তার যে উচ্ছ্বলতা তা তিনি প্রকৃতির পটে দেখিয়েছেন। 'উঠবে খেপে অগ্নি-গিরি সেই পাগলের হুঙ্কারে/ ভূধর সাগর আকাশ বাতাস ঘূর্ণি নেচে ঘিরবে তারে।।' (অবেলার ডাক)। এসব আসলে কবি মনের ভেতরের বাঁধভাঙা উল্লাস যা তিনি নিজের গহীনে অনুভব করতেন, তারই শাব্দিক প্রকাশ করেছেন প্রকৃতির পটে।
'চৈতী হাওয়া' কবিতাতে পুরোটা জুড়েই প্রেম দেখিয়েছেন তিনি প্রকৃতির পটে। কবির প্রেম যেন গাছ-ফুল লতায় এলানো:

"পড়ছে মনে টগর চাঁপা বেল চামেলি জুঁই,
মধুপ দেখে যাদের শাখা আপনি যেত নুই।
হাসতে তুমি দুলিয়ে ডাল,
গোলাব হয়ে ফুটত গাল!
থককমলি আঁউরে যেত তপ্ত ও-গাল ছুঁই!
বকুল-শাখা ব্যাকুল হতো, টলমলাত ভুঁই!"

(চৈতী হাওয়া)

●পারসনিফিকেশন বা নরাত্বরোপ সাহিত্যের প্রকরণের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য। হৃদয়ের নানামুখী অনুভূতি এবং অভিব্যক্তি সব সময় প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ করা যায় না, গেলেও নান্দনিকতা হারায়। বাহ্যপ্রকৃতিতে নিজের বেদনা সঞ্চার করে বা বাহ্যপ্রকৃতিতে নিজের বেদনার অনুরণন দেখে মানবমন এক ধরনের মোচন অনুভব করে। 'শেষের গান' কবিতায় বিদায়-ব্যথা বোঝাতে নজরুল আশ্রয় নিয়েছেন প্রকৃতির:

"আমার বিদায়-রথের চাকার ধ্বনি ঐ গো এবার কানে আসে।
পুবের হাওয়া তাই কেঁদে যায় ঝাউএর বনে দীঘল শ্বাসে।।
ব্যথায় বিবশ গুলঞ্চ ফুল
মালঞ্চে আজ তাই শোকাকুল,"

(শেষের গান)

পুবের হাওয়ার কান্না, গুলঞ্চ ফুলের ব্যথা আর মালঞ্চ ফুলের শোকাকুল হওয়া তো মানব মনেরই ব্যথা-বিবশ অবস্থার প্রকাশ। 'সিন্ধু' কবিতার দ্বিতীয় তরঙ্গে ঝড়কে সেনাপতি, ঢেউকে সেনা, মাছকে নৌ-সেনা, ঝিনুককে হেরেম-বাঁদি, নৌকা-জাহাজকে কপোত-কপোতী, প্রভৃতিরূপ ব্যক্তিসত্তা আরোপ করে কবির মনোভাব প্রকাশ করেছেন। 'রাখিবন্ধন' কবিতায় আকাশ আর পৃথিবীর সই পাতানোর ফিরিস্তি বর্ণনা করা আছে। সই তো আকাশ-ধরণী পাতায় না; কবি মনের যে বন্ধুত্বের রস তার প্রকাশ করেছেন এ কবিতায়। অলকা, বলাকা, কুয়াশা, তারকা, চাঁদ, বাতাস, মেঘ, সকলে মিলে সই পাতানোর এই উৎসবে যার যার ভূমিকা রেখেছে। মনে হয় যেন কোন উৎসব-অনুষ্ঠানে যেমন করে সকল সখা-সখী, ভাই-বোন মিলে সকল কিছুর আয়োজন করে সাজ সজ্জা করে অনুষ্ঠান সফল করে তোলে তেমনি করেছে এ কবিতায় প্রকৃতির সকল অনুষঙ্গ। শেষে:

"হাসিয়া উঠিল আলোকে আকাশ, নত হয়ে এলো পুলকে,
লতা-পাতা-ফুলে বাঁধিয়া আকাশ ধরা কয়, 'সই, ভূলোকে
বাঁধা প'লে আজ', চেপে ধরে বুকে লজ্জায় ওঠে কাঁপিয়া,
চুমিল আকাশ নত হয়ে মুখে ধরণীরে বুকে ঝাঁপিয়া।"

(রাখিবন্ধন)

●যখন মানুষের কাছ থেকে আঘাত পেয়েছেন তখন প্রকৃতির কোলে কবি আশ্রয় পেয়েছেন, সকলেই তাই পায়। মানুষকে তো সবশেষে প্রকৃতির কোলেই চির-আশ্রয় নিতে হয়। একলা পথিক যখন আশ্রহীন হয়ে পথ হারিয়ে দিকভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ান তখন 'বনের ছায়া গভীর ভালোবেসে/ আঁধার মাথায় দিগবধূদের কেশে,/ ডাকতে বুঝি শ্যামল মেঘের দেশে/ শৈলমূলে শৈলবালা নাবে–'। (পথহারা) 'পূজারিণী' কবিতাতে কবির বিরহে 'কেঁদে ওঠে লতা-পাতা/ ফুল পাখি নদী-জল/ মেঘ বায়ু কাঁদে সবি অবিরল,'। একলা বনের পথে যখন তিনি চলেন তখন সন্ধ্যাতারা তাঁকে ডাকে। মানবমাতার কাছে কখনো বা আশ্রয় না পেলেও ধরিত্রীমাতার কাছে ঠিকই আশ্রয় মেলে। আর সচেতন মানুষ মাত্রেই জানে যে তার অন্তিম আশ্রয় ধরা মায়ের গর্ভেই হবে এবং সেটা খুবই নিকটে।

● বিপ্লব-বিদ্রোহের বাণী প্রকাশ করতেও তিনি নিয়েছেন প্রকৃতির আশ্রয়। নিজের মনের নানা ভাব সঞ্চারিত করে দিয়েছেন প্রকৃতির মধ্যে। নজরুল নিজের ভেতর উদ্দামতায় যখন পুরাতন জরাজীর্ণতা ভেঙে নতুন সৃষ্টি সুখের উল্লাসে উল্লসিত, তখন 'আসল আশিন শিউলি শিথিল/ হাসল শিশির দুবঘাসে', সাগর, মরু, পাহাড়, তরু, আকাশ, বাতাস সকলই কবির অনুভবের দোলায় দুলিত হয়।

সর্বোপরি বলা যায়, রোম্যান্টিক কবিদের বস্তুগত বাহ্যত জগতের বাইরে আশ্রয়ের জায়গাই ছিলো প্রকৃতির অবারিত ক্ষেত্র। এই প্রকৃতিক্ষেত্রেই তাঁরা তাঁদের মনের ভাবকে প্রকাশ করেছেন। একজন মানুষের সাথে একজন মানুষ আজীবন থাকলেও মনের সংযোগ ঘটা খুব দূরুহ। কিন্তু প্রকৃতিলোকে সহজেই মানুষ মিশে যেতে পারে কারণ মানুষ প্রকৃতিরই অংশ। প্রকৃতির এই বিস্তীর্ণ পট একেক জনের কাছে একেক রকমভাবে ধরা দিয়েছে, ব্যক্তিভেদে তারও প্রকাশেও এসেছে ভিন্নতা, তেমনি নজরুলেও আছে তাঁর নিজস্ব ঢংয়ে প্রকৃতিকে আত্মস্থ করা এবং শব্দরূপ দেয়া।

অধ্যায় পাঁচ

রোমান্টিকতা ও নজরুল

কাজী নজরুল ইসলাম মর্মে মর্মে রোমান্টিক কবি। রোমান্টিকতা একটি আন্দোলনের নাম। এটি মূলত পশ্চিমা বিশ্বের একটি বুদ্ধিবৃত্তিক ধারা বা আন্দোলনের নাম যা সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, স্থাপত্য, সমালোচনা এবং ইতিহাস-লিখনের ক্ষেত্রে নতুন ধারার সৃষ্টি করে। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক থেকে শুরু হয়ে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এই আন্দোলন সক্রিয় ছিল। সাধারণ ক্লাসিসিজম এবং নব্য-ক্লাসিসিজমের নিয়মানুবর্তিতা, সৌষ্ঠব, ভারসাম্য, আদর্শিকতা, স্থিরতা এবং যৌক্তিকতাকে বর্জন করার মাধ্যমে রোমান্টিকতার উদ্ভব ঘটেছিল। এছাড়া একে অষ্টাদশ শতকের যুক্তিবাদ ও ভৌত বস্তুবাদের সাধারণ প্রতিবাদ হিসেবেও আখ্যায়িত করা যায়। রোমান্টিকতার মূল প্রতিপাদ্য ছিল যুক্তিহীনতা, কল্পনা, স্বতঃস্ফূর্ততা, আবেগ, দৃষ্টিভঙ্গি এবং লৌকিকতা বহির্ভূত স্বজ্ঞা। রোমান্টিক সাহিত্যিকরা লেখনীকে কোনো নির্দিষ্ট কাঠামোয় বেঁধে প্রকাশের পক্ষে ছিলেন না। তাঁরা সাহিত্যের উৎস হিসেবে চেতন মনের তুলনায় অবচেতন মনকেই বেশি প্রাধান্য দিতেন। 'এক অর্থে রোম্যান্টিকতা মানসিক অনুধাবনার একটি বিশেষ ভঙ্গি যার কোনো যুগ-কাল নেই; রোম্যান্টিকতা মানুষের শিল্পবোধের সহজাত ও সমবয়সী। জীবন ও জগৎ এবং তাদের বহুবর্ণিল রূপভঙ্গিমাকে অনুধাবন ও প্রকাশের একটি বিশিষ্ট প্রক্রিয়ার নাম রোম্যান্টিকতা'।

নজরুল যদিও স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের কবি, তবুও তাঁর কবিতাকে অনায়াসে রোমান্টিক কবিতার বৈশিষ্ট্যে ফেলে পড়া যায়, ব্যাখা করা যায়। নজরুলের রোম্যান্টিকতা সম্পর্কে গবেষক সৈয়দ আকরম হোসেন তাঁর 'বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' গ্রন্থে বলেছেন:

> "নজরুল ইসলাম মূলত রোম্যান্টিক কবি। রোম্যান্টিকতার বিবিধ চারিত্র্য সঞ্চারিত হয়েছিল নজরুলের মানসলোকে। সূক্ষ্ম রহস্যবোধের চেতনা, মননপ্রধান উদ্দাম কৌতুহলবোধ, প্রকৃতিলোকে আত্মভাবের বিস্তারণ এবং অপ্রাপণীয়ের জন্য অনিঃশেষ

> হাহাকার নজরুলের কবিচৈতন্যের প্রধান রোম্যান্টিক বৈশিষ্ট্য। প্রেমের কবিতায় নজরুলের এই রোম্যান্টিক মানসতার প্রোজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছে। রোম্যান্টিক মানসতার দ্বিবিধ প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি — একদিকে অনুধ্যেয় সৌন্দর্য এবং প্রেমের জন্য বাসনা, ব্যর্থতার অসহনীয় বেদনা, ফলত নৈঃসঙ্গ ও একাকিত্বের শিকার; অপরদিকে ইতিহাস-ঐতিহ্য-পুরাণ কিংবা দর্শনে সংলগ্ন হয়ে আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবরূপ দেওয়ার জন্য দ্রোহ-বিদ্রোহ-প্রতিবাদ-সংগ্রাম।" (আকরম হোসেন, ১৯৮৫: ৮২)

অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে ইউরোপে উদ্‌ভূত এ আন্দোলন শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীতের গতানুগতিক ধারা থেকে বের হয়ে এসেছিল। উনবিংশ শতক ধরে রোমান্টিক সাহিত্য এবং এ ধারার সাহিত্যিকেরা প্রভাব বিস্তার করেছিল আর্টের বিভিন্ন শাখায়। তাঁরা শিল্প-সাহিত্যের নৈর্ব্যক্তিক ভাব প্রকাশকে অস্বীকার করে তাঁরা ব্যক্তির আবেগকে প্রাধান্য দিলেন। শিল্পসমৃদ্ধ ইউরোপে তাঁরা নিয়ে এলেন প্রকৃতি বন্দনা, বঞ্চিতের প্রতি সহানুভূতি, অন্যায়ের প্রতিবাদ, অতিপ্রাকৃতের প্রতি আগ্রহ এবং এক গূঢ় বেদনাবোধ এলো কবিতায়, চিত্রকলায়। রোমান্টিকতার ধারণাকে ঠিক একটা নির্দিষ্ট কাঠামোয় বেঁধে ফেলা যায় না, বিভিন্ন লক্ষণের সমন্বয়ে এর বহিঃপ্রকাশ। এর উৎপত্তি ধারণা থেকে পরবর্তীতে বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে, সেদেশের নিজস্ব সংস্কৃতির সাথে মিলে কিছু নিজস্ব রূপ ধারণ করে নিয়েছে। ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব অনুভবের স্বীকৃতির মধ্যেই মূলত রোমান্টিকতার বীজ নিহিত। ১৭৯৮ সালে ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং কোলরিজের 'Lyrical Ballads' প্রকাশিত হবার সাথে এ ধারার সাহিত্যের আনুষ্ঠানিক উন্মোচন হয়। পরবর্তীতে শেলী, কিটস, বায়রনরা এ ধারার অন্যতম কবি ছিলেন।

'Lyrical Ballads' এর দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় উৎকৃষ্ট কবিতার বৈশিষ্ট্য বলতে গিয়ে ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং কোলরিজ বলছেন 'the spontaneous overflow of powerful feelings'. এই বৈশিষ্ট্যে নজরুলের কবিতা উদ্ভাসিত। ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে খোন্দকার আশরাফ হোসেন বলেন:

> "প্রকৃতি, সাধারণ মানুষের জীবনযাপন, অতি তুচ্ছ বিষয় অবলম্বন করে কবিচিত্তের আনন্দ, বিষাদ, বিস্ময়ের অভিব্যক্তি, অতীন্দ্রিয় অনুভবের নিবিড় স্পর্শ, কোনোরকম নীতিতত্ত্ব, উপদেশ, আভিজাত্য ইত্যাদি সম্পর্কে কোনোরকম প্রথাসিদ্ধ আনুগত্যের

চিহ্নমাত্র না থাকা, সমস্ত কিছুকেই হৃদয়ানুভবের আত্মমগ্ন, সরল চরিতার্থতা, বোধের উপলব্ধির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা অথবা মধুর অনুভবে নিজেকে বিস্তীর্ণ করে দেয়া, স্বগতোক্তির ভঙ্গিতে মৃদু উচ্চারণ এবং অভিব্যক্তির সম্পূর্ণ আয়তনে একান্ত ব্যক্তিগত অনুভবের ঘনত্ব — এই নিয়েই ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা।" (সংকলিত, হাবিবুর রহমান, ২০১৪: ১৫২)

নজরুলের কবিতার স্বতঃস্ফূর্ততার বৈশিষ্ট্যকে বুদ্ধদেব বসু 'হৈ চৈ' বলেছিলেন। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বা সম্ভবত তিনিই একমাত্র কবি যাঁর কবিতায় feelings এর overflow পরিপূর্ণরূপে ছিল। মানুষের মনের স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতিকে নানান নিয়ম এবং ছন্দের বেড়াজালে ফেলে আবদ্ধ করে যে কাব্যচর্চা দীর্ঘদিন চলে এসেছে তার ব্যতয় হলো। কোনো আবডাল ছাড়াই প্রকাশিত হতে শুরু হলো ব্যক্তির মনের অকৃত্রিম আবেগ। পূর্বের তুচ্ছ ও উপেক্ষিত বিষয়ই রোম্যান্টিক কবিতার বিষয় হয়ে উঠল। আপাত তুচ্ছকেই মহিমান্বিত করা রোম্যান্টিক সাহিত্যতত্ত্বের অন্যতম লক্ষণ। নজরুল এ প্রকাশে অবশ্যই অনবদ্য। ব্যক্তিবাদ রোম্যান্টিকতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। নজরুলের কবিতার দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখি কবি নজরুল অপেক্ষা ব্যক্তি নজরুলই আমাদের সামনে বেশি ধরা দেয়। কোথাও কোথাও তিনি ঘোষণা দিয়ে তাঁকে সামনে এনেছেন:

"সেদিন কবিই কেঁদেছিল শুধু? মানুষ কাঁদেনি সাথে?
হিংসাই শুধু দেখেছ? দেখনি অশ্রু নয়ন-পাতে?"

(হিংসাতুর, চক্রবাক)

কবির ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে যারা জানে, তারা খুব সহজেই এই কবিতার সাথে ব্যক্তি নজরুলকে সংশ্লিষ্ট করতে পারবে।

রোমান্টিক কবিতার আর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো বাইরের প্রকৃতির উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি। অষ্টাদশ শতকের শিল্প বিপ্লবের ফলে ইউরোপের প্রকৃতি হয়ে পড়ে রুক্ষ, প্রাণহীন। ফলে, রোমান্টিক সাহিত্য আন্দোলনে প্রকৃতি হয়ে উঠল মানবমনের সহচর,

কোথাও যেন প্রকৃতিই মানব। এ প্রবণতা নজরুলের কবিতায় উল্লেখযোগ্য হারে উপস্থিত। বিশেষ করে তাঁর প্রেমের কবিতায় অন্যতম অনুষঙ্গ হয়ে এসেছে প্রকৃতি। 'চক্রবাক' ও 'সিন্ধু-হিন্দোল' কাব্যের প্রায় সকল কবিতাতেই আলাদা করা যায় না প্রকৃতি আর ব্যক্তি নজরুলকে। অপেক্ষমাণ বিরহী চক্রবাকই যেন কবি, আর বিক্ষুব্ধ উত্তাল সিন্ধু যেন বিক্ষুব্ধ কবিমনেরই রূপক। একলা চাতক, বসন্ত উন্মাদনায় কাঁপা ফুল-পাখি সবই যেন মনের এক একটা রূপমাত্র।

রোমান্টিক কবিতার বিষয় হিসেবে ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং কোলরিজ বলছেন 'common life' থাকবে, এবং ভাষাভঙ্গির কথা বলছেন 'a selection of language really used by men'. এই জায়গাতে নজরুল অনন্য। নজরুলের সমসময়ে যাঁরা স্বীকৃত আধুনিক কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ এবং প্রচার করেছেন তাঁদের কবিতার বিরুদ্ধে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ ছিল। অপরদিকে নজরুল ছিলেন যুগমানব, কল্পনার বাসিন্দা নন। তাঁর কবিতার ভাষা আপামর জনতার ভাষা। তাঁর বিরহ যেন আমাদের সকলের বিরহ। কবিতার ভাষায় খুব সহজেই কবিতার ছন্দ-শব্দের আড়ালে যে সংবেদনশীল মন সেই মনকে সহজেই দেখতে পাওয়া যায়। অকৃত্রিম আবেগের কবি নজরুল ব্যথায় ব্যথিত হয়ে তার প্রকাশ যেমন তীব্রভাবে করেছেন, আনন্দকেও সহজভাবে প্রকাশ করেছেন। জীবনের আনন্দ এবং বেদনা যেখানে যে অনুভূতির সম্মুখীন তিনি হয়েছেন তাইই তিনি সহজ ভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং লেখায় প্রকাশ করেছেন। তাঁর কবিতার ভাষা যেন সহজ-সরল মানুষেরই ভাষা যা রোম্যান্টিক সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য পূরণ করে।

কীটস যেমন তাঁর কবিতার মন্ত্র হিসেবে বলেছিলেন 'Beauty is truth, truth is beauty', তেমনি নজরুলের কাব্যচর্চারও কেন্দ্র ছিলো সত্য এবং সুন্দর। তিনি ১৯২৯ সালে কলকাতার আলবার্ট হলের এক সংবর্ধনায় বলেছিলেন, 'আমি শক্তি-সুন্দর রূপ-সুন্দরকে ছাড়িয়ে আজও উঠতে পারিনি। সুন্দরের ধেয়ানী দুলাল কীটসের মতো আমারও মন্ত্র– Beauty is truth, truth is beauty'. তাঁর কবিতার চেয়েও তিনি তাঁর প্রবন্ধে অনেক বেশি

সুন্দরের জয়গান গেয়েছেন, সত্যের জয়গান গেয়েছেন। তাঁর সত্যকেই একমাত্র ধ্রুব বলে তিনি ধারন করেছেন।

ইংরেজি সাহিত্যের অন্যতম রোম্যান্টিক কবি বায়রনের কবিতার প্রবল জীবন-বাসনা আর জীবনের প্রতি তীব্র আকাঙক্ষা নজরুলের কবিতাও সমভাবে পাওয়া যায়। দুজনের কবিতায় প্রবল শক্তিমত্তায় অন্যায়-অনাচারকে দলে যাবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বায়রনের 'চাইল্ড হেরল্ড' বা 'ডন জুয়ান' কাব্যের যে প্রবাহমান স্বচ্ছ আবেগ তা নজরুলেও দৃশ্যমান। জীবনকে পান করার আকণ্ঠ তৃষ্ণা, অপ্রাপ্তিতে অপরাধবোধ, নিবিড় সততায় গভীর সঞ্চারী আবেগকে প্রকাশ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য দু'কবিতেই বিদ্যমান। 'সিন্ধু' শিরোনামের তিন তরঙ্গের কবিতায় নজরুল যেমন তাঁর ব্যক্তি অনুভবের সাথে সিন্ধুকে মিলিয়েছেন তেমনি আছে লর্ড বায়রনের 'Ode to the Ocean' কবিতাও। সাহিত্যচর্চার শুরু থেকেই সাহিত্যস্রষ্টারা প্রকৃতিকে বন্দনা করেছেন, প্রকৃতির রং-রূপ-রসে মুগ্ধ হয়ে সাহিত্য-শিল্প-চিত্রকলায় এর প্রকাশ ঘটিয়েছেন। প্রকৃতি বন্দনার এই বিষয়টিকে 'প্যাগানিজমের' আওতায় ফেলেও দেখা যেতে পারে। প্যাগানিজম বা পৌত্তলিকতাবাদ বিভিন্ন মহাদেশজুড়ে আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের মধ্যেই বিশেষভাবে প্রথিত ছিল। প্যাগানিজম এর আদিরূপটি ভিন্ন । এটি মূলত প্রকৃতি পূজার সঙ্গেই সম্পৃক্ত ছিল।প্রকৃতির শক্তির বিভিন্ন রূপ ও সর্বেশ্বরবাদ এর মূল ভিত্তি ছিল। পরবর্তীতে বিভিন্নভাবে ধর্মীয় বোধ পরিবর্তিত হলেও প্রকৃতি প্রতি মানুষের যে স্বভাবজাত ঘনিষ্ঠতা তা কখনোই কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি, হবেও না। কারণ মানুষ প্রকৃতিরই অংশ এবং প্রকৃতি সকল উপাদানের সাথেই মানুষ আত্মিক সম্পর্ক বিদ্যমান। বায়রন যেমন সমুদ্র বন্দনায় বলেছেন:

> "Roll on, thou deep and dark blue Ocean—roll!
> Ten thousand fleets sweep over thee in vain;
> Man marks the earth with ruin—his control
> Stops with the shore;—upon the watery plain
> The wrecks are all thy deed, nor doth remain
> A shadow of man’s ravage, save his own,
> When for a moment, like a drop of rain,

He sinks into thy depths with bubbling groan,

Without a grave, unknelled, uncoffined, and unknown."

(classicalpoets.org)

নজরুলের 'সিন্ধু' শিরোনামের তিন তরঙ্গের কবিতায় সিন্ধুকে নিয়ে নজরুলের বন্দনা দেখতে পাই। সিন্ধু কখনো তাঁর বন্ধুসম হয়ে এসেছে, কখনো যেন সিন্ধুই কবি। রোমান্টিক কবিদের মনে প্রকৃতির প্রভাব অনেক বেশি, প্রকৃতির অন্যতম অনুষঙ্গ সমুদ্র নিয়ে প্রায় সকল রোমান্টিক কবিই লিখেছেন। তিন তরঙ্গের কবিতায় নজরুলের অন্তর্প্রকৃতির ছাপ খুবই স্পষ্ট। নানা মাত্রায় তিনি সমুদ্রকে দেখেছেন এবং কবিতায় প্রকাশ করেছেন। প্রথম তরঙ্গে যেমন তিনি বলছেন:

"বন্ধু ওগো সিন্ধুরাজ! স্বপ্নে চাঁদ-মুখ
হেরিয়া উঠিলে জাগি', ব্যথা ক'রে উঠিল ও-বুক।
কী যেন সে ক্ষুধা জাগে, কী যেন সে পীড়া,
গ'লে যায় সারা হিয়া, ছিঁড়ে যায় যত স্নায়ু শিরা!
নিয়া নেশা, নিয়া ব্যথা-সুখ
দুলিয়া উঠিলে সিন্ধু উৎসুক উন্মুখ!
কোন্ প্রিয়-বিরহের সুগভীর ছায়া
তোমাতে পড়িল যেন, নীল হ'ল তব স্বচ্ছ কায়া!
সিন্ধু, ওগো বন্ধু মোর!"

(সিন্ধু, প্রথম তরঙ্গ)

শেলির কবিতার মননশীলতার সাথে আবেগের সংযোগ, আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা ও বিশালতা অপূর্ণতার বিষাদবোধ জাগায়। রোম্যান্টিকতার সঙ্গে অমর্ত্য অতৃপ্তির অনুভব ওতপ্রোতোভাবে জড়িত। এই রোম্যান্টিক বিষাদ বা 'মেলানকলি' শেলির মতো কেউই ব্যক্ত করতে পারেনি। পাশাপাশি জীর্ণ পুরাতনকে উড়িয়ে নব-নবীনের আগমনী উচ্চারণের প্রবণতা শেলি এবং নজরুল দুজনের কবিতাতেই প্রবল। পুরাতন জীর্ণতা

ভেঙে নতুন সৃষ্টির উদ্দামতা দুজনের কবিতারই মূলমন্ত্র। 'বিদ্রোহী', 'সাম্যবাদী', 'বিষের বাঁশি', প্রভৃতি কাব্যের কবিতাগুলোতে নজরুল বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রতিবাদ করেছেন অনিয়ম, অন্যায়, অনাচারের বিরুদ্ধে। ঔপনিবেশিক শাসনের জুলুম, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা, শ্রমজীবী মানুষের শোষণ প্রভৃতি বিরুদ্ধে নজরুলের বলিষ্ঠ উচ্চারণ সবসময়ই ছিলো। ব্যক্তিসত্তার কল্পিত শুভ পৃথিবী নির্মাণে আগে ভাঙতে হয় পুরাতন জঞ্জাল, মনে লালন করতে হয় দুর্দমনীয় বিদ্রোহ। রোম্যান্টিক কবিদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই বিদ্রোহ লালন। নজরুলের ভূলোক, দ্যুলোক, গোলক ভেদ করে সঞ্চারিত বিদ্রোহবাণী শেলীর Prometheus - এও দেখা যায়:

> No change, no pause, no hope! Yet I endure.
> I ask the Earth, have not the mountains felt?
> I ask yon Heaven, the all-beholding Sun,
> Has it not seen? The Sea, in storm or calm,
> Heaven's ever-changing shadow, spread below,
> Have its deaf waves not heard my agony?
> Ah me! alas, pain, pain ever, forever!
>
> (Act 1, Prometheus Unbound, P.B. Shelley, knarf.english.upenn.edu)

মৃত্যুচিন্তা এবং মৃত্যুকে মহিমান্বিত করে দেখা রোম্যান্টিক কবিদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথের কাছে মৃত্যু ছিল শ্যামসমান। নজরুল তাঁর 'সাজিয়াছি বর মৃত্যু উৎসবে' কবিতায় মৃত্যু আর প্রেয়সীকে এক করে দেখিয়েছেন। অনিবার্য অপার্থিব মায়ালোকের হাতছানি যারা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারে মৃত্যু তাদের কাছে অনেক আরাধ্য। ইংরেজি সাহিত্যের রোম্যান্টিক কবি John Done মৃত্যুকে সম্বোধন করে বলেছেন:

> "Death, be not proud, though some have called thee
> Mighty and dreadful, for thou art not so;
> For those whom thou think'st thou dost overthrow
> Die not, poor Death, nor yet canst thou kill me.
> From rest and sleep, which but thy pictures be,
> Much pleasure; then from thee much more must flow,

And soonest our best men with thee do go,
Rest of their bones, and soul's delivery.
Thou art slave to fate, chance, kings, and desperate men,
And dost with poison, war, and sickness dwell,
And poppy or charms can make us sleep as well
And better than thy stroke; why swell'st thou then?
One short sleep past, we wake eternally
And death shall be no more; Death, thou shalt die.

(poetryfoundation.org)

প্রকৃতি বন্দনার কথা আমরা পূর্বেই বলেছি কিছুটা। ইংরেজি সাহিত্যের অন্যতম রোম্যান্টিক কবি পি.বি. শেলির কবিতার দিকে একটু দৃষ্টি দেয়া যাক:

Thou on whose stream, 'mid the steep sky's commotion,
Loose clouds like Earth's decaying leaves are shed,
Shook from the tangled boughs of Heaven and Ocean,
Angels of rain and lightning: there are spread
On the blue surface of thine airy surge,
Like the bright hair uplifted from the head

Of some fierce Maenad, even from the dim verge
Of the horizon to the zenith's height,
The locks of the approaching storm."

(Ode to the West Wind, P.B. Shelley, poetry.org)

নজরুলের প্রেম-প্রকৃতির প্রায় সকল কবিতাতেই প্রকৃতির বিভিন্ন মাত্রার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। আর সব রোমান্টিক কবিদের মতো তিনিও মনের অব্যক্ত কথাকে ভাষা দিতে আশ্রয় নিয়েছেন প্রকৃতির বিভিন্ন অনুষঙ্গের। কখনো প্রকৃতির রূপকে প্রকাশ করেছেন

মনের ভাব, কখনো যেন প্রকৃতিই হয়ে উঠেছে তাঁর প্রতিরূপ। বৃক্ষ, লতা, ফুল, পাখি, চাঁদ, সূর্য, পাহাড়, নদী কিছুই বাদ যায়নি তাঁর অনুভবের দোসর হওয়া থেকে। 'রাখিবন্ধন' কবিতায় যেমন তিনি বলেছেন:

"সই পাতাল কি শরতে আজিকে স্নিগ্ধ আকাশ ধরণি?
নীলিমা বাহিয়া সওগাত নিয়া নামিছে মেঘের তরণি!
অলকার পানে বলাকা ছুটিছে মেঘ-দূত-মন মোহিয়া
চঞ্চুতে রাঙা কলমির কুঁড়ি – মরতের ভেট বহিয়া।
সখীর গাঁয়ের সেঁউতি-বোঁটার ফিরোজায় রেঙে পেশোয়াজ
আশমানি আর মৃন্ময়ী সখী মিশিয়াছে মেঠো পথ-মাঝ।
আকাশ এনেছে কুয়াশা-উড়ুনি, আশমানি-নীল কাঁচুলি,
তারকার টিপ, বিজুলির হার, দ্বিতীয়া-চাঁদের হাঁসুলি।"

(রাখিবন্ধন)

প্লেটোনিক লাভ বা দেহবহির্ভূত প্রেম প্রেম ধারণার অন্যতম প্রপঞ্চ। 'প্লেটোনিক ভালোবাসা বা আত্মিক ভালোবাসা হল সেই শুদ্ধতম ভালোবাসা যাতে কামনা বাসনার কোন স্থান নেই। প্লেটো নিজে এ জাতীয় কোনো শব্দবন্ধ ব্যবহার করেননি। তাঁর দর্শনকে ভিত্তি করে শব্দবন্ধটি উৎপন্ন হয়েছে। প্লেটোর দর্শনে বলা হয় এমন ভালোবাসা যা দুটি প্রেমাসক্ত মানুষকে দৈহিক আকর্ষণ থেকে আত্মিক বন্ধনে উন্নীত করে সর্ব্বোচ পর্যায়ে প্রবেশ করবে। সেই পর্যায়ের প্রেমে শরীর বিষয়টি অনুপস্থিত, অথচ পরিপূর্ণ ভালোবাসা বিরাজ করবে। প্লেটোর এই দর্শনকে তাঁর এককালীন ছাত্র অ্যারিস্টটল সামান্য ভিন্নতর রূপ দান করেন। তাঁর তত্ত্ব অনুযায়ী সর্বোৎকৃষ্ট সেই প্রেম যেখানে যৌনতা আগাগোড়াই অনুপস্থিত। কেবলই হৃদয়ের বন্ধন। একে Friendly love-ও বলা হয়। এ ভালোবাসা আগাগোড়া সম্পূর্ণ কামগন্ধহীন, কেবলই নিজেকে বিলিয়ে দেয় পরিবর্তে নেয় না কিছুই। এমন নিষ্কাম প্রেম, যে প্রেম রাজাধিরাজের মতো দু'হাত ভ'রে শুধু দিয়ে যায়, নেয় না কিছুই। যাকে লাভ করার জন্যে দীর্ঘ প্রতীক্ষা আর দুঃসহ যন্ত্রণাসমূহও সহ্য করতে হয় মুখ বুজে। এরূপ ভালবাসায় থাকে না কোনও চাহিদা, থাকে কেবল অনন্ত ভালোবাসা। যৌনতার কোনও স্থান নেই প্লেটোনিক ভালোবাসায়। এ প্রেম ভালোবাসার সর্ব্বোচ্চ

পর্যায়। এ এক প্রচণ্ড ভালোবাসা যখন প্রেমকে মনে হয় স্বর্গ সুখ।' বাংলা সাহিত্যে আমরা রাবীন্দ্রিক প্রেম প্রকাশকে খানিকটা দেহবর্জিত আত্মিক প্রেমের আরাধনা হিসেবে দেখি। কিন্তু রোম্যান্টিক ধারার কবিরা ছিলেন স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের কবি। তাঁরা সত্য আবেগকে সহজ ভাষায় প্রকাশ করেন। নজরুলের প্রেমের কবিতাগুলোতে আমরা দেহজ প্রেমের আরাধনাই বেশি দেখি। 'অনামিকা' কবিতাসহ অন্যান্য আরো অনেক কবিতায় এই দেহজ প্রেম আমরা দেখতে পাই। পাশ্চাত্য কবিদের এই দেহজ প্রেম সম্পর্কে গবেষক সুশীলকুমার বলেছেন:

"দেহগত প্রেমের এই তীব্রতা Ben Jonson, Robert Herrick, Robert Burns, John Keats প্রমুখ কবির কাব্যকে মনে করিয়ে দেয়।

Ben Johnson দেহস্পর্শতপ্ত প্রেমের জন্যে উন্মুখ:

"Drink to me only with thine eyes,
And I will pledge with mine;
Or leave a kiss but in the cup
And I'll not look for wine" (To Celia)

Herrick তাঁর জীবনসর্বস্ব প্রিয়ার প্রেমে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে ঘোষণা করেছেন:

"Thou art my life, my love, my heart,
The very eyes of me,
And hast command of every part,
To live and die for thee."
(To Anthea Who May Command Any thing)

Burns প্রেমের সৌন্দর্য ও মাধুর্যে আত্মহারা:

"O my Luve's like a red, red rose
That's newly sprung in June:
O my Luve's like the melodie
That's Sweetly play'd in tune."
(O My Luve's Like a Red, Red Rose)

Keats-এর প্রেম প্রবল ও উষ্ণ ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে বিশিষ্ট:

"Pillow'd upon my fair live's ripening breast,
To feel for ever its soft fall and swell,
Awake for ever in a sweet unrest
Still, still to hear her tender-taken breath,
And so live ever,- or else swoon to death."

(Bright Star, Would I Were Steadfast as Thou Art)" (সুশীলকুমার, ১৯৯৭: ১৭৪-১৭৫)

নজরুল প্রেম প্রকাশের অকপট কবি। দেহজ প্রেম প্রেমের অনিবার্য অনুষঙ্গ। নজরুল তাঁর অনুভবে সব সময়ই সরল ছিলেন। ফলে দেহ-সংস্পর্শী প্রেমও দেখা যায় নজরুলে। যেমন, 'পূবের হাওয়া' কাব্যের এক কবিতায় তিনি বলেছেন:

"লো কিশোরী কুমারী!
পিয়াসি মন তোমার ঠোঁটের একটি গোপন চুমারই॥
অফুট তোমার অধর ফুলে
কাঁপন যখন নাচন তুলে
একটু চাওয়ায় একটু ছুঁলে গো!
তখন এ-মন যেমন কেমন-কেমন কোন্ তিয়াসে কোঙারি? –
ওই শরম-নরম গরম ঠোঁটের অধীর মদির ছোঁয়ারই।

বুকের আঁচল মুখের আঁচল বসন-শাসন টুটে
ওই শঙ্কা-আকুল কী কী আশা ভালোবাসা ফুটে সই?
নয়ন-পাতার শয়ন-ঘেঁসা
ফুটচে যে ওই রঙিন নেশা
ভাসা-ভাসা বেদনমেশা গো!
ওই বেদন-বুকে যে সুখ চোঁয়ায় ভাগ দিয়ো তার কোঙারই!
আমার কুমার হিয়া মুক্তি মাগে অধর ছোঁয়ায় তোমারই॥"

(পূবের হাওয়া)

Herrick-এর মতো প্রিয়ার প্রেমে আত্মসমর্পণ নজরুলের অনেক কবিতাতেই দেখা যায়। নজরুল তাঁর সকল বিদ্রোহ, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ নিয়ে শেষে প্রিয়ার কাছেই নিজেকে সমর্পণ করেন:

"হে মোর রাণি! তোমার কাছে হার মানি আজ শেষে।
আমার বিজয়-কেতন লুটায় তোমার চরণ-তলে এসে।
আমার সমর-জয়ী অমর তরবারী
দিনে দিনে ক্লানি- আনে, হ'য়ে ওঠে ভারী,
এখন এ ভার আমার তোমায় দিয়ে হারি,
এই হার-মানা-হার পরাই তোমার কেশে।।"

(বিজয়িনী)

এছাড়া প্রেমের সৌন্দর্য ও মাধুর্যে আত্মহারা, প্রেমের প্রবল ও উষ্ণ ইন্দ্রিয়ানুভূতিসহ রোমান্টিক কবিদের প্রায় সকল বৈশিষ্ট্যই নজরুলের কবিতায় বিদ্যমান।

উপরিউক্ত বিশ্লেষণের আলোকে বলা যায় কাজী নজরুল ইসলাম মর্মে মর্মে একজন রোম্যান্টিক কবি ছিলেন। তিনি রোম্যান্টিকতার তত্ত্ব পড়ে তা তাঁর লেখনীতে আরোপ করেননি। তাঁর সহজাত লেখনীকেই রোম্যান্টিক কবিতার বৈশিষ্ট্যের সাথে অনায়াসে মিলিয়ে পড়া যায়। আরোপিত সকল কিছুই পরিশেষে কৃত্রিমতায় পর্যবসিত হয়। রোম্যান্টিক সাহিত্যতত্ত্বই ছিলো মানুষের মনের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের ধারক আর এ আধারে নজরুলের অকৃত্রিম মনের প্রকাশকে অনায়াসেই মিলিয়ে পড়া যায়।

অধ্যায় ছয়

প্রেম ও প্রকৃতি বিষয়ক কাব্যালোচনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

দোলন-চাঁপা

'দোলন-চাঁপা' নজরুলের দ্বিতীয় প্রকাশিত কাব্য, অর্থাৎ 'বিদ্রোহী' প্রকাশের পরেই ১৯২৩ সালে এ কাব্যটি প্রকাশিত হয়েছে। 'অগ্নি-বীণা' কাব্যের প্রতিটা কবিতায় যে দ্রোহের বাণী উচ্চারণ করেছেন তার অন্তরতলে যে প্রেমের স্নিগ্ধ প্রবাহ ছিল তা এ কাব্য প্রকাশিত হবার সাথে সাথে সবাই বুঝতে পারে। প্রেসিডেন্সি জেলে বসে এ কাব্যের কবিতাগুলো তিনি রচনা করেছিলেন। মানবমনে যে দ্রোহ আর প্রেম এবং কঠোরতা আর কোমলতা সমান্তরালে অবস্থান করে তা নজরুলের কবিতা পড়লে অনায়াসে বোঝা যায়। 'বিদ্রোহী' কবিতায় যতদিন উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল না থামবে ততদিন শান্ত না হবার ঘোষণা দিয়ে তিনি এও পাশাপাশি বলেছিলেন, 'আমি গোপন-প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল-করে-দেখা-অনুখন/ আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা, তার কাঁকন চুড়ির কন-কন'। এই চপল মেয়ে বা মেয়েদের ভালোবাসায় তিনি নানামুখী অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন। তাঁর প্রথম যৌবনের ঘাত-প্রতিঘাতময় সম্পর্কের বয়ানই যেন 'দোলন-চাঁপা' কাব্যের কবিতায় প্রকাশিত।

'দোলন-চাঁপা' কাব্যের নামকরণ নিয়ে কয়েকটি মত আছে। শাব্দিক অর্থের দিকে যদি নজর দেই 'দোলন-চাঁপা' ফুল বাংলার বর্ষা প্রকৃতির একটি জনপ্রিয় ফুল, মন মাতানো সুবাস এবং স্নিগ্ধ শুভ্রতার জন্য ফুলটি অনেকের প্রিয়। এ ফুলের নামানুসারেও তিনি নামকরণ করতে পারেন। দ্বিতীয়ত, 'দোলন-চাঁপার সুবাস প্রেমের ইন্দ্রিয়ঘন অনুভূতির সঙ্গে মিশ্রিত'; তৃতীয়ত এবং সম্ভবত আশালতা সেনগুপ্ত ওরফে দুলী ওরফে দোলনা

দেবীর নামানুসারে এই গ্রন্থের নাম হয়েছে 'দোলন-চাঁপা'। নার্গিসের সাথে তাঁর প্রণয়ের যে অনাকাঙ্ক্ষিত বেদনা সেটা থেকে তাঁর উপশম মিলেছিল বালিকা দুলীর চপল প্রেমে। কাব্যের কিছু কবিতায় বেদনাভরা অভিমানী এবং অভিযোগী নজরুলকে দেখা যায়, কিছু কবিতায় প্রণয়প্রাপ্তির বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস পাওয়া যায়।

এ কাব্য সম্পর্কে বিশ্লেষকের মন্তব্য:

> "নজরুলের প্রেমচেতনার মৌল ভিত্তি রোমান্টিক মানস। কোন দর্শন নয়, বরং বাঁধ-ভাঙা আবেগ আর উচ্ছ্বাসই নির্মাণ করেছে 'দোলন-চাঁপা'র প্রেম-আবহ। আলোচ্য কাব্যের পংক্তিতে পংক্তিতে ছড়িয়ে আছে নজরুলের আবেগ-বিস্ফারিত উচ্ছ্বাসময় প্রেম-আর্তি। প্রেম সম্পর্কে স্থির কোনো সিদ্ধান্তে কবি উপনীত হতে পারেননি– সর্বত্রই ধরা পড়েছে তাঁর অস্থির মানসতার ছবি। উচ্ছ্বাস অভিমান আবেগ সংশয় আর রোমান্টিক আত্মপীড়ন — প্রেমের এইসব প্রবণতাই আলোচ্য কাব্যে নজরুলের প্রেমচেতনার কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য।"(বিশ্বজিৎ ঘোষ, ২০০৫: ৩৩)

১.

প্রেম ও প্রকৃতি বিষয়ক কাব্য হলেও কাব্যের শুরু হয়েছে ভিন্নধর্মী কবিতা দিয়ে। এ প্রসঙ্গে নজরুল-জীবনী প্রণেতা অরুণকুমার বলেন:

> "এই কাব্যের 'আজ সৃষ্টিসুখের উল্লাসে' কবিতাটিতে 'অগ্নিবীণা'র নজরুলের সামান্য ছায়াপাত ঘটলেও, অন্যান্য কবিতায় আর-এক নজরুলকে পেলেন পাঠকরা, যিনি প্রেমিক, যিনি কান্তকোমল স্নেহপ্রেমের কাঙাল, যিনি অভিমানী, ভাবাবেগে ব্যাকুল, কখনও আহত বেদনায় মূর্ছাতুর, কখনও ব্যর্থ প্রেমে রুদ্ধবাক।... দোলন-চাঁপা' বিদ্রোহী অভিজ্ঞানের বিপরীতে এক স্পর্শকাতর স্নেহ-প্রেমভিক্ষু কবির তরুণ যৌবনের বাউলের কবিতা, যে আপন একতারায় সুর বেঁধে যেন 'নিরুদ্দেশ মনের মানুষকে ডেকে বেড়াচ্ছে অনির্দেশ্য বেদনার ক্ষ্যাপা সুরে।' ভাষাও রবীন্দ্র-সত্যেন্দ্র ও রবীন্দ্র যুগের বাংলা কাব্যের সাধারণ ভাষাক্ষেতের ফসল-সঞ্চয়ী।" (অরুণকুমার, ২০১৯: ১৫০-১৫১)

'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' শিরোনামে কাব্যের প্রথম কবিতায় কবি নতুন সৃষ্টিকে আবাহন করেছেন। ধুমকেতু আর উল্কার ধ্বংসলীলায় যখন সৃষ্টির পুরনো জঞ্জাল সরাবার

বাসনা তাঁর বুকে তখন নব-পৃথিবীর প্রতিরূপ তাঁর কাছে ধরা দেয় 'লক্ষ বাগের ফুল' হয়ে। কবিচৈতন্য যখন পুরাতন জীর্ণতা পেরিয়ে নতুন সৃষ্টির উদ্দামতায় উদ্বেল তখন 'ফুলল সাগর দুলল আকাশ ছুটল বাতাস', 'হাসল আগুন, শ্বসল ফাগুন', 'পলাশ অশোক শিমুল ঘায়েল' হলো। নজরুলের অনুভবে প্রকৃতি শুধু প্রেমের লালিত্যেই ধরা দেয় না, ধরা দেয় ভাঙনের তাণ্ডবলীলা এবং সৃষ্টির নব-আয়োজনেও। অনিয়ম-অনাচারের ঘোর অমানিশা কেটে যখন নতুন দিনের আগমনী বাজে তখন 'ঊষা', 'সন্ধ্যা', 'দুপুর' কেউ বাদ রয় না সামিল হতে; আবার 'আসল আশিন শিউলি শিথিল/ হাসল শিশির দুবঘাসে'। স্বর্গ-মর্ত-পাতাল একসাথে আন্দোলিত হয় তাঁর অনুভবের সাথে:

"আজ জাগল সাগর, হাসল মরু,
কাঁপল ভূধর, কানন-তরু,
বিশ্ব-ডুবান আসল তুফান, উছলে উজান
ভৈরবীদের গান ভাসে,
মোর ডাইনে শিশু সদ্যোজাত জরায় মরা বামপাশে!"

(রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, ২০১২: ৫৪)

লক্ষণীয় যে, নজরুলে যেমন দ্রোহ আর প্রেম পাশাপাশি ছিলো তেমনি নজরুলের নির্মিত নারী সত্তায়ও। তাঁর সৃষ্টি সুখের উল্লাসে যেসকল 'সুন্দরী' যোগ দিয়েছে তাদের 'কারুর পায়ে বুক-ডলা খুন, কেউ বা আগুন,/ কেউ মানিনী চোখের জলে বুক ভাসে!' এই বুক-ডলা খুন, আগুন, আর চোখের জলই মূলত নজরুলের প্রেমের কবিতার মূল বিন্দু আমরা বলতে পারি। কাঙ্ক্ষিত প্রেম না পেয়ে কোথাও তিনি অভিমান এবং ক্ষোভে অগ্নিসম জ্বলেছেন আবার কোথাও অগ্নি নির্বাপণ করে চোখের জলে ভেসেছেন।

২.

আরবি 'মোতাকারিব' ছন্দে লেখা 'দোদুল-দুল' কবিতায় নজরুল প্রিয়ার যে দৈহিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছেন তা বৈষ্ণব কবিদের অলীক কল্পজগতের বর্ণনা নয়, রবীন্দ্রনাথের মানসগড়া কল্পদেবীর বর্ণনাও নয়। আলাওলের পদ্মাবতীর রূপ বর্ণনার অতিলৌকিক জায়গা থেকে সাহিত্যে যে ধীরে ধীরে পরিবর্তন এসেছে এবং আধুনিক সাহিত্যিকদের সাহিত্যের যে প্রধানতম বৈশিষ্ট্য বাস্তব জগতের রূপায়ণ করা তার কিছু

উপাদান নজরুলের কবিতাতেও বিদ্যমান। মধ্যপ্রাচ্যীয় ছন্দের কাঠামোয় নজরুলীয় অকৃত্রিম বর্ণনে এমন এক বাস্তবিক চপল মেয়ের ছবি তিনি এঁকেছেন যার 'খোঁপার ফুল', 'কানের দুল',' অলস চুল', 'অসংবৃত কাঁখের ভিত', 'পায়ের নখ' কিছুই বাদ রাখেননি তিনি। শব্দবন্ধের চলমান আঁকা ছবিতে আমাদের মানসপটে এমন জীবন্ত মানুষের চিত্রকল্প ভেসে ওঠে:

"কলস-কাঁখ
পুকুর যায়,
আঁচল চায়
চুমায় ধুল,
দখিন হাত
ঝুলন্ ঝুল্
দোদুল দুল।"

(রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, ২০১২: ৫৭)

এই চিত্র তৈরিতে নজরুল যে উপমার ব্যবহার করেন তা একেবারেই তাঁর নিজস্ব। সাধারণ-কল্পনায় বিরল প্রকৃতির আপাত অদৃশ্য অনুষঙ্গ ব্যবহার করে অনিন্দ্য প্রকাশ ঘটাতে তিনি বরাবরই পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন। তিনিই পারেন প্রিয়ার গলায় 'হংস-সারির দুলানো মালিকা' পরাতে, রংধনু হতে লাল রঙ ছেনে তাঁর প্রিয়ার পায়ে আলতা পরাতে। তাঁর প্রিয়ার কোমর হয় রাঁজহাসের গলার মতো চিকন এবং তার সৌন্দর্যে জড়-জীব সব মাতোয়ারা:

"কাঁকাল ক্ষীণ
মরাল গ্রীব
ভুলায় জড়–
ভুলায় জীব,"

(রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, ২০১২: ৫৮)

তাঁর কবিতায় আমরা প্রেমের সকল দিকেরই তীব্র প্রকাশ দেখতে পাই। প্রেমে উদ্বেল নজরুল যেমন প্রিয়ার রূপে এবং প্রেমে ঝর্ণার মতো উচ্ছ্বসিত থাকেন, আঘাত পেলে

অভিমানে বেদনায় প্রিয়ায়ে জর্জরিতও করেন। বালিকা 'দুলী'তে বিমুগ্ধ নজরুল তুলনাহীন প্রকাশে তাঁর প্রিয়ার রূপকে অতুলনীয় করে তুলে ধরেছেন। পৃথিবীতে অতুলনীয় রূপ বলে কিছু নেই তবে যার প্রতি মানুষের মুগ্ধতা তৈরি হয় তাকে সে অতুলনীয় সুন্দর হিসেবেই দেখে। মানবানুভূতির ধরণই এমন, যখন যার সাথে তার আত্মিক মিলন হয় তখন সে তাকে সর্বোচ্চ মহিমায় দেখে, নজরুলও তাই দেখেছেন। প্রিয়ার মৃণাল-হাত, নয়ন পাত, গালের টোল, চিবুক দোল সবকিছুই অনন্য মুগ্ধতা ছড়ায় এবং সেই দোদুল দুল বালিকার প্রতি মুগ্ধ হয়ে সকল কাজে ভুল হয়।

৩.

প্রেমিকের বিচিত্র প্রণয়লীলা, তার মান অভিমান, অনুরাগ-বিরাগ, দ্বন্দ্ব-সংশয় প্রভৃতি সব রকম ভাবই এ কাব্যের কবিতায় আছে। পরবর্তী কবিতায় আমরা বঞ্চিত, উপেক্ষিত, ব্যথিত, বিরহভারাতুর, ক্ষুব্ধ এক সত্তাকে পাই। তাঁর অধিকাংশ প্রেমের কবিতার পরতে পরতে এমন হাহাকারের ধ্বনিই ধ্বনিত। পৃথিবী যখন 'গাঢ় বেদনা'র 'ম্লান ধূসর' আঁচল দিগন্তের কোলে টেনে দেয়, 'সন্ধ্যা-দীপ-জ্বালা গৃহ-পানে ঘর-ডাকা পথে' যখন সকল পাখি ফিরে আসে, তখন সেই দৃশ্যপটের সাথে 'আসি' বলে চলে যাওয়া প্রিয়তমর আশায় অশ্রুসিক্ত অপেক্ষমাণ প্রেমিকের ছবি আমাদের সামনে আঁকেন। এই কবিতার শব্দ চয়ন এবং চিত্র নির্মাণে রবীন্দ্র-কবিতার প্রভাব আছে বলে অনেকে মনে করেন।

এখানে তাঁর পুঞ্জিভূত ব্যক্তিবেদনা ব্যক্তির সীমা পেরিয়ে বিশ্বব্যথিত হৃদয়ের প্রতিনিধি হয়। স্নেহ-মমতা, অর্থ-বিত্ত, নিশ্চিন্ত আশ্রয় সকল অভাবই তো নজরুল সাথী ছিল বেড়ে উঠার বয়সে। যৌবনেও পেয়েছেন বিরহ-ব্যথা। পৃথিবীর স্থিতিশীল সুখ-শান্তির সাক্ষাৎ তাঁর মেলেনি তেমন। এজন্য 'বেলাশেষে'র পৃথিবীও তাঁর নির্মাণে ধরা দেয় 'ম্লান ধূসর আঁচল', 'অশ্রু-চোখ', 'মেঘ-বাষ্প-ভারাতুর দীর্ঘশ্বাস', 'বিষাদিনী বালিকা', 'করুণার কাঁদন', 'গুমরিয়া কেঁদে কেঁদে', 'ধূলায়-মলিন এলোচুল' -এর মতো রুক্ষ, মলিন, বেদনার্ত শব্দবন্ধে। যোগসাধনার যে মূল কথা: অনন্ত বিশ্ব-প্রকৃতির সাথে নিজের আত্মার সচেতন মেলবন্ধন ঘটানো, সেই প্রেক্ষিতে নজরুলকে বড় যোগী বলতেই হয়। কারণ, তাঁর অনুভবের সাথে মাতা বসুধার রূপের রূপায়ণ এবং সেই রূপায়িত অনুভবের সাথে তাঁর

অনুভব মিলেমিশে একাকার। বিশ্ব-মাতা নজরুলের কল্পনায় 'কাঙালিনী', নজরুল নিজের ব্যথা-বেদনা ভরা দৃষ্টি দিয়ে বিশ্বকে দেখেছিলেন। ব্যথাতুর ধরণী মাতা সন্ধ্যাবেলায় যেন সেই 'স্তুপীকৃত বেদনার ভার' নিয়ে 'মুখ গুঁজে পড়ে থাকে', গুমরে গুমরে কাঁদে। মানুষ নিজের কাছে বড় একা, সে বাহ্যিকভাবে থাকে বটে চারপাশের মানুষের সাথে কিন্তু, একান্ত গভীর থেকে গভীরতম অনুভবে কেউ মূলত কাওকে সঙ্গ দিতে পারে না, বিশেষ করে নিগূঢ় বেদনার অনুভবে। জীবনান্তে মানুষ শুধুমাত্র নিজের আত্মাকে সঙ্গে নিয়েই অনন্ত-প্রকৃতির সাথে লীন হয়ে যায় ফলে সে একান্ত গভীরতম সঙ্গ কেবল প্রকৃতির কাছেই পেতে পারে। আর এ অনুভব যার যত তীব্র সে তত বেশি বাস্তুজগতে শূন্যতা অনুভব করে। এমন মায়াময়, বেদনাবিষ্ট বাহ্যপ্রকৃতিতে বসে নজরুলেরও মনে হয়:

"তারি মাঝে কেন যেন অকারণে হায়
আমার দুচোখ পুরে বেদনার ম্লানিমা ঘনায়।
বুকে বাজে হাহাকার-করতালি,
কে বিরহী কেঁদে যায় খালি, সব খালি!"

(রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, ২০১২: ৫৯)

নিখিল বিশ্ব তাঁকে অশ্রুহীন চোখেই করুণা দেখিয়েছিল। এহেন ব্যথাকে শুধুই নর-নারীপ্রেমের ক্ষুদ্র সীমানায় ফেলে ব্যখ্যা করাটা অসমীচীন। নর-নারী ঘটিত বেদনা ছাড়িয়ে তাঁর অনুভবের গভীরতা তো আরো বেশি ছিলো এবং তার প্রকাশও তিনি আরো বিস্তৃত পরিসরে করেছেন। তাই 'বেলাশেষে' কবিতাটি নর-নারীর প্রেমের চেয়ে অনেক বেশি সন্তোষজনক পাঠ করা যায় ধরাব্যাপী ব্যথিত, অধিকারবঞ্চিত, হত দরিদ্র মানুষের প্রেক্ষিতে পাঠ করলে। প্রসাদের আশায় কত মন্দিরে গিয়ে গিয়ে লাথি-খাওয়া ভিখারির মতো ফিরে এসেছেন তিনি। রক্ত-অশ্রু দিয়ে পাষাণ দেবতাকে পূজা দিয়ে তিনি দেখেন এ 'প্রেমহীন অনাদর-হানা দেবলোক'। জগৎ তো বঞ্চিতের সাথে নিষ্ঠুর আচরণই করে। নজরুল ব্যথিত, বঞ্চিত মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকেই কবিতা লিখেছেন, নিজের জীবন দিয়ে তিনি উপলব্ধি করেছেন তাঁদের বেদনা। মন্দিরে পাষাণ দিয়ে নির্মিত দেবতা যেমন ভক্তের আহাজারিতে কোনোদিন সাড়া দেয় না, দেয় না পাষাণ হৃদয়ের মানুষও। পাষাণ-প্রতিমার আড়ালে তিনি নিশ্চয়ই তাই পাষাণ-হৃদয় মানুষের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। ভগ্ন 'ভালোবাসা-ক্ষুধাতুর মন' নিয়ে কবি বুঝে যান 'অগ্নি-গিরি এসে যেন মরুভূর কাছে হায়

জল-ধারা যাচে'। বৃথা এই ভিক্ষা মাগা, ভিক্ষা মিলবে না কোনোদিন; তাই তো হাতুড়ি শাবল দিয়ে সকল দরজা ভেঙে নিজেদের প্রাপ্যটা বুঝে নেবার পক্ষে ছিলেন। 'যুগ-যুগ-অনাদৃত হিয়া' নিয়ে তিনি আসেন বটে, কিন্তু ফেরেন আরো বেশি শক্তি নিয়ে, প্রতিজ্ঞা নিয়ে যেটা মোটাদাগে নজরুলীয় স্পিরিটই বলা যায়। এখানে একটা প্রতিঘাত আছে, প্রান্তিক মানুষের প্রতিরোধ প্রবণতা আছে, উপেক্ষিত ভালোবাসার ঘুরে দাঁড়ানোর শক্তি আছে:

"দেবতার হাসি আছে, অশ্রু নাই;
ওরে মোর যুগ যুগ অনাদৃত হিয়া, আয় ফিরে যাই।...
এই সাঁঝে মনে হয়, শূন্য চেয়ে আরো এক মহাশূন্য রাজে
দেবতার-পায়ে-ঠেলা এই শূন্য মম হিয়া-মাঝে।
আমার এ ক্লিষ্ট ভালোবাসা
তাই বুঝি হেন সর্বনাশা।
প্রেয়সীর কণ্ঠে এই ভুজ এই বাহু জড়াবে না আর,
উপেক্ষিত আমার এ ভালোবাসা মালা নয়, খর তরবার।"

(রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, ২০১২: ৬০)

৪.

'পউষ' মাস বা শীত প্রকৃতি সর্বদাই মানবমনের রুক্ষ দিকের প্রকাশ নিয়েই এসেছে। শীতের আগমনে প্রকৃতি যেমন তার সবুজ হারায়, জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে আবার বসন্তে নিজের প্রাণ-প্রাচুর্য ফিরে পায়, তেমনটি মানবমনেও সত্য হয়। প্রকৃতির আধিপত্য যে সকল কবিতায় সেখানে সেখানে প্রকৃতির ছবি যেন মানবমনেরই দৃশ্যপট। 'শুকনো নিশাস', 'মলিন চোখ', 'বিদায়-ব্যথা', 'কাঁদন-ভারাতুর বিদায়-ক্ষণ' প্রভৃতি শব্দবন্ধ যেন কবির আহত হৃদয়েরই প্রতিচ্ছবি। রিক্ত, বিরর্ণ পউষের আড়ালে যে রিক্ত জীবন লুকায়িত সে জীবন কারোই কাম্য নয়। তাই সে আসবার সাথে সাথে পাতায় পাতায় বিদায়-ব্যথা কেঁদে যায়। কিসের বিদায় ব্যথা? সে ব্যথা পাকা ধানের বিদায়ী ঋতু হেমন্তের। হেমন্ত বাঙালি জীবনের জন্য এক ফলবতী ঋতু। অগ্রহায়ণে পাকা ধানের সোনালী রঙের গ্রাম বাংলার জীবনে সম্মৃদ্ধি আসে, অন্নের সংস্থান হয়। তাই নব অন্নদাত্রী র ঋতুর আবেদন অন্য রকম। কবি জীবনেও যে পাকা ধানের (সম্পর্কের পূর্ণতা, পরিতৃপ্তি) সময় ছিল এবং সে সময় অতিক্রান্ত হয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত ঊষরতা এসেছে তাই হয়তো আড়ালে বলে গেলেন

তিনি। পুরাতন স্থিতি ভেঙে যে নতুন আসে সে নতুনের (দোলন) আগমনে ভালোমন্দের আশঙ্কা থাকে, ছিলো তা কবিমনেও।

এসব ভয়, আশঙ্কা, দ্বিধা কাটিয়ে জীবনকে সামনে আগাতে হয়; ঋতু যেমন আগায়। প্রকৃতিতে কোন কিছুই চিরন্তন না, প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। মানুষও প্রকৃতিরই অংশ, মানুষের জীবনেও কোন কিছুই ধ্রুব সত্য নয়, সেটা আনন্দ হোক বা বেদনা হোক। তাই প্রকৃতির লীলাখেলা সচেতন মনে উপলব্ধি করলে জীবনকে বোঝা সহজ হয়। সচেতনে হোক বা অবচেতনে হোক মানুষ তার জীবনের বরাদ্দ সময়টুকু অতিক্রম অতিক্রম করেই যায়। এই অতিক্রম করতে সবাই যে ভূতপূর্ব ক্লান্তি বা বেদনার ভার কাটিয়ে ওঠে সেটাও নয়; কেউ কেউ পরাজয় বরণ করে জীবন থেকে অব্যাহতিও নিয়ে নেয়। অধিকাংশই ধৈর্য ধরে, অপেক্ষা করে, ফলে আনন্দের পর বেদনা যেমন দেখে বেদনার পর আনন্দও তেমন দেখে। যেমন করে 'অশ্রু-পাথার হিম পারাবার পারায়ে' পৌষ আসে, তেমন করেই কবি জীবনেও পালাবদল হয় আর সকলের মতোই। সকল ভয়, আশঙ্কা কাটিয়ে কবি হেমন্তকণ্ঠে পথিকবেশী নিজেকেই হয়তো মনে করিয়ে দিচ্ছেন:

"এক বছরের শ্রান্তি পথের, কালের আয়ু-ক্ষয়,
পাকা ধানের বিদায়-ঋতু, নতুন আসার ভয়।
পউষ এল গো! পউষ এল—
শুকনো নিশাস, কাঁদন-ভারাতুর
বিদায়-ক্ষণের (আ-হা) ভাঙা গলার সুর—
'ওঠো পথিক! যাবে অনেক দূর
কালো চোখের করুণ চাওয়া ছাড়ায়ে'।।"

(রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, ২০১২: ৬০-৬১)

এই 'ওঠো পথিক, যাবে অনেক দূরে'র মাঝেই জীবনের মূলমন্ত্র নিহিত। জীবন প্রবহমান, তাই মনের মাঝে স্থবিরতা আসলে জীবনের মূল সূত্রের সাথে দ্বন্দ্ব লাগে এবং জীবন সংকটময় হয়। এই চলমানতার কথা পাশ্চাত্য কবি Robert Frost ও যেমন নিজেকে মনে করিয়েছিলেন:

"The woods are lovely, dark and deep,

But I have promises to keep,

And miles to go before I sleep,

And miles to go before I sleep.

(Stooping by Woods on a Snowy Evening)"[১]

৫.

'বেলাশেষে'র আহত, উপেক্ষিত কবি প্রেয়সীর কণ্ঠে ভূজ-বাহু না জড়ানোর দৃঢ় পণ করেছিলেন। উপেক্ষার শিকার হয়ে তাঁর কোমল ভালোবাসা হয়ে উঠেছিল খর তলোয়ার। পরবর্তীতে 'পউষ' ব্যথা-বেদনা সত্ত্বেও নিজের সাথে নিজে অনেক দূরে যাবার প্রত্যয় করেছেন। 'পথহারা'তে এসে কবি আবার অভিমানী হয়ে উঠেছেন। অনেক দূরে যাবার যে প্রত্যয় তিনি নিলেন, এখানে উদাস হয়ে ভাবছেন 'সে যেন কোন অনেক দূরে যাবে– '। জীবনে লক্ষ্য ঠিক থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ, লক্ষ্যহীন ভবঘুরে জীবন বেশিদিন টেনে নেয়া যায় না। লক্ষ্য নির্ধারণ করে মানুষ আবার একলাও সে পথে চলতে পারে না, দিনশেষে কারো মনে সে আশ্রয় চায়, জায়গা চায়; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রসিদ্ধ ছোটগল্প'অপরিচিতা'র নায়ক অনুপমের মতো একটু জায়গা চায়। কিন্তু, একাত্ম হতে যে পারে না তার চিরদুখী মন, অভিমানী কবি বিচ্ছিন্নতা অনুভব করে এ মায়াস্রোত থেকে:

"'ঘরে এস' সন্ধ্যা সবায় ডাকে,

'নয় তোরে নয়' বলে একা তাকে;

পথের পথিক পথেই বসে থাকে,

জানে না সে কে তাহারে চাবে।

উদাস পথিক ভাবে।"

(রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, ২০১২: ৬১)

মানুষ মানুষের কাছেই আশ্রয় পায়, আবার মানুষের কাছ থেকেই আহত হয়। মানুষের কাছ থেকে আঘাত পেয়ে একলা মানুষ যখন বাইরের দিকে তাকায় তখন সে অসীম প্রকৃতির আহ্বান শুনতে পায়। বিস্তীর্ণ আকাশ, শ্যামল মাঠ, প্রবহমান নদী, সীমাহীন সমুদ্র

আর উদার পাহাড় তাকে মায়াময় হাতছানি দেয়। হৃদয়ের ক্ষত মিলিয়ে তাকে দেয় সত্যিকারের সঙ্গ। বিভ্রান্ত, আহত, একাকী মানুষ প্রকৃতির নির্বাক-নিঃশব্দ ডাকে সাড়া দিয়ে সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই গন্তব্যহীন পথে বেড়িয়ে পড়েছে। সংবেদনশীল মন সবকালেই পাহাড়ের ডাক, সমুদ্রের ডাক, ভোর এবং সন্ধ্যার মায়াময় আহ্বান শুনতে পেয়েছে, পায় এবং পাবে। নজরুলের প্রেম, বিরহ, অভিমানের সাথে প্রকৃতির সম্পর্ক অনেক বেশি। তাই, উদাসীন কবিকে 'বনের ছায়া গভীর ভালোবাসে' আঁধার মাথায় দিগবঁধূদের দেশে তাঁকে ডেকে নিতে 'শৈলমূলে শৈলবালা নাবে'। কিন্তু, এই আহ্বান তিনি অনুভব করলেও তাঁকে স্থির শান্তি দেয়নি তা। কাউকেই দেয় না অবশ্য। কারণ, সব শেষে মানুষ মানুষের ভালোবাসার কাঙাল, নজরুলও তাই ছিলেন। তিনি একটা নির্দিষ্ট আহ্বান শুনতে চেয়েছিলেন, সেটা পুব দেশের আহ্বান (কুমিল্লা?)। অনেক মহিমান্বিত কিছুও পাবার মাধ্যমে, দৈনন্দিন ব্যবহারের মাধ্যমে মলিন হয়ে যায়। না-পাওয়ারা চির ধ্রুব হয়ে থেকে যায় মনের মণিকোঠায়। তেমনি নজরুলে ছিলো পূব-পথ:

"হঠাৎ তাহার পথের রেখা হারায়
গহন বাঁধায় আঁধার-বাঁধা কারায়,
পথ চাওয়া তার কাঁদে তারায় তারায়
আর কি পূবের পথের দেখা পাবে
উদাস পথিক ভাবে।"

(রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, ২০১২: ৬১)

৬.

পথহারা উদাস কবি ঠিক পাওয়া বলতে আমরা যা বুঝি তা তিনি পাননি। তাই না পাওয়ার পাওয়া যে বেদনাঘাত তাই তিনি অমূল্য বলে বরণ করেছেন। যে ব্যথায় পথ হারিয়ে তিনি উদাসীন হয়েছিলেন সেই ব্যথাকে তিনি গৌরব হিসেবে নিচ্ছেন। তাই 'ব্যথা-গরব' এ কবি প্রচণ্ড রকম আহত বটে, কিন্তু এ মর্মঘাতী বেদনাকে তিনি কেমন করে ঐশ্বর্যে রূপ দিচ্ছেন। কথিত আছে যে যার কোনো ভয় নেই তাকে তো ভয় দেখানো বৃথা। এখানে জীবনকে দেখবার দৃষ্টিভঙ্গির একটা চমৎকার ব্যাপার আছে। পৃথিবীর চারপাশের প্রতিবেশ ঠিক তাদের মতো করেই আমাদের সবকিছু দেয়, অধিকাংশই আমাদের

প্রত্যাশা মতো হয় না, এবং অনেক কিছুই বা অধিকাংশ কিছুই আমরা নিয়ন্ত্রণ নিতে পারি না। আমরা যেটা পারি সেটা হলো ঘটনার প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে। এ কবিতায় নজরুলের প্রতিক্রিয়াটা অসাধারণ। আর এই প্রতিক্রিয়া যে যত বেশি ইতিবাচক ভাবে নিতে পারে সে তত বেশি মনোরম থাকে নিজের ভেতরে।

বিরহ-ব্যথাকে যে নজরুল সব সময়ই গৌরব হিসেবে নিয়েছেন তা নয়। আঘাত পেয়ে তিনি হাহাকার করেছেন, অভিমানী হয়েছেন, ক্ষুব্ধও হয়েছেন। কিন্তু এ কবিতায় তিনি ভালোবাসার অধিকার নিয়ে, দাবি নিয়ে তার প্রিয়তমর কাছে জানতে চেয়েছেন কিসে কবি ব্যথা পান তা তো প্রিয়তমা জানে, তবুও এতো ছল করে তাঁকে আঘাত কেন সে দেয়। কিন্তু, মানবের ধরণই বুঝি এমন যেখান থেকে তার আঘাত আসে ঘুরে ফিরে সেখানেই সে যায়। পতঙ্গ যেমন করে নির্ঘাত মৃত্যু জেনেও আলোর চারপাশে ঘুরে ঘুরে আগুনে ঝাপ দিয়ে ফেলে এও যেন তেমনি। যার অনাদরে বক্ষ বিদীর্ণ হয়, যার কাছে আমাদের হৃদয় চেরা ভালোবাসা বড় অবাঞ্ছনার জিনিস তার কাছেই যেন আমাদের ফিরে ফিরে আসা। 'যতই আমায় সইতে নারো/ আঁকড়ে ততই ধরি আরো;/ মারো প্রিয় আরো মারো' — এই যেন ভালোবাসার মন্ত্র। ভারতীয় উপমহাদেশে সবচেয়ে পছন্দনীয় সুর হচ্ছে বেহালার করুণ সুর, আর প্রেমের মহিমা হচ্ছে বুক ভরা ব্যথা। যেখানে বিরহ নেই সেখানে যেন প্রেমও যেন তার পূর্ণ সৌন্দর্য নিয়ে পাখা মেলতে পারে না।

কবির এই নিবেদিত সমর্পণ উপেক্ষিত হয় এবং ভালোবাসার 'দীন কাঙাল' হয়ে চরণ-পূজা দিতে গিয়ে চরণাঘাত পেয়ে এসেছেন। কিন্তু এই চরণাঘাতকে তিনি পরম প্রাপ্য বলে মনে করছেন। আমাদের মানসিকতার ঐতিহ্যে এ বিষয়টি পূর্ব থেকেই বিদ্যমান। মোহাম্মদ রফিকউজ্জামানের লেখা জনপ্রিয় সেই গানটিতে এমন কথাই ধ্বনিত —'বন্ধু হতে চেয়ে তোমার /শত্রু বলে গণ্য হলাম / তবু একটা কিছু হয়েছি যে /তাতেই আমি ধন্য হলাম'। 'তুমি আরেকবার আসিয়া যাও মোরে কান্দাইয়া, আমি মনের সুখে একবার কাঁদতে চাই' এর ধ্বনি এ কবিতাতেও আছে। প্রিয়ার পদ্মপায়ের আঘাতই কবি বারবার চাইছেন, এটাই তাঁর পাওয়া। এই চরণাঘাত ভগবান বিষ্ণুর বুকের ভৃগুপদের যে চিহ্ন তার সাথে তিনি তুলনা করেছেন। এবং এটা তিনি এমন মহিমা এবং গৌরবের (কৌস্তভ) করে

দেখেছেন স্বয়ং হরিও হিংসা লাজে মরবে এবং এই মহিমা নিয়ে তিনি জীবনের বাকি সময়ও অতিবাহিত করতে চেয়েছেন। এটা শুধু কবিতার সত্য নয়, বাস্তব জীবনেও অনেকে কাউকে ভালোবেসে পাওয়া অবহেলা বুকে নিয়ে বাকি জীবন কাটিয়ে দেয়। নজরুলের লেখায় যেন তারই প্রতিধ্বনি:

"বিষ্ণুজয়ী ভালোবাসার গর্বে এ বুক উঠবে দুলে,
সর্বহারার হাহাকার আর কাঁদবে নাকো চিত্ত-কূলে।
এই যে তোমার অবহেলা
তাই নিয়ে মোর কাটবে বেলা,
হেলাফেলার বসবে মেলা,
একলা আমার বুকের মাঝে,
সুখে দুখে সকল কাজে।।"

(রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, ২০১২: ৬৩)

৭.

'ব্যথা-গরব' -এ দীন কাঙাল কবি চুপি চুপি প্রিয়ার আঙুল চুমতে গিয়ে যে চরণাঘাত পেয়েছিল তার অপমান ও লাঞ্ছনা কবি ভুলতে পারেননি। যদিও তিনি 'পদ্মপায়ের আঘাত-সোহাগ' কামনা করেছেন সেটা নিশ্চয়ই তার অভিমানী ও আহত মনের বাসনা বা কবি শতভাগ নিবেদনের জায়গা থেকে বলেছেন। বস্তুবাদী জীবনে মানুষ যখন ক্লান্ত হয়ে যায় তখন কখনো কখনো সে মানবমাতার কাছে আশ্রয় খোঁজে কখনো বা ধরিত্রীমাতার কাছেও আশ্রয় খোঁজে। আঘাতপ্রদায়ী পরিবেশ-পরিমণ্ডল থেকে সে নিরাপদ ও নির্ঝঞ্ঝাট আশ্রয় কামনা করে, সেটা মানবমাতৃজঠরে হোক বা ধরামাতৃজঠরে হোক। 'উপেক্ষিত' কবি মাতৃরূপী বিরজাসুন্দরী দেবী বা বিশ্বমাতা প্রকৃতি বা চূড়ান্ত আশ্রয়দাতা স্রষ্টার কাছে একটু 'আশ্রয়' খুঁজেছেন এ কবিতার মাধ্যমে। অজানাকে চিনতে কবি পুরো জগৎকে চিনে ফেলেছেন শুধু যাকে চাইছেন একান্ত প্রাণে তাকে পাচ্ছেন না। কথিত আছে 'আমি যাকে ভালোবেসেছে ছিলাম সে বাদে পুরো পৃথিবী আমাকে ভালোবেসেছিল' — এমন

কথাই যেন কবির মর্মে বেজে চলেছে। মন জিততে গিয়ে অপমান, অবহেলা সে তো আবহমান কাল ধরেই মানুষ পেয়ে আসছে; নজরুলও পেয়েছেন। বিদ্রোহের জায়গায় নজরুল কখনো শ্রান্ত হন না কিন্তু, ভালোবাসার মিথ্যে আশায় ঘুরে সহজেই বড় শ্রান্ত তিনি। বিশ্বকে জয় করে এসে ভালোবাসার কাছে তিনি হেরে গিয়েছেন। তাঁর বিশ্বজয়ের গর্ব জয় করেছে ওই পরাজয়। এই পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে তিনি কৃত্রিম ভালোবাসা পাবার আশা ছেড়ে মায়ের কোলে আশ্রয় চাইছেন:

"বিশ্বজয়ের গর্ব আমার জয় করেছে ঐ পরাজয়,
ছিন্ন-আশা নেতিয়ে পড়ে, ও মা এসে দাও বরাভয়!
চারদিকে মা প্রবঞ্চনা
ভালোবাসার গিল্টিসোনা
আজ মণি কাল ধূলি-কণা,
জুয়ার হাট এই প্রেমের মেলা!
খুইয়েছি সব সাধের খেলায়, বুক ভেঙেছে হেলার ঢেলা!"
এখন তুমি নাও মা কোলে, নয় অকূলে ভাসাই ভেলা॥

(রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, ২০১২: ৬৪)

এই বহুমাত্রিক অনুভূতির কারণ হচ্ছে জগতে মানুষের মনই সবচেয়ে সংবেদনশীল আর চঞ্চল জিনিস। মনে ঠিক কখন কোন অনুভূতি জাগ্রত হয় তা বলা মুশকিল। এবং মানুষের সচেতন নিয়ন্ত্রণের বাইরে মনের অবারিত প্রান্তরে নিয়ত দৃশ্যপট বদলাতে থাকে। বাহু-ভূজ আর কারো গলে না জড়ানোর অঙ্গীকার করে মায়ের কাছে জগতের বেদনা-আঘাত থেকে আশ্রয় নিয়ে আবার প্রিয়পদতলে নিজেকে সমর্পণ করেন নজরুল। প্রণয়দর্শনে স্থির কোনো তত্ত্ব নেই তবে হৃদয়-জগতের অহংকার প্রণয়ে মানায় না, তাতে হিতে বিপরীতই হয়। প্রিয়কে যথাযথ মূল্যায়নের মাধ্যমে পূর্ণ আত্মসমর্পণের দ্বারা প্রণয়ের মূল্য দিতে হয়। নজরুলের দোর্দণ্ড প্রতাপ যেখানে কারো কাছে নতি স্বীকার করে না, সেও প্রণয়ে এসে শিশুর মতো সরল এবং অনায়াস-সমর্পিত।

৮.

প্রেয়সীকে 'পূজারিণী' হিসেবে দেখা, প্রিয়তমার পদতলে নিজেকে সমর্পণ করে দেয়া নজরুলীয় প্রেমের বৈশিষ্ট্য। পূর্ণ সমর্পণ করেন বলেই গভীরতম বেদনাও তিনি পান। তাঁর সমর্পণের ভাষা 'প্রিয়! এবার আমায় সঁপে দিলাম তোমার চরণ-তলে।/ তুমি শুধু মুখ তুলে চাও, বলুক যে যা বলে।।' মানুষ তো মানুষকেই খোঁজে। বনবাসী জীবন তো মানুষের জীবন নয়। মানুষ সঙ্গের কাঙাল, মানুষ মায়ার কাঙাল। তাই 'আজকে বনের পথ হারালেম ঘরের পথের ছলে'। পথহারা, ঘরহারা উদাসীন কবি এখানে এসে ঘরের পথের ছলনায় ভুলেছেন। নজরুল গৃহী স্বভাবের ছিলেন না। বিভিন্ন সভা সমাবেশ করা, গানের আসর, সাহিত্যের আসর, কবিতা পাঠ ইত্যাদি ছিলো নজরুলের প্রাণের আস্তানা। নির্দিষ্ট ঘরের ছায়া তাঁর মাথার উপরে না থাকলেও ঘরের টান ছিলো। ছলনা থেকে হোক বা না হোক, মানুষ কালে কালে ঘরের পথেই পা দিয়েছে খুব ব্যতিক্রমী দু'এক জন ছাড়া। মানুষের মনো-দৈহিক কাঠামোই মানুষকে ঘরের প্রতি কাতর করে তোলে। ফলে ঘরের বাইরে বাইরের দীর্ঘ ভ্রমণ শেষে, দীর্ঘ বিভ্রান্তি শেষে মানুষ যখন কারো মনে ঠাঁই পায় বা কাউকে মনে ঠাঁই দেয় মনে হয় এরই প্রতীক্ষাতেই আমি ছিলাম। আমার চরম আকাঙক্ষার জন বোধ হয় এই-ই। ধারণা ভাঙতে পারে, কিন্তু মানুষ যখন কাউকে পূর্ণ সমর্পণ করে তখন তাকে পূর্ণ করেই গ্রহণ করে। মনে হয় জনম জনম আমি তার অপেক্ষাতেই ছিলাম, সে-ই ছিলো আমার জীবনের ধ্রুবতারা:

"একলা-আমার পথ দেখাত ঐ বালিকাই চপল পায়ে
দিক হতে দিক-পানে!
মুঠার মানিক ঠেলে পায়ে
এলেম তোমার কুটির ছায়ে
চরণ-ছায়ে,
ক্লান্তি আমার দাও মুছায়ে
দীপ-ঢাকা অঞ্চলে।
আপন মালা পরাও বালা পরাও আমার গলে।
এবার আমায় সঁপে দিলাম তোমার চরণ-তলে।।"

(রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, ২০১২: ৬৪-৬৫)

*প্রেমে বা সম্পর্কে কারো হৃদয়াকাশে পূর্ণচন্দ্ররূপে স্থান পেতে চাইলে তাকেও তেমনি গভীরতম উচ্চ স্থানেই স্থান দেয়া প্রয়োজন। নজরুল দেনও তাই। কিন্তু, 'সমর্পণ' কবিতাতেই কোথায় যেন একটু কপটতা আছে বলে মনে হচ্ছে। এই যে 'অকারণে লাগল ভালো', একুশ শতকে এসে আমরা বুঝতে পারি 'অকারণে' আসলে কাউকে ভালো লাগে না। আমাদের রুচি, পছন্দ, বা মুগ্ধতার মানদণ্ডে কিছু না কিছু থাকে বলেই আমাদের ভালো লাগে। আমরা আবিষ্ট হই বলেই আমাদের ভালো লাগে। তাই যাকে ভালো লেগেছিল কখনো সে যথার্থ মূল্যায়নের দাবিদার। বোঝাপড়ার অমিল হতে পারে বা মোহ ভাঙতে পারে সেটা ভিন্ন বিষয়। কিন্তু, আমরা তো কাউকে দয়া করে ভালো বাসি না, ভালোবাসার যোগ্য বলেই ভালোবাসি। বাহ্যত বস্তুগত মানদণ্ডে আমরা সচেতনভাবে মানুষকে মেপে থাকলেও মন ঠিকই মনকে চায় বা চিনে নেয়। তাই 'মুঠার মানিক পায়ে ঠেলে' নয়; যেখানে আমরা ক্লান্তি মুছাতে পারি, গ্লানি ঘুচাতে পারি সেই আমাদের শ্রেষ্ঠ মানিক; এই স্বীকৃতি দেয়া প্রয়োজন।

৯.

'পুবের চাতক' কবিতায় 'পুব' বলতে হয়তো কবি কুমিল্লাকে বুঝিয়েছেন। কুমিল্লা তো কোলকাতার পূর্বেই অবস্থিত। কুমিল্লাতে কবি আহত হয়েছিলেন, অপমানিত হয়েছিলেন; কিন্তু তাঁর অন্তরতম নিবেদন তো রয়েই গিয়েছিল। যে জন ধরা দেবে দেবে করেও শেষ অবধি অধরা রয়ে গিয়েছিল তার জন্যই সম্ভবত কবি চাতকসম। ছেড়ে যেতে যেতেও কোথায় যেন বন্ধন থেকে যায়, চাওয়াচাওয়ি থেকে যায়। সকাল-সাঁঝে তাই কবির পূব-গগনে চেয়ে থাকা। অন্যদিকে কবি চান না, কারণ এতে তার প্রিয়ার বুকে কোমল ব্যথা বাজতে পারে। দেশপ্রেমের ব্যঞ্জনা থেকেও কবিতাটি পড়া যেতে পারে। পাশ্চাত্য দেশগুলোর বিবেচনায় পূব বলতে তো ভারতীয় উপমহাদেশকেও বোঝায়। দেশকে নজরুল প্রিয়াসমই ভালোবাসতেন। দেশের যাতনাকে, দেশের মানুষের যাতনাকে তাঁর মতো গভীর থেকে অনুভব করেছে কমজনই। প্রিয়াকে ছাড়তে যেমন তাঁর কষ্ট, তেমনি তো দেশকে ছাড়তেও:

"পুবের দেশের চাতক আমি চাই না কো আন পানে,
তাই তো সে তার চাহনি পুব গগনেই হানে।

সে থাকে মোর উদয়-দেশে তাই সে দেশে ভালোবেসে
তাকাই না গো পিছন পানের অস্তমরূদ্যানে,
পাছে তাহার বাজে ব্যথা কোমল অভিমানে।।"

(রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, ২০১২: ৬৫)

১০

স্থান-কাল-পাত্রের সমন্বয় মানবজীবনের প্রায় সকল স্তরে সকল ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। মানব-সম্পর্কের ক্ষেত্রেও তাই। প্রণয় কিংবা পরিণয়, সঠিক সময়ে সঠিক জায়গায় সঠিক মানুষটার সন্ধান মেলে না সব সময়। সঠিক মানুষকে ভুল সময়ে বা ভুল মানুষকে সঠিক সময়ে পাই আমরা। 'অবেলার ডাক' কবিতায় তেমনি এক বিষয় উঠে এসেছে৷ সঠিক মানুষটি যখন পরিপূর্ণ নিবেদন নিয়ে কবির দুয়ারে এসেছিলেন কবি তাকে হেলায় হারিয়েছেন। 'অনেক করে বাসতে ভালো' পারেননি যাকে কবি তাকেই 'আজ অবেলায় মনে পড়ছে' তাঁর। অনেক আলোচক নজরুলের প্রেমের কবিতায় শিশুর সারল্য এবং একেবারে নিবেদিত প্রেমিক সত্তার ব্যপারে অবাক হয়েছে। বিদ্রোহের কবিতার এতো দৃঢ় মানবের প্রণয়ের কবিতায় এমন আহাজারির কোনো যুক্তি খুঁজে পাননি। তাঁরা হয়তো হৃদয়ের কারবারের ধরনের দিকে তেমন সচেতন ভাবে নজর দেননি, দিলে তিনি ঠিকই বুঝতেন মানুষের সকল কঠোরতা যেখানে এসে মিলিয়ে যায় তা হলো প্রেম, ভালোবাসা, স্নেহের পরশের হৃদয়জাত সম্পর্কের কাছে। সেখানে মস্তিষ্কের নিয়ম খাটে না। যে আফসোস এ কবিতায়; 'একরাত্রি' গল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্কুলের সেকেন্ড মাস্টারের জবানিতে সেই আফসোসই করিয়েছিলেন। একসময় আমাদের যাকে 'বালাই' বলে মনে হয় তার জন্যই আবার আমরা 'ভাসি অঝোর নয়ন-ঝারে'। খুব করে যার কাছে আমরা নিজেকে নিবেদন করি তার কাছে অবহেলিত হই আবার 'ভরাট বুকের উপচে-পড়া আদর সোহাগ নিয়ে' যে আসে আমাদের কাছে তাকেও 'অহঙ্কারে' 'দারুণ হতাদরে' আঘাত করি। অন্যদিকে চোখ থাকায় অনাদরে ফেলে রাখি অমূল্য আপনকে, মানবচৈতন্যের এ এক পরিহাস —'এ মন তখন কেমন যেন বাসত ভালো আর কাহারে,/ আমিই দূরে ঠেলে দিলাম অভিমানী ঘর-হারারে।।' আক্ষেপ আর অনুশোচনার পরিপূর্ণ প্রকাশ তিনি এ কবিতায় করেছেন। মনের বন্ধ দরজায় করাঘাত করে করে হতাদরে ফিরে

যায় আমাদের প্রিয়রা। প্রেমাষ্পদ মুখ ফিরিয়ে নিলেই আমাদের চৈতন্য জাগ্রত হয়। সমালোচক রফিকুল ইসলামের বয়ানে:

> "প্রিয়জনকে ফিরিয়ে দেবার, উপেক্ষা করার অনুশোচনা দীর্ঘ কবিতাটিকে বেদনার্ত করেছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের শরীরী আবেগের প্রকাশও কবিতাটিতে ঘটেছে। হারিয়ে যাওয়া প্রেমিকের ক্ষুধাতুর রূপ যেমন স্পষ্ট হয়েছে তেমনি অন্যদিকে প্রেমিকার আকুলতার রূপটিও কামনা বাসনাময় রক্তিম আবেশে চিত্রায়িত হয়েছে।" (রফিকুল, ২০১৮: ৫৩৮)

নজরুলের প্রেম কখনো সরাসরি নর-নারীর ছাঁচে, প্রকৃতির গাছ-ফুল-পাখি-পাহাড়-নদী-সাগরের ছাঁচে, কখনো বা এই গ্রহের বাইরে মহাজগতের পরিসরেও ব্যাপ্ত হয়ে প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রেম আটপৌরে ঘর-সংসারের প্রেম নয়, তিনি বিশ্ব চরাচরে ব্যাপ্ত প্রেমিক। ঘরের মায়া তাঁর সয়নি কখনো, শরীর তাঁর এক জায়গায় আটকে থাকলেও মন বিহার করে বেড়িয়েছে প্রান্তর থেকে প্রান্তরে। তাই তাঁর প্রিয়াও আটপৌরে কাঠামোয় আবদ্ধ নয়, সেও বিশ্ব চরাচরে ব্যাপ্ত। এ কবিতায় যদিও কবি নারীভাবে প্রেমিকারূপে উপস্থিত, তাঁর ডাকে সাড়া না পেয়ে সেও ছুটে বেড়িয়েছে বনের মাঝে, মেঘের সাথে:

> "সে যে পথের চিরপথিক, তার কি সহে ঘরের মায়া?
> দূর হতে মা দূরান্তরে ডাকে তাকে পথের ছায়া।
> মাঠের পারে বনের মাঝে
> চপল তাহার নূপুর বাজে,
> ফুলের সাথে ফুটে বেড়ায়, মেঘের সাথে যায় পাহাড়ে,
> ধরা দিয়েও দেয় না ধরা জানি না সে চায় কাহারে?"
>
> (রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, ২০১২: ৬৭)

বিরহ-বিচ্ছেদে নজরুল কখনো কাতর নন, শেষ পর্যন্ত তিনি হয় শক্তিশালী নতুবা আশাবাদী। যে প্রিয়তমকে তিনি মূল্যায়ন করতে পারেননি, তিনি আশা রাখেন সেই প্রেয়সী আবারও আসবেন। এটা যেন তাঁর সহজ মনের বিশুদ্ধ ভালোবাসার বিশ্বাস। প্রেম-দেবতা এসে যখন পূজা দিয়েছিল 'ষোড়শ-উপচারে' তখন সেই পূজা-ধূমের আড়ালে

পড়ে গিয়েছিল পূজারী নিজেই। নজরুল প্রেমের কবিতায় পুরুষের পৌরুষ নিয়ে নয়, নারী মনের কোমলতা নিয়ে প্রকাশিত। উপরন্তু এ কবিতা নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা, তাই প্রেম এখানে আরো কমনীয়ভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

নজরুল প্রেমের সকল আবেগকে সহজে এবং সততার সাথে প্রকাশ করেছেন। তাই কোথাও নিজেকে তিনি পূত-পবিত্র করে বিপরীতকে কলুষিত করে দেখেননি। নিজের বিচ্যুতির জায়গাটা তিনি অনুভব করেছেন এবং প্রকাশ করেছেন। তাঁর ব্যক্তি আবেগ সংকীর্ণ গণ্ডি ছাড়িয়ে তাই হয়ে ওঠে সকল মানুষের মনের একান্ত কথা। মনের দুয়ার থেকে কেউ যখন গভীরতর নিবেদন নিয়ে এসে ফিরে চলে যায়, আর আমরা উপেক্ষা করি এবং পরে অবেলায় আমাদের মনে পড়ে সেই উপেক্ষার কথা তখন নিজের মন-গহনে দৃষ্টি দিলে বোঝা যায় মন তখন অন্য কোথাও মেতে ছিল। 'এ মন তখন কেমন যেন বাসত ভালো আর কাহারে,/ আমিই দূরে ঠেলে দিলাম অভিমানী ঘর-হারারে।।' এ কবিতার প্রচ্ছন্নে যে পূজারী-পুরুষ সে কবি নিজে হবার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ, তাঁর গভীর প্রণয় প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এবং 'অবেলায়' এসে নার্গিস উপলব্ধি করেছিলেন, অপেক্ষা করেছিলেন। এটাকেই কি কবি 'অবেলার ডাক' বলছেন?

পরবর্তী স্তবকগুলোতে দূরে সরে যাবার কারণ হিসেবে বলছেন প্রিয় কাছে আসলে 'ক্ষুধিত তার দীঘল চাওয়ার অশ্রু-ভারে' মনের তারে সুর হারিয়ে যেত। জীবনে এ বিপর্যয়ও তো কম নয়। যাকে বাসি ভালো তাকে নিতে পারি না নিজের করে, কত বাঁধার আড়ালে পড়ে মন কেবলই গুমরে মরে। এ ছাড়া খুব কাছে থাকলে তার অভাবও আমরা উপলব্ধি করি না। দূরে গেলেই বুঝি 'স্বর্গ আমার গেছে পড়ে তাঁরই চলে যাওয়ার সাথে'। এ বেদনায় ভুক্তভোগী মন বসে কল্পনায় মাতে আবার যদি আসত ফিরে সে গত হওয়া ভুল উসুল করে নিতো এবারে:

"আজ পেলে তাঁয় হুমড়ি খেয়ে পড়তুম মাগো যুগল পদে
বুকে ধরে পদ-কোকনদ স্নান করাতাম আঁখির হ্রদে।
বসতে দিতাম আধেক আঁচল,
সজল চোখের চোখ-ভরা জল
ভেজা কাজল মুছতাম তার চোখে-মুখে অধর-ধারে,
আকুল কেশে পা মুছাতাম বেঁধে বাহুর কারাগারে।।

দেখতে মাগো তখন তোমার রাক্ষুসী এই সর্বনাশী,
মুখ থুয়ে তাঁর উদার বুকে বলত,' আমি ভালোবাসি!'
বলতে গিয়ে সুখ-শরমে
লাল হয়ে গাল উঠত ঘেমে,
বুক হতে মুখ আসত নেমে লুটিয়ে যখন কোল-কিনারে,
দেখতুম মাগো তখন কেমন মান করে সে থাকতে পারে!"

(রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, ২০১২: ৬৮-৬৯)

পূর্বে যে আশাবাদের কথা বলছিলাম তা এ কবিতার শেষ স্তবকে ধ্বনিত। মানুষকে কিছু পাবার আগে বিশ্বাস করতে হয় যে তিনি সেটা পাবেন। মনে যদি কখনো গেঁথে যায় যে আমি এটা পাব না বা এ কাজ পারব না তবে তা শেষ অবধি নেতিবাচকতায়ই পর্যবসিত হয়। কিন্তু, আশায় ভাসেন যারা তাদের জীবন যেমন সদর্থকতায় কাটে, পাবার সম্ভাবনাও সেই সদর্থকতা সম্ভবে নিয়ে আসে কখনো কখনো। এ কবিতাতেও তিনি সেই আশাবাদ রেখে গিয়েছেন:

"যাই তবে মা দেখা হলে আমার কথা বলো তারে—
রাজার পূজা– সে কি কভু ভিখারিনী ঠেলতে পারে?
মাগো আমি জানি জানি,
আসবে আবার অভিমানী
খুঁজতে আমায় গভীর রাতে এই আমাদের কুটির-দ্বারে,
বলো তখন খুঁজতে তারেই হারিয়ে গেছি অন্ধকারে!"

(রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, ২০১২: ৭০)

১১.

চপল বালিকার চলার ছন্দে যে কবির আবেগ জড়িয়ে গিয়েছিল তা 'চপল সাথী' কবিতায় তিনি বলেছেন। দুলীর 'দোদুল-দোলা-চলায়' কবির পরান বাঁধা পরেছিল এবং তিনি হয়েছিলেন মুগ্ধ। আশালতা সেনগুপ্ত ওরফে দুলী তো বালিকাই ছিলেন, সেই চপল বালিকার বাধাহীন চরণছন্দে বাঁধা পড়েছিল কবির জীবন-মরণ। যে হৃদয় দোদুল দোলায়

আটকা পড়েছিল সে হৃদয় তো অদূর অতীতেই আঘাত পেয়ে এসেছে, তাই বালিকার নূপুরের ছন্দে তাঁর সে বেদনাই জেগে ওঠে। এ জন্যই কবি তাঁর ব্যথিত বুকে ধীরে চরণ ফেলতে বলেছেন। চপল বালিকার চরণ চলার নেশায় বিপথগামী হয়ে গেলে তাতে তো তিনি আবার বিভ্রান্ত হবেন, আঘাত পাবেন; তাই বালিকার প্রতি তাঁর এহেন অনুনয়-অনুরোধ:

"ঐ অধীর চরণ চলার নেশায় হলে বিপথগামী
আমি বাঁচব কি আর প্রিয়?
তোমার বিপথ সে যে আমার তরে মৃত্যু-আঘাত, স্বামি!
এখন ধীরে চরণ নিয়ো।
ওগো জানি জানি শুধু চলার সুখে
তুমি পা ফেলেছ আমার ব্যথার বুকে,
ঐ চলাই তোমার আমার গভীর দুখে,
শেষে প্রেম হয়ে সে করল অবতরণ।"

(রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, ২০১২: ৭১)

১২.

নজরুলের প্রেমবিষয়ক কবিতার মধ্যে বিশিষ্ট কবিতা 'পূজারিণী'। 'পদ-স্বচ্ছন্দ পয়ার বা সমিল অসমমাত্রিক অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত এ কবিতার পদগুলি অসমান এবং তাদের সংখ্যারও স্থিরতা নেই। বিভিন্ন চরণের মধ্যে মিল থাকলেও চরণগুলোর দৈর্ঘ্য বিভিন্ন। আবেগের তারতম্যে এ কবিতার বিভিন্ন চরণের মাপেও তারতম্য হয়েছে'। দীর্ঘ এ কবিতায় কবি একটা ভ্রমণের মধ্য দিয়ে গিয়েছেন। ঘটনার বাঁকপ্রবাহ থেকে খানিকটা সরে আসার পর তাঁর যখন উপলব্ধি হলো তখন তিনি দিবাযামী রুধিরাক্ত মরণ-খেলায় মগ্ন। জীবনের এই অবেলায় এসে খানিকটা পেছনে ফিরে গিয়ে প্রথম প্রণয়ের অঙ্কুর, বিকাশ, কখনো তৃপ্তি, কখনো অতৃপ্তি, খুঁজে ফেরা, পেয়ে যাওয়া, পেয়ে আবার না-পাওয়া বিবিধ পথ পরিক্রমার মধ্যে এগিয়েছে কবিতাটি। জীবনের একটা পর্যায়ে এসে তাঁর মনে হয়েছে তিনি তার প্রাণপ্রিয়াকে জন্মে জন্মে চেনেন, তার সকল শরীরী কাঠামোয় চেনেন এবং তাকে সম্বোধন করছেন 'পূজারিণী' বলে। এ সম্বোধনে প্রেমের শুদ্ধ রূপ ধরা দিলেও প্রায়

প্রেমের সকল আবেগ-অনুভবই এ কবিতায় বিদ্যমান। প্রেয়সীর কণ্ঠ, আঁখি, মুখ, ভুরু, ললাট, চিবুক, দোলো-দোলো গতি সবই চেনেন তিনি। নজরুল বিশুদ্ধ, সৎ, সাহসী মানবীয় প্রেমের কবি, তিনি তাঁর অনুভূতি প্রকাশে কোনো আবডাল ব্যবহার করেন না। জীবনের আশাহত, ক্লান্ত লগ্নে সেই প্রিয়নাম তিনি জপমালার মতো জপেন। ধ্যান-যোগী নজরুল তাঁর সাধনায় দেবতা আর প্রিয়কে একাকার করে রেখেছেন। তাঁর শেষের দিকের কবিতায় এ প্রবণতা আরো তীব্র এবং স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। যে প্রিয়ার ইষ্ট নাম ধরে তিনি জপেন তার পরিচয় তিনি দিয়েছেন:

"বিজয়িনী নহ তুমি– নহ ভিখারিনী,
তুমি দেবী, চির-শুদ্ধা তাপস-কুমারী, তুমি মম চির-পূজারিণী!
যুগে যুগে এ পাষাণে বাসিয়াছ ভালো,
আপনারে দাহ করি মোর বুকে জ্বালায়েছ আলো,
বারেবারে করিয়াছ তব পূজা-ঋণী।
চিনি প্রিয়া চিনি তোমা, জন্মে জন্মে চিনি চিনি চিনি!
চিনি তোমা বারেবারে জীবনের অস্ত-ঘাটে, মরণ-বেলায়।"

(রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, ২০১২: ৭২)

এ কবিতা প্রসঙ্গে গবেষক আতাউর রহমান বলেছেন:

> "'পূজারিণী' কবিতাটিতে চেতন-অবচেতন মনের বহু চিন্তা-ভাবনা ভিড় করে এসেছে। অতীত ও বর্তমান, অন্তর ও বাহির — এক স্রোতধারায় মিশ্রিত হওয়ায় কবিতাটির ভাব হয়েছে অস্পষ্ট। এখানে প্রত্যয়ের মধ্যে জেগেছে সংশয়, সংশয়ের মধ্যে প্রত্যয়, প্রেমের মধ্যে প্রতিহিংসা। ধৈর্য-ক্ষমা-সহিষ্ণুতার বাঁধ ভেঙে পড়েছে প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার আঘাতে। তাঁর পুরুষ কণ্ঠ তিক্ত ভাষায় আক্রমণ করেছে নারীকে, নারীর ভালোবাসাকে।" (আতাউর, ১৯৯৭: ৪৯)

এই চিরশুদ্ধা তাপস-কুমারীকে তিনি স্বীকৃতি যেমন দিয়েছেন বাক্যবাণে জর্জরিতও করেছেন। নজরুলের ধরনই যেন এমন বা আমরা বলতে পারি বিশুদ্ধ সহজ আবেগের মানুষের ধরনই এমন। যেখানে গভীর ভালোবাসা সেখানেই প্রবল আঘাত। প্রেম-দর্শনে

শরৎচন্দ্রও তো বলেছিলেন 'বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না, দূরেও ঠেলিয়া দেয়'। এ কবিতায় কবি প্রেয়সীকে 'পূজারিণী' সম্বোধন করাতে প্রেমের একটি শরীর বিবর্জিত, শুদ্ধ রূপ ফুটে ওঠে আমাদের সামনে। কিন্তু 'নজরুলের প্রেম প্রধানতঃ মানবিক, দেহস্পর্শতপ্ত ও লৌকিকভাবাপন্ন'। অদৃশ্যলোকের পূজারী সে প্রিয়া নয়, তাই সে অবিমিশ্র ভক্তিই শুধু পায়নি। তাঁর প্রাণ-মন যেখানে আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে তার স্বীকৃতি যেমন তিনি অতলস্পর্শী কৃতজ্ঞতায় দিয়েছেন, তেমনি তাঁর হিমালয়সম অনুভূতি যেখানে আহত হয়েছে সেটার প্রকাশও তেমনি তুঙ্গস্পর্শী করেছেন। মানবমনে কখনোই একই অনুভূতি সমান্তরালে দীর্ঘসময় বহমান থাকে না। এই তরঙ্গায়িত অনুভবের দ্বিধাহীন প্রকাশই এ কবিতার বাঁকে বাঁকে। মানবীয় প্রেমের কোন অনুভব নেই এখানে? একটা গভীর বঞ্চনার হাহাকার আছে, আছে বিলাপ, আছে তীব্র ক্ষোভ। বিরহ, অভিযোগ, অভিমান, সংশয়, প্রতারণা, সমর্পণ, বহুগামিতা, অচরিতার্থতা, পূর্ণতা, প্রত্যাশা, হতাশা, নারীর প্রতি তীর্যক বাণ, নারীকে অপার স্বীকৃতি প্রদান সবকিছুই সমান গভীরতা নিয়ে বিরাজমান।

কবি যার নাম ধরে তাঁর ইষ্টমালা জপেছেন, যাকে তিনি তাঁর জীবনের অস্ত-ঘাটে, মরণ-বেলায় বারবার চিনেছেন, আজ দিনান্তের প্রান্তে বসে চোখের জলে ভিজে দূর-দূরান্ত থেকে মনে তার স্মৃতি আনছেন। যে তাপসপ্রিয়ার নামে প্রেম-সাধনার চূড়ান্তে পৌঁছে তিনি ইষ্টমালা জপেছেন তার কাছ থেকে প্রাপ্ত বেদনাও তাঁকে প্রবলভাবে আঘাত করেছে। দুরন্ত কৈশোর আর উত্তাল যৌবনের সন্ধিক্ষণে কবির আঁখি ধন্য হয়েছিল তার আঁখি চাওয়া সনে মিশে। জীবনের এ সময়টাতে মানুষ জাগতিক সকল রূঢ় বাস্তবতার বাইরে গিয়ে চরম কল্পনাপ্রবণ হয়ে থাকে, হৃদয়জাত অনুভূতির মাত্রা অনেক গভীর হয়ে থাকে। মনের গহীনে রচিত কল্পনালোককেই একমাত্র সত্য বলে মনে হয়। কৈশোর উত্তীর্ণ এ সময়ে মন অবচেতনেই তার দোসর খুঁজে ফেরে। নিঃসন্দেহে এখানে জৈবিক হরমোন নিঃসরণের ভূমিকা রয়েছে। মন তখন আবেগের সঙ্গী খুঁজে বেড়ায় এবং পেয়ে গেলে তার সত্তার পূর্ণতা অনুভব করে। কিন্তু নজরুল সেই প্রথম প্রণয়েই বেদনার ভার বহন করে চলেছে। প্রথম ভালোলাগা মানুষের কাছেও তিনি নিয়ে নিয়ে এসেছিলেন 'গৃহহারা বেদনার আঁখি-ভরা বারি'। আমাদের তো ভুলে গেলে চলে না আমরা 'দুখু মিয়া'র মনকে পড়ছি নজরুলের কবিতায়। দুঃখ-দারিদ্র্য ছিল তাঁর আজন্ম সঙ্গী, এই দারিদ্র্য তাঁর প্রেমানুভূতিতে

এসেও করুণ রসের সঞ্চার করেছে। তাই একটু কাছে আসার পরে দ্রুতই অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে; সদা চঞ্চল মনে উদয় হয় অন্য ভাবনার:

"তারপর– অনাদরে বিদায়ের অভিমান-রাঙা
অশ্রু-ভাঙা-ভাঙা
ব্যথা-গীত গেয়েছিনু সেই আধ-রাতে;
বুঝি নাই আমি সেই গান-গাওয়া ছলে
কারে পেতে চেয়েছিনু চিরশূন্য মম হিয়া-তলে–"

(রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, ২০১২: ৭৩)

সেই পূজারিণীকেই পেতে চেয়েছিল সে, তার আঁখির পলকে তিনি দেখেছিলেন 'বিস্ময়-পুলক-দীপ্তি ঝলকে ঝলকে'। 'গলেছিল গাঢ় ঘন বেদনার মায়া' তার চোখের পলকে, কবির তৃষাতুর চোখে তা লেগেছিল ভালো। তারপর গান গাওয়া শেষে তিনি নাম ধরে কাছে ডাকলে বালিকার বাঁধ ভাঙা উচ্ছ্বাস তিনি দেখেছিলেন। যুগে যুগে অনাদৃত হিয়া যেন তার, একটুকু আদরে অভিমানে ভেঙে পড়েছিল আঁখি-জল। অ-জানা অ-চেনা এ পথিকের তরে সমর্পিত হয়েছিল বালিকার গভীরতর নিবেদন। বালিকাদের প্রথম প্রেম বুঝি এমনই হয়, যে তাকে দেখে একটু স্নেহ-প্রেম দিয়ে তার প্রতিই উছলিয়ে ওঠে তার বিকাশমান প্রথম যৌবনাবেগ। কিন্তু, কবির কাছ থেকে এমন স্নেহ-প্রেমসুধা কেউ নিতে পারেনি এর আগে। মণি ভেবে তাঁকে যারা গলে পরেছিল পরে ফণির দংশন পেয়ে তারা তাঁকে ফেলেছে পদতলে। কিন্তু এ বালিকা কবির ভেতরে পেয়েছিল কোন সুধালোকের সন্ধান! পৃথিবীতে এতো বৈচিত্র্যময় মানুষের মধ্যে সবার সাথে তো সবার মনের যোগ ঘটে না, আবার যার সাথে যার ঘটে তার মাঝে লুকায়িত সুধাভাণ্ডারের সন্ধান একমাত্র সে-ই পায়, অন্যে নয়। তাই একজনের কাছে যে মানুষটা অনিন্দ্য রূপ-মাধুর্য নিয়ে প্রকাশিত হয় অন্যে তার কোনো যথার্থতা খুঁজে পায় না অনেক সময়েই। প্রেমিক বা প্রেমিকা নিজেও হয়তো বোঝে না অনেক সময় কী তার আছে এমন সুধাময় যা ভরিয়ে তোলে তার

প্রেমাষ্পদের মন। এখানেও কবি তাঁর তাপস-কুমারীর প্রতি জিজ্ঞাসা করছেন কোন সে সুঁতো যা তাকে বেঁধে দিল কবির প্রাণে:

"বিশ্ব যারে করে ভয় ঘৃণা অবহেলা,
ভিখারিনী! তারে নিয়ে এ কি তব অকরুণ খেলা?
তারে নিয়ে একি গূঢ় অভিমান? কোন অধিকারে
নাম ধরে ডাকটুকু তাও হানে বেদনা তোমারে?
কেউ ভালোবাসে নাই? কেউ তোমা করেনি আদর?
জন্ম-ভিখারিনী তুমি? তাই এত চোখে জল, অভিমানী করুণা-কাতর!"

(রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, ২০১২: ৭৪)

কবির অনুমান ঠিক ছিল না, কেউ তাকে বাসেনি ভালো এমন নয়; তিনি দেখেছেন শতজন আসে তার ঘরে, ভালোবাসে তারে। তাদের ভালোবাসায় পূর্ণ হয়নি বালিকার হৃদয়। তার চোখেমুখে ছিলো 'এ অতৃপ্তি এ কী স্নেহ-ক্ষুধা', কবিকে দেখেই তার উছলাতো বুকে প্রীতি-সুধা। এমনই তো হয়, অনেকের মাঝে কেউ এসে জুড়ে বসে হৃদয়ের অনন্য জায়গা জুড়ে। এর কারণ সম্পর্কে কবিই বলছেন, 'চেনে তাহা প্রেম, জানে শুধু প্রাণ–/ কোথা হতে আসে এত অকারণে প্রাণে প্রাণে বেদনার টান!' সে তাপস-বালিকা ছিল জন্ম জন্ম ধরে অনাদৃতা সীতা, খেলার ছলে কবি তার ছিঁড়েছেন মালা, ভেঙেছেন দেব-পূজার থালা। চির-মৌনা শাপভ্রষ্টা দেব-বালা সেসব নীরবে সয়েছে। এসবের মাধ্যমে যেন নজরুল শরীরী সান্নিধ্যের প্রকাশই করছেন। এ সকল পরিক্রমায় কবি জেনে গিয়েছেন 'তুমি মোর জয়লক্ষ্মী, আমি তব কবি'। এই সহজ চেনা চিনে নেবার পর আসন্ন বিচ্ছেদ ভাবনায় সে বালিকার কণ্ঠে বেজেছিল বিরহের সুর। যে সুরে রাধা কেঁদেছিল কৃষ্ণ বিচ্ছেদে, অবহেলা বুকে নিয়ে এই সুরেই ছিল ললিতার কাঁদা, একাকিনী দময়ন্তী, বিষাদিনী শকুন্তলার বিরহসুরের সাথে নজরুল মিলিয়ে দিলেন বিশ শতকের বালিকার ব্যথাসুর। বিরহ-বিচ্ছেদ ব্যথা মানুষের আদিম-মৌল অনুভব, এখানে এসে মিলে যায় সর্বকালের সর্বমানব-মানবী। কবি বালিকার কণ্ঠের কাতরতা শুনলেন, বুঝলেন বটে কিন্তু,

'যৌবন সে জাগিল না, লাগিল না মর্মে তাই গাঢ় হয়ে তব মুখ-ছবি'। যৌবন জাগিল না বলে তাকে রেখে চলে গেলেন কোন পল্লীপথে দূরে। কিন্তু, 'দুদিন না যেতে এ কি সেই পুণ্য গোমতীর কূলে/ প্রথম উঠিল কাঁদি অপরূপ ব্যথা-গন্ধ নাভি-পদ্ম-মূলে!' কবি খুঁজে চললেন তাঁর তীব্র বিচ্ছেদের উৎস। বিচ্ছেদে প্রেমানুভূতি প্রগাঢ় হয়ে ওঠে, প্রবল টান অনুভূত হয় প্রেমাষ্পদের প্রতি। দুদিনেই নজরুলও অনুভব করেছিলেন, সবাইও তাই করে। কামনার যে তপ্ত ঘনশ্বাস বয়ে যায় মানবের শিরা মাঝে, আকাশ-বাতাস-ধরাও কাঁপে সেই শ্বাসে। নিজের অশান্ত, উদ্বেলিত মনের প্রতিরূপ ভেসে ওঠে স্বর্গ-মর্ত-পাতাল এমনকি বিধাতার বুকেও:

"কেঁদে ওঠে লতা-পাতা
ফুল পাখি নদী-জল
মেঘ বায়ু কাঁদে সবি অবিরল,
কাঁদে বুকে উগ্রসুখে যৌবন-জ্বালায়-জাগা অতৃপ্ত বিধাতা!
পোড়া প্রাণ জানিল না কারে চাই,
চিৎকারিয়া ফেরে তাই– 'কোথা যাই,
কোথা গেলে ভালোবাসাবাসি পাই?'
হু-হু করে ওঠে প্রাণ, মন করে উদাস উদাস,
মনে হয়– এ নিখিল যৌবন-আতুর কোনো প্রেমিকের ব্যথিত হুতাশ!"

(রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, ২০১২: ৭৫-৭৬)

নজরুলের এ বিরহ-যন্ত্রণা নিয়ে রফিকুল ইসলাম বলছেন:

> "'যৌবন জ্বালায় জাগা অতৃপ্ত বিধাতা' নজরুলের প্রেম কবিতায় প্রেমিকের যথার্থ চিত্রকল্প, সে অতৃপ্তির জ্বালা বস্তুতঃ প্রেমের দেহজ আবেগের, শরীরী রূপের, রক্তিম বাসনার পরিচর্যা, যা নজরুলের প্রেম কবিতার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। নজরুলের প্রেমিক ঐ যন্ত্রণায় অহরহ বিদ্ধ, এ যন্ত্রণাকে প্রেমিক সৃষ্টি করে, লালন করে, পরিচর্যা করে, এ এক বেদনা বিলাস, যা রোমান্টিক প্রেম কবিতার একটি প্রধান লক্ষ্মণ।" (রফিকুল, ২০১৮: ৫৪৩)

প্রেমের এ তীব্র অনুভূতির পূর্ণতা বাইরে কারও কাছে পাওয়া কঠিন হয়ে যায়, এজন্যই যুগে যুগে মানুষ আপনার মনমাঝে ডুব দিয়েছে। খুঁজেছে নিজের ভেতরের ভাণ্ডারকে।

রবীন্দ্রনাথ 'বক্ষ হইতে বাহির হইয়া আপন বাসনা মম ফিরে মরীচিকা সম' বলেছেন, নজরুল বলছেন 'আপনার ভালবাসা/ আপনি পিইয়া চাহে মিটাইতে আপনার আশা'; কারণ আপনার চেয়ে আপন যেজন সে আপনার মাঝেই নিহিত থাকে। কিন্তু, বাইরের প্রভাবক ছাড়া অন্তরের মধুরতার ক্ষরণ হয় না। তাই 'মোর চেয়ে স্বেচ্ছাচারী দুরন্ত দুর্বার' কাওকে খুঁজে চলে মানুষ। ভিক্ষু সন্ন্যাসীর মতো পথে পথে ঘোরে প্রেম-ভিক্ষার জন্য। কবি খুঁজে বেড়ান 'কোথা মোর ভিখারিনী পূজারিণী কই?/ যে বলিবে — ভালোবেসে সন্ন্যাসিনী আমি'; কিন্তু অবোধ নারীদের কেউ তাকে ধনের, কেউ রূপের, কেউ যৌবনের বন্ধনে আটকাতে চায়। জীবনের ট্রাজেডি এখানেই, সে বস্তুগত চাওয়া-পাওয়ার বাইরেও যেতে পারে না। আবার শুধু নগ্ন বস্তুবাদ দিয়েও মন শান্ত হয় না। জীবন মূলত ভারসাম্যের কাঙাল, সে ভারসাম্য খোঁজে। তাই যে নারীরা রূপ-ধন-যৌবনের বন্ধনে আবদ্ধ করতে চেয়েছে তাদের প্রচেষ্টা যেমন নজরুলের কাছে তুচ্ছ মনে হয়েছে তেমনি যে মৌনা তাপসিনী শুধুই তার হৃদয়ের নিবেদন, শুদ্ধ সমর্পণ দিয়ে গিয়েছে নীরব ভাষাও (তাই থাকে সব সময়), কবি বোঝেন নাই। এই অতৃপ্তি নিয়ে আদর্শ প্রেমিকা অন্বেষণের পরিক্রমায় তিনি আশ্রয় পেয়েছেন এক মাতার কাছে, তার স্নেহসুধায় শীতল হয়েছেন কিছুকাল। এই মুক্তধারা মায়ের স্নেহময় সুধাতলেও থাকতে পারলেন না বেশিদিন, সইলো না তার গৃহের বন্ধন। আবার ভুললেন পথ, ভুলে গেলেন কাকে তিনি ফিরছেন খুঁজে। নতুন কোনো প্রণয়পাশে পরলেন বাধা:

"নব সুখ-অশ্রুধারে গলে গেল হিয়া, ভিজে গেল অশ্রুহীন চোখ।
যেন কোন রূপ-কমলেতে মোর ডুবে গেল আঁখি,
সুরভিতে মেতে উঠে বুক,
উলসিয়া বিলসিয়া উথলিল প্রাণে
এ কী ব্যগ্র উগ্র ব্যথা-সুখ।
বাঁচিয়া নূতন করে মরিল আবার
সীধু-লোভী বাণ-বেঁধা পাখী।...."

(রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, ২০১২: ৭৯)

কিন্তু, এই নব-সুখধারা বয়নি বেশিদিন, আহত হয়েছেন কবি, হয়েছেন উপেক্ষিত, বঞ্চিত। আর নজরুল-প্রেমের বৈশিষ্ট্যই এমন 'এক সিন্ধু শুষি বিন্দু-সম মাগে সিন্ধু আর'। এই

অসীম প্রেম তৃষ্ণা মেটেনি কবির, হুংকার দিয়ে উঠেছে তাঁর বিদ্রোহ, 'বেদনার আদি হেতু স্রষ্টা'কে তিনি করেছেন আক্রমণ। এর মাঝে শুনলেন সেই পুরাতন বীণার আহবান। পুরাতন প্রশান্তিস্থলে শান্ত হবার আশায় আসলেন এবং হলেনও:

"বেঁচে ওঠ মরা প্রাণ! ডাকে তোরে দূর হতে সেই —
যার তরে এত বড় বিশ্বে তোর সুখ-শান্তি নেই!'
তারি মাঝে
কাহার ক্রন্দন-ধ্বনি বাজে?
কে যেন রে পিছু ডেকে চীৎকারিয়া কয় —
বন্ধু এ যে অবেলায়! হতভাগ্য, এ যে অসময়!
শুনিনু না মানা, মানিনু না বাধা,
প্রাণে শুধু ভেসে আসে জন্মান্তর হতে যেন বিরহিণী ললিতার কাঁদা!
ছুটে এনু তব পাশে
উর্ধ্বশ্বাসে;
মৃত্যু-পথ অগ্নি-রথ কোথা পড়ে কাঁদে, রক্ত-কেতু গেল উড়ে পুড়ে,
তোমার গোপান পূজা বিশ্বের আরাম নিয়া এলো বুক জুড়ে।"

(রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, ২০১২: ৮০)

নজরুলের বাস্তব ব্যক্তিগত জীবনে বারবার প্রেম এসেছে, নজরুল গবেষক গোলাম মুরশিদ এ সম্পর্কে বলেছেন:

"প্রথমজনের নাম জানা যায় না, কিন্তু তাঁর চুলের কাটা নিয়ে সৈন্য বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন এবং বাহিনী থেকে ফিরে এসে তাঁর নামে নিজের প্রথম গ্রন্থ উৎসর্গ করেছিলেন। তারপর নার্গিসের সাথে স্বল্পস্থায়ী কিন্তু তীব্র প্রণয়। এবং তারপর প্রমীলার সঙ্গে প্রেম এবং পরিণয়। আমরা পরে লক্ষ্য করব যে, ফজিলাতুন্নেছার পরে তিনি মাত্রাভেদে আরও একাধিক নারীর প্রেমে পড়েছিলেন।" (গোলাম মুরশিদ, ২০২১: ৩১২)

কিন্তু, বারবার একাধিক জনের দ্বারে দ্বারে ঘুরে আসা এই প্রেমিকও বারবার উপেক্ষা করা প্রেমিকার কাছে এই আরাম পেয়ে তৃপ্ত নয়, চায় শতভাগ শুদ্ধ সমর্পণ! একটুও কমতি দেখে যখন, ক্ষেপে ওঠে তখন, করে সন্দেহ, আসে অনীহা। নিজে সদাই উদাসীন হলেও

নারীর উদাসীনতা, অপমান, অবমাননা, উপেক্ষা তাঁকে অবিশ্বাসী করে তুলেছে বারবার। উল্টাটাও সত্য বটে আর এটাই মানব-মনস্তত্ত্বের জটিলতম জায়গা। দেবার জায়গাটা শিথিল রেখে পাবার জায়গাটায় হিসাব কড়ায় গণ্ডায় মেটাতে চায় সবাই। নজরুলও চেয়েছিলেন, না পেয়ে তীব্র আক্রমণ করেছেন পুরো নারী জাতিকে। দিব্য দৃষ্টিতে সবাই অন্যের ত্রুটিটুকুই দেখতে পায়, দেখেছিলেন তিনিও। 'মোর বুকে জাগিছেন অহরহ সত্য ভগবান' — এই জাগ্রত ভগবানের দিব্যদৃষ্টি দিয়ে তিনি সামনের জনকে তন্ন তন্ন করে দেখেছিলেন। দেখেছিলেন সেখানে তাঁর শতভাগ সমর্পণ নাই। তাই যে প্রিয়াকে কল্যাণময়ী তপঃ শুদ্ধা পূজারিণীরূপে বন্দনা করেছেন পূর্ণ বিশ্বাসে তাকেই আবার ডাকিনী, মিথ্যাময়ী, কলঙ্কিনীরূপে সন্দেহ করেছেন। নিজে তিনি বহু-চারি আকাঙ্ক্ষার প্রেমিক হলেও প্রেমিকার কাছে ছিল তাঁর একনিষ্ঠতার দাবি। দেহনির্ভর উত্তপ্ত আবেগের পাশাপাশি আছে দেহাতীত সৌন্দর্য ও অরূপের হাতছানি। এ জাতীয় বিরোধী আবেগকে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দিক থেকে অন্যভাবেও ভাবা যেতে পারে। 'ইন্দ্রিয় সম্ভোগের আবেগকে তাপসী প্রিয়ার শুদ্ধ শুচিতার কল্পনায় শোধিত করে নেয়ার এই প্রয়াস অবচেতনে নিহিত গ্লানি বা পাপবোধেরই ইঙ্গিত হতে পারে। যাই হোক এই জাতীয় বিরোধী কামনার অনিবার্য পরিণাম অতৃপ্তি ও আত্ম-নিপীড়ন নজরুলের ক্ষেত্রে।' ভোগবাদের দিক থেকে ওমর খৈয়ামের সাথে নজরুলকে তুলনায় এনে নীলিমা ইব্রাহীম বলেন:

> "এই ভোগাসক্তি, প্রেম-অতৃপ্তি নজরুলকে বিশ্বের সকল প্রেমিক-প্রেমিকার প্রতি আগ্রহাকুল করে তুলেছে। সকল ধর্ম ও জাতির সর্বকালের ইতিহাস, পুরাণ, গল্প, লোকগাথা মন্থন করেছেন কবি প্রেমের স্বরূপ সন্ধানে; কিন্তু নিশাপুরের নির্জন কুঞ্জে যে সাকীকে পেয়ে ওমর আত্মস্থ, কৃতার্থম্মন্য; নজরুল তাকে খুঁজলেও পাননি। নজরুল আত্মতৃপ্ত বা আত্ম সমাহিত নন; অবিশ্বাসের যন্ত্রণায় ক্ষুব্ধ কাতর।" (সংকলিত, বিশ্বজিৎ ঘোষ, ২০১৬: ৪৫)

যে জনের কাছে মানুষের অকৃত্রিম, গভীর প্রত্যাশা থাকে তা পূর্ণ না হলে মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়। মানুষ প্রত্যাশা করে অমর, একনিষ্ঠ প্রেম। নজরুল হৃদয়ের কবি, হৃদয়ের প্রেমিক, তাই তাঁর হৃদয়ে সয়নি কোনো ছলনা। আহত হয়েছেন, তার তীব্র প্রকাশ করেছেন, হতাশা আর অভিমান পরিণত হয়েছে ক্রোধে:

"অপমানে ফেটে যায় বুক!
প্রাণ নিয়া এ কি নিদারুণ খেলা খেলে এরা, হায়!
রক্ত-ঝরা রাঙা বুক দলে অলক্তক পরে এরা পায়!
এর দেবী, এরা লোভী, এরা চাহে সর্বজন-প্রীতি!
ইহাদের তরে নহে প্রেমিকের পূর্ণ পূজা, পূজারীর পূর্ণ সমর্পণ,
পূজা হেরি ইহাদের ভীরু বুকে তাই জাগে এত সত্য-ভীতি।
নারী নাহি হতে চায় শুধু একা কারো,
এরা দেবী, এরা লোভী, যত পূজা পায় এরা চায় তত আরো!
ইহাদের অতিলোভী মন
একজনে তৃপ্ত নয়, এক পেয়ে সুখী নয়,
যাচে বহু জন।..
যে-পূজা পূজিনি আমি স্রষ্টা ভগবানে,
যারে দিনু সেই পূজা সে-ই আজি প্রতারণা হানে।"
(রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, ২০১২: ৮২-৮৩)

এই প্রতারণায় তাঁর স্বভাবগত বিদ্রোহ জাগ্রত হয়েছে এবং সর্বনাশা তুরী দিয়ে পরশু-ত্রিশূলের আঘাত হেনে এই মিথ্যাপুরী ধ্বংস করতে চেয়েছেন। কিন্তু এই বিষ, এই বিদ্রোহ, এই জ্বালার ভেতরে ভেতরে জাগে সেই ভিখারিনী বালিকার স্মৃতি, যে কবি ভালো না বাসতেই তাঁকে বেসেছিল ভালো। কিন্তু কবি দেখেননি তা চেয়ে, করেননি মূল্যায়ন। তারই প্রতিশোধ বুঝি তিনি পেয়েছেন। ভেবেছিলেন একবার যে প্রেমিকা তাঁকে মন-প্রাণ সঁপেছে চিরতরে তাঁর হয়ে গিয়েছে। কিন্তু, কুসুমের (পুতুলনাচের ইতিকথা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়) তাতানো প্রেমে যেমন মরিচা পরেছিল অবহেলায়, এ প্রেমেও তাই হয়েছে। কবির প্রেম-বায়ু স্পর্শে যে ফুল ফুটেছিল কবির অবমূল্যায়নে সে ফুল দলেছে অন্য অলি। তিনি ভেবেছিলেন কুমারীর অকলঙ্ক দান তিনি একবার যে পেয়েছেন তাতেই তার চিরকালীন অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং তিনি বালিকাকে যে প্রতিদানই দেন না কেন বালিকার প্রেম একই গতি সমান্তরালে বইবে সারাক্ষণ, এটা নিতান্তই অলীক ভাবনা; বাস্তবে এমন হয় না কারো, হয়নি নজরুলেরও। তাই পরিশেষে সেই সুখ মনে নিয়ে নিজেকে প্রবোধ দিয়েছেন যে তিনি না বাসিতেই ভালো যে ভালোবাসা পেয়েছিলেন সেই সুখ বুকে নিয়ে অমর হয়ে

থাকবেন। ফিরে এসে আকাঙ্ক্ষিত প্রেম না পেয়ে কবি শুরুর দিনগুলোর স্মৃতি মন্থন করে চলেছেন 'মৃত্যুহীন চিররাত্রি নাহি-জানা দেশে'। তবে সে প্রেমেই যে তিনি অমর হয়েছেন তাঁর ভাষ্য দিয়েই তিনি কবিতা শেষ করেছেন:

"সেই সুখে মৃত্যু-কৃষ্ণ অধর ভরিয়া
আজ আমি শতবার করে তব প্রিয় নাম চুমি।
মোরে মনে পড়ে
একদা নিশীথে যদি প্রিয়
ঘুমায়ে কাহারো বুকে অকারণে বুক ব্যথা করে,
মনে করো, মরিয়াছে, গিয়াছে আপদ!
আর কভু আসিবে না
উগ্র সুখে কেহ তব চুমিতে ও-পদ-কোকনদ!
মরিয়াছে —অশান্ত অতৃপ্ত চির-স্বার্থপর লোভী, —
অমর হইয়া আছে —রবে চিরদিন
তব প্রেমে মৃত্যুঞ্জয়ী
ব্যথা-বিষে নীলকণ্ঠ কবি!"
(রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, ২০১২: ৮৪-৮৫)

কবিতাটি নজরুলের প্রণয়-দর্শনের অন্যতম প্রতীক। কেননা, এ কবিতায় তাঁর প্রণয়াদর্শের সকল স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে । এখানে প্রেমের আদি, মধ্য, ও পরিণতির একটা স্পষ্ট রূপ ধরা দিয়েছে। দেহ কামনা এবং কাম-বিরহিত প্রণয়ানুভূতির সুন্দর প্রকাশ, বহুচারী প্রেমের সাথে একনিষ্ঠ প্রেমের সমান্তরাল উপস্থাপন, জীবনের প্রেম-অধ্যায়ের নানা বাঁক-বদল ইত্যাদি নিয়ে 'পূজারিণী' কবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। শুধু এ কবিতাটির জন্যও নজরুলের প্রেমদর্শন অমরত্ব পেতে পারে।

১৩.

আহত, বঞ্চিত, অপমানিত মানুষের মনের মধ্যে একটা কালো স্রোত বইতে থাকে। সেই কালো স্রোতে সে রাবীন্দ্রিক প্রেম দর্শনের (যদি আর কারে ভালোবাসো, যদি আর ফিরে

নাহি আসো; তবে তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও আমি যত দুঃখ পাই গো) ঠিক উলটো প্রতিক্রিয়া করে। সে চায় যে বা যারা তাকে বঞ্চিত করেছে, ফিরিয়ে দিয়েছে একদিন মর্মে মর্মে সে/ তারা তার অভাব বুঝুক, গুরুত্ব উপলব্ধি করুক। সেদিন হয়তো সে আর থাকবে না। স্বাভাবিক ঈর্ষা থেকে মানুষ এমনটা চিন্তা করে, আর প্রেমের সাথে ঈর্ষার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। মানুষের মধ্যে তার নিজের ভালোবাসাকে অনন্য হিসেবে ভাবার একটা প্রবণতা থাকে এবং কমবেশি প্রায় প্রতিটা মানুষের মধ্যেই এ বিশ্বাস থাকে যে তার ভালোবাসা বা নিবেদন প্রতিস্থাপন অযোগ্য। তিনি অনন্য এবং অতুলনীয়, তাকে ছেড়ে গেলে তার অভাব অনুভব করতেই হবে। বাস্তবে এটা কতখানি হয় সে বিশ্লেষণ থাক। তবে সবার জীবনেই বোধ হয় এমন কেউ থাকে যে আসলেই প্রতিস্থাপন অযোগ্য। 'অভিশাপ' কবিতায় বঞ্চিত প্রেমিকমনের এমন দিকের প্রতিচ্ছবির প্রতিরূপই দেয়া হয়েছে। অধিকাংশ মনের অব্যক্ত চাওয়ার সৎ ভাষ্য নজরুল রেখে গিয়েছেন এ কবিতায়। ব্যক্তির অনুভব হয়ে উঠেছে বিশ্ব-মানবের অনুভব, শিল্পীর সার্থকতা এখানেই। কবি যেদিন হারিয়ে যাবেন কবিকে বিশ্বপ্রেক্ষাপটে খুঁজতে হবে। তিনি ভালোবাসাতে থাকতে না পারলেও হারিয়ে রয়ে যাবেন। পুরো বিশ্ব তন্নতন্ন করে তাঁকে খুঁজবে প্রিয়া:

"যেদিন আমি হারিয়ে যাব, বুঝবে সেদিন বুঝবে!
অস্তপারের সন্ধ্যাতারায় আমার খবর পুছবে–
বুঝবে সেদিন বুঝবে।
ছবি আমার বুকে বেঁধে
পাগল হয়ে কেঁদে কেঁদে
ফিরবে মরু কানন গিরি,
সাগর আকাশ বাতাস চিরি
যেদিন আমায় খুঁজবে–
বুঝবে সেদিন বুঝবে!"

(রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, ২০১২: ৮৫)

এ কবিতা সম্পর্কে সমালোচক রফিকুল ইসলাম বলেছেন:

"'পূজারিণী' কবিতায় যে আবেগ ও অভিজ্ঞতার পরিচর্যা, 'দোলন-চাঁপা' গ্রন্থের আরো কয়েকটি কবিতাতেও তার অনুরণন লক্ষ্য করা যায়। 'অভিশাপ' কবিতায় উপেক্ষিত

প্রেমিকের দীর্ঘশ্বাস বেদনা সঞ্চারিত করেছে। প্রেমিক এ পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেলে তার স্মৃতি নিষ্ঠুর প্রেমিকাকে কি ভাবে বেদনার্ত করবে স্বরবৃত্ত ছন্দে এ কবিতায় প্রেমিকের সে আশাকে রূপায়িত করা হয়েছে।" (রফিকুল, ২০১৮: ৫৪৯)

'স্বপন ভেঙে নিশুত রাতে' কারও ছোঁয়ার অনুভূতিতে জাগ্রত হলে প্রিয়া ব্যথিত হৃদয়ে দেখবে আসলে শূন্য চারিধার। মানুষ মিলনে যতখানি থাকে তার চেয়ে অনেক বেশি থাকে বিরহে। বিরহ-বেদনায় প্রিয় মানুষকে অনেক গভীরভাবে অনুভব করা যায়। কবির শেখানো গান কণ্ঠে গাইতে গেলে অন্তরের প্রগাঢ় বেদনাতে কণ্ঠ ছিঁড়ে কান্না বের হয়ে আসবে। 'এ মোর অহঙ্কার' কবিতায় কবি না-পাওয়া প্রিয়াকে নিয়ে কবিতা-গান রচনা করে যান আর সেই কবিতা গানেই প্রিয়া কালের পর কাল স্মরিত হবেন কবি এ বিশ্বাস রাখেন। কিন্তু কবি তো সেদিন থাকবেন না, কবিকে স্মরণ করে গান ছাপিয়ে কান্নার স্রোত বইবে। অঙ্গনে ফোঁটা শিউলি ফুল কুড়িয়ে মালা গাঁথার সময় শিউলি ঢাকা কবির সমাধি স্মরণে আসবে। মানুষ এজন্যই চ্যারিটি করে মহৎ কাজ করে যায় আর সেই মহৎ কাজের মধ্যে তিনি থেকে যান অনন্তকাল। আশ্বিন-হাওয়ার শিশির-ছেঁচা রাতে অন্য বঁধূর পরশে অনুভব হবে যেন কবির পরশ। এমন অনুভূতিগুলোর বাস্তব প্রেক্ষাপট আছে। মানুষ তার সর্বাত্মকরণে যাকে চায় কখনো কখনো পরিবার, সমাজ, ধর্ম, নিজেদের ভুল বোঝাবুঝি প্রভৃতি বেড়াজালে বিচ্ছিন্ন হয় তার থেকে। অসাড়ের মতো না চাইতে জীবন কাটাতে হয় অন্য কারো সাথে। চিন্তায়-মননে, স্মৃতিতে-অনুভবে হয়তো অন্য কেউ জীবন্ত, কিন্তু বাস্তবিক জীবনে সে নাই। তার সাথে কাটানো সুখময় বা ব্যথাময় সময় স্মৃতিতেই শুধু জীবন্ত হয়ে রয়। জীবন বহতা নদীর মতো, সে তো থেমে থাকে না:

"আবার গাঙে আসবে জোয়ার, দুলবে তরী রঙ্গে,
সেই তরীতে হয়তো কেহ থাকবে তোমার সঙ্গে–
দুলবে তরী রঙ্গে।
পড়বে মনে, সে কোন রাতে
এক তরীতে ছিলে সাথে,
এমনি গাঙে ছিল জোয়ার,
নদীর দু'ধার এমনি আঁধার,
তেমনি তরী ছুটবে–

বুঝবে সেদিন বুঝবে।"

(রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, ২০১২: ৮৭)

নজরুলের অনুভব প্রচণ্ড রকমের মনোজাগতিক অনুভব কিন্তু কোনো একপেশে অনুভব নয়। তিনি অনুভব করেন এবং বিশ্বাস করেন যে তাঁকে ব্যথা দিয়েছে তার মনের / জীবনের অবস্থাও সবসময় একরকম থাকবে না, থাকেও না। তাঁকে আজ যে এমন অবস্থার মধ্যে নিপতিত করেছে এমন অবস্থার মুখোমুখি একদিন সেও হবে আর সেদিন তাঁর যাতনা সে বুঝতে পারবে। ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে অকপট-প্রতিবাদী লেখার জন্য তাঁকে বেশ কয়েকবার কারাবরণ করতে হয়েছিল। এ কবিতা কি তেমনি কোনো কারাবরণের সময়ের প্রিয়াবিচ্ছেদের কবিতা? 'তোমার সখার আসবে যেদিন এমনি কারা-বন্ধ,/আমার মতন কেঁদে কেঁদে হয়তো হবে অন্ধ–/ সখার কারা-বন্ধ।' — এ পঙক্তিগুলো কি তেমনই ইঙ্গিত বহন করে না? বা নার্গিসের সাথে বিয়ের শর্ত হিসেবে ঘরজামাই থাকার কথার যে জনশ্রুতি আছে এখানে কি সেই আবদ্ধতাকেই 'কারা-বন্ধ' হিসেবে বলছেন তিনি? যাইহোক, কবি প্রিয়ার চর্মচক্ষুর ক্ষুদ্র সীমানা থেকে সরে এসে বিরাজ করেন তার পুরো জগৎময়। দোলন-চাঁপা ফোঁটা চৈতি-রাতের চাঁদনীতে আকাশের তারায় তারায় তাঁর কাঁদন বাজে। তাই তাঁকে হারিয়েছে যে প্রিয়া তাকে নীল নভো-গায়ের তারায় তারায় কবিকে খুঁজতে হবে। তাঁর বিদ্রোহের বাণী যেমন মহাবিশ্বের মহাকাশ ছেড়ে ভূলোক-দ্যুলোক-গোলক ভেদ করে ওঠে, তাঁর প্রেম-বেদনও তেমনি স্বর্গ-মর্ত-পাতাল, আকাশ-বাতাস ব্যেপে যায়। নজরুলের অধিকাংশ বিরহের কবিতাই শেষে একটা প্রবল আত্মবিশ্বাসী ইতিবাচকতায় সমাপ্ত। তিনি বিশ্বাস করেন ছেড়ে যাওয়া প্রিয়া একদিন হয়তো তাঁর মূল্য বুঝবে, সেদিন তিনি হয়তো ফিরে আসবেন, প্রিয়সান্নিধ্য ঘটবে আবার। ঝড়-তুফানে সকল বন্ধন যেদিন টুটে যাবে, ভাঙনের গ্রাসে দিশেহারা প্রিয়া বারবার সেই হারা-সাথীকে খুঁজে ফিরবে। সেদিন তিনি উপশম হবেন প্রিয়ার ক্ষতের:

"আমার বুকের যে কাঁটা-ঘা তোমায় ব্যথা হানত,
সেই আঘাতই যাচবে আবার হয়তো হয়ে শ্রান্ত–
আসব তখন পান্থ।
হয়তো তখন আমার কোলে,
সোহাগ-লোভে পড়বে ঢলে,

আপনি সেদিন সেধে-কেঁদে
চাপবে বুকে বাহুয় বেঁধে,
চরণ চুমে পূজবে–
বুঝবে সেদিন বুঝবে!"

(রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, ২০১২: ৮৮)

১৪.

একনিষ্ঠ প্রবল ভালোবাসা মানুষকে আত্মবিশ্বাসী করে, ভালোবাসার প্রতি তীব্র অধিকারবোধ তৈরি করে। হৃদয়ের প্রতি হৃদয়ের এ অধিকার শুধু হৃদয়ই জানে। বাহ্যত যত বৈরি ঝাপটাই বয়ে যাক না কেন, ভুল বোঝাবুঝি বা জাগতিক সংকটে যত দূরেই যাক না কেন সরে দুজন, এমন ভালোবাসার অধিকার যেখানে যার আছে সে জানে এক নিমেষেই সকল দেয়াল টুঁটে যাবে। কিন্তু, এখানেও কবির পুঁজি তাঁর চোখের জল, তাঁর বেদনায় স্থির হয়ে থাকবে না প্রিয়া। প্রেমাষ্পদকে এখানে তিনি 'নাথ' বলে সম্বোধন করেছেন। জীবন-নাথ বা জীবন-স্বামি হিসেবে যেজন মনের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত তার কাছে তো এমন বিশ্বাস থাকেই যে আমি যখন বেদনা-বারিতে সিক্ত হব তখন তার অভিমানের বরফ গলে যাবে, দূরত্বের বাঁধ ভেঙে যাবে, শপথের পাহাড় ভেঙে যাবে।

তিনি বিশ্বাস করেন, আশা রাখেন যে, যে প্রিয়ার সোহাগে সোহাগিনী তিনি, যে প্রিয়ার পাতাল গভীর মাতাল চুমের স্মৃতিতে ঘুম আসে না তাঁর, সেই যৌবন-সঙ্গী প্রিয়া আসবে তাঁর কাছে। স্পর্শস্মৃতি ভুলে যাওয়া মানুষের জন্য কঠিন। আর সেই স্পর্শের মধ্যে যদি দেহ-মন তার সবটুকু নিয়ে জড়িত থাকে তবে তা প্রায় অসম্ভব। কবি নিজের ক্ষেত্রেও তো সেটা বুঝেছেন তাই প্রিয়ার ক্ষেত্রেও সহজেই সেটা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। মানুষের কিছু অনুভূতি শ্বাশত, এ অনুভূতিও তেমনি। এ কবিতার 'বিজলি-শিখার প্রদীপ', 'ভাদর রাতের বাদল মেঘ', 'বজ্র-বেগ' এসব যেন উদ্দাম যৌবনেরই প্রতীকী রূপ। একদা সুখস্মৃতিতে মিশে থাকা প্রিয়া আজ দূরে, অন্য প্রিয়র সাথে দিনাতিপাত করছে তাই কবির বক্তব্য —আজ প্রিয়ার সুখদিনে সে দূরে থাক, কিন্তু যেদিন 'দীপ নিবাবে ঝনঝাবাত' সেদিন যেন আসে প্রিয়া সেই আশাতেই তাঁর রাত জাগা। নজরুল জানতেন জীবনে সুখ বা দুঃখ কোনটাই একই ভাবে সমান্তরালে প্রবহমান থাকে না। ঝড় আসবে একজন

প্রদীপ নিভে যাবে, সেই প্রদীপ-নেভা অন্ধকারে প্রিয়া যখন খুঁজবে তাঁকে তিনি তখন আসবেন তাকে সান্নিধ্য দিতে। আর তখন প্রিয়া আসলে পুনর্জীবন পাবে উত্তাল দেহজ কামনা, প্রেম-বাসনা চরিতার্থ হবে, প্রিয়-সঙ্গমে আসবে মরণজয়ী অনুভব:

"আসবে আবার পদ্মানদী, দুলবে তরী ঢেউ-দোলায়,
তেমনি করে দুলব আমি তোমার বুকের পরকোলায়।
দুলবে তরী ঢেউ-দোলায়।
পাগলী নদী উঠবে খেপে,
তোমায় তখন ধরব চেপে
বক্ষ ব্যেপে,
মরণ-ভয়কে ভয় কি তখন জড়িয়ে কণ্ঠে থাকবে হাত!
সেই আশাতে জাগব রাত।"

(রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, ২০১২: ৮৯)

১৫.

স্থান মানুষের জীবনে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ একটা বিষয়। প্রিয় মানুষের প্রতি মানুষের যেমন কাতরতা থাকে, প্রিয় মানুষের স্মৃতি-মেশা স্থানের প্রতিও মানুষের তেমনই কাতরতা থাকে। তাই কোনো মানুষকে ভুলে যেতে হলে সেই মানুষের স্মৃতি-জড়ানো জায়গা ত্যাগের কথা প্রচলিত আছে। প্রথম দেখা হওয়া গৃহ-আঙিনা ছেড়ে নতুন ঘরে নতুন আয়োজনে যে-প্রিয়া যায়, পুরাতন গৃহ তার শূন্যতায় কাঁদে। সেই পুরাতন গৃহে প্রিয়া তাঁকে ভুলে নতুন কাওকে নিয়ে থাকতে চাইলে গৃহ কাঁদত। গৃহের কোণে কোণে জমানো স্মৃতিরা বাঁধ সাধতো। কিন্তু, নতুন গৃহে সেই গ্লানি নেই, সেই 'পিছু ডাক' নেই। স্মৃতিকে সমাধি দিয়ে নতুন বাসরে পদার্পণ করেছে প্রিয়া। এতোদিনের বাঁধা পুরাতন গৃহ ছেড়ে নতুন গৃহে নতুন জীবনের অবগাহন, হারিয়ে গেছে পুরাতন সব সুর:

"আমার এতদিনের দূর ছিল না সত্যিকারের দূর,
ওগো আমার সুদূর করত নিকট ঐ পুরাতন পুর।
এখন তোমার নতুন বাঁধন,
নতুন হাসি, নতুন কাঁদন,
নতুন সাধন, গানের মাতন

নতুন আবাহনে।
আমারই সুর হারিয়ে গেল সুদূর পুরাতনে।।"

(রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, ২০১২: ৯১)

১৬.

যখন মনে প্রেম এসেছে, কাঁচা মনে রঙ ধরেছে তখন আর লজ্জা না রেখে সগর্বে ঘোষণা দিয়ে প্রেমকে বরণ করাই তো সমীচীন। 'নিখিল হৃদয়-রাজ' যে জন সে যখন বুকে টেনে নেয় তখন মিছে লজ্জা তো আর মানায় না। পুরো জগৎ যাঁকে চায় কেঁদে কেঁদে সেই অমূল্য জন যখন আপনি এসে বক্ষে তুলে নেন তখন সে প্রেমে উদ্বেল হওয়াই স্বাভাবিক। এমন পরম আকাঙ্ক্ষার জনকে পেয়েই 'মুখরা' হয়েছেন কবি। বৈষ্ণব ভাবধারার কবিতার মতো কবি এখানে নারীভাবে উপস্থিত। দাস্যভাবের সঞ্চার এ কবিতায় লক্ষ্যণীয়। পরম প্রাপণীয়ের কাছে কবি নিজেকে সমর্পণ করে দিচ্ছেন। লাজ, সাজ, কাজ সব ভুলে তিনি তাঁর নিবেদনের কথা মুখরা হয়ে মায়ের কাছে স্বীকার করে নিয়েছেন:

"মা গো বক্ষে আমার বিশ্বলোকের চির-চাওয়া ধন,
আমার কিসের সজ্জা, কিসের লজ্জা, কিসের পরানপণ?

বিশ্ব-ভুবন যার পদছায়
সেই এসে হায় মোর পদ চায়,
আমার সুখ-আবেগে বুক ফেটে যায় মা,
আজ লাজ ভুলেছি, সাজ ভুলেছি, ভুলেছি সব কাজ।"

(রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, ২০১২: ৯২)

১৭.

সমাজ-সংসার ছেড়ে আশালতা সেনগুপ্ত কবির সঙ্গী হয়েছিলেন সেই কথাই হয়তো 'সাধের ভিখারিনী' কবিতায় তিনি বলছেন। সকল ছেড়ে কবিকে ভালোবেসে এক সংকটের জীবন তিনি বেছে নিয়েছিলেন। কবির ভালোবাসার রাণী সে, কবিকে সাথী করে জীবনের অনেক কিছুই তো তাকে ত্যাগ করতে হয়েছিল, হয়েছিলেন সাধের ভিখারিনী:

"দেবি! তুমি সতী অন্নপূর্ণা, নিখিল তোমার ঋণী,

শুধু ভিখারিকে ভালোবেসে সাজলে ভিখারিনী।
সব ত্যাজি মোর হলে সাথী,
আমার আশায় জাগচ রাতি,
তোমার পূজা বাজে আমার
হিয়ার কানায় কানায়!
তুমি সাধ করে মোর ভিখারিনী, সেই কথা সে জানায়।।"

(রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, ২০১২: ৯৩)

১৮.

'নারী' কবিতায় নজরুলই লিখেছেন 'রাজা করিতেছে রাজ্য-শাসন, রাজারে শাসিছে রাণী,/ রাণীর দরদে ধুইয়া গিয়াছে রাজ্যের যত গ্লানি।' কালে কালে রাজাদের সফলতার পেছনে রাণীদের ভূমিকা ছিলো অপরিসীম। স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি যাই আসুক রাণীদের অবদান তো মিছে হয়ে যায় না। নজরুল ভালোবাসার শক্তিকে স্বীকার করেছেন, প্রেমের প্রেরণাকে স্বীকার করেছেন। এ কবিতায় তিনি তাঁর কবিত্বের প্রেরণাকে খুঁজে ফিরেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতো কোনো কল্পলোকের কাব্যলক্ষ্মী নয়, নজরুলের প্রেরণা তাঁর প্রেয়সী, তাঁর মনের রাণী। তার ভালোবাসাতেই সে কবি। তাঁর রূপ যেন তাঁর রাণীর ভালোবাসার ছবি। প্রিয়জনের কাছে যে আদরে থাকে, কদরে থাকে সে তার সবটুকু সম্ভাবনা নিয়েই বিকশিত হতে পারে। পরিবার-পরিজন, প্রিয়জনের আদরে আবিষ্ট থাকে যে সে অনুভব করে পুরো বিশ্বের সবকিছুই তাকে ভালোবাসে। মূলত মানুষের নিজের অভ্যন্তরে যখন মনোরম অবস্থা বিরাজ করে তখন সে সবকিছুর মাঝেই সেই মনোরম বিষয়টাই দেখতে পায়:

"আপন জেনে হাত বাড়ালো
আকাশ বাতাস প্রভাত-আলো,
বিদায়-বেলার সন্ধ্যা-তারা
পুবের অরুণ রবি, —-
তুমি ভালোবাসো বলে ভালোবাসে সবি।।"

(রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, ২০১২: ৯৩)

'নারী প্রেমের প্রেরণাই তাঁকে প্রবুদ্ধ করেছে জনজাগরণমূলক কবিতা ও গান রচনায়।' প্রেমের ব্যর্থতা মানুষের অন্তরে জাগায় অভিমান এবং সেই অভিমান জাগায় বিদ্রোহ, এই সত্য সর্বজনস্বীকার্য। উৎসাহে, অনুপ্রেরণায়, সহযোগিতায়, সহমর্মিতায়ও মানুষের সুপ্ত সম্ভাবনা বিকশিত হয়। 'আমার আমি লুকিয়েছিল তোমার ভালোবাসায়,/ আমার আশা বাইরে এল তোমার হঠাৎ আসায়।' সৃষ্টিশীল মানুষের পেছনে সবসময়ই কেউ না কেউ অনুপ্রেরণা হয়ে কাজ করে। তার ভেতরকার সবটুকু সম্ভাবনা বের করে নিয়ে আসতে সাহায্য করে। পূজোর আয়োজনে হবি(ঘৃত) হয়ে থাকে সে; আর জয়মাল্যটা তারই প্রাপ্য হয়।

১৯.

'আশা' কবিতায় কবি কার কাছে আশ্রয় চাইছেন? কে তাঁর 'জীবন-স্বামি'? তিনি কি মহা-আশ্রয়দাতা পরম স্রষ্টার কাছে আশ্রয় চাইছেন? জগতের সকল লীলা সাঙ্গ করে যখন ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পরমের কাছে ফিরবেন তখনকারই নিশ্চয়তা চাইছেন? বৈষ্ণব প্রেমলীলায় জীবাত্মা রাধার পরমাত্মা কৃষ্ণের প্রতি যে প্রেম, সম্মিলনের যে প্রবল আকাঙ্খা, এ কবিতার রূপায়ন কি তেমনই? লুটিয়ে পড়া দেহ নিয়ে অন্তকালে মানুষ তো স্রষ্টার কাছেই আশ্রয় চায়। সৃষ্টি তো স্রষ্টারই অংশ। স্রষ্টা তাঁর আপন মহিমার নৈপুণ্যে জগৎকে আকার দিয়েছেন। জীবন সায়াহ্নে তাঁর কাছেই তো আমাদের ফিরে যাওয়া। আগে যতই দুঃখ-বেদনা দেন না কেন তিনি অন্তকালে তো আর ফিরিয়ে দেন না, তাঁর কাছেই নিয়ে নেন। কবি জিজ্ঞাসার পর জিজ্ঞাসা করে নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছেন সেই প্রেমময় জীবন-স্বামি সেদিন কী করবেন সেই সম্পর্কে:

"তুমি এতদিন যা দুখ দিয়েছ হেনে অবহেলা,
তা ভুলবে না কি যুগের পরে ঘরে-ফেরার বেলা?
বলো বলো জীবন-স্বামি,
সেদিনও কি ফিরব আমি?
অন্তকালেও ঠাঁই পাব না

ঐ চরণের তলে?"

(রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, ২০১২: ৯৪)

২০.

অন্তিম আশ্রয় পাবার 'আশা' করেই কবি ক্ষান্ত হচ্ছেন না, তিনি 'শেষ প্রার্থনা' হিসেবে পরম প্রাপণীয়র সাথের ভালোবাসামাখা আদর-অনাদর হানা সম্পর্কের স্থিতি চাইছেন। গবেষকের ভাষায়:

> "'শেষ প্রার্থনা' কবিতায় মানবপ্রেমের একটি চিরন্তন আকূতি ও আকাঙক্ষা প্রকাশিত হয়েছে। সমস্ত দ্বন্দ্ববিরোধ ও দুঃখবেদনা যেন এই জন্মেই শেষ হয় এবং পরবর্তী জীবনে যেন আনন্দময় প্রেমের নিত্য আবির্ভাব ঘটে — প্রেমিকার বিদায়-লগ্নে এই শেষ প্রার্থনাই কবিতাটির অন্তরে ধ্বনিত। এই পৃথিবীতে বর্তমান জীবনের খণ্ড মিলন যেন নূতন জীবনের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে ও এবারের ব্যর্থতা যেন সফল প্রেমের সঙ্গে মিশ্রিত হয়। এ জীবনের স্বার্থপরতাজনিত দুঃখ যেন অশ্রুজলে মুক্তিস্নান করে, পরিশুদ্ধ হয়ে পরবর্তী জীবনে পূর্ণ ও আনন্দমুখর প্রেমের স্বর্ণসিংহাসন রচনা করে।" (সুশীলকুমার, ১৯৯৭: ১৩৫)

ঘাত-প্রতিঘাতের পর মানুষ বিধ্বস্ত-বিপর্যস্ত হয়ে একটু স্থিতিশীলতার দেখা পেলে খুব করে চায় তা যেন অটুট থাকে। আশালতার কাছে কবি যে স্বস্তির পরশ পেয়েছিলেন বিধ্বস্তদশা শেষে তিনি হয়তো সেটারই দীর্ঘস্থায়িত্ব চাইছেন জনমের পর জনম। সম্পর্কে ভাঙনের শিকার হওয়া মানুষ সর্বান্তকরণে চায় পুনরায় যেন আর বিচ্ছেদ-ভাঙন না আসে। এ যেন তেমনি চাওয়া:

"এমনি আদর, এমনি হেলা
মান-অভিমান এমনি খেলা,
এমনি ব্যথার বিদায়-বেলা
এমনি চুমু হেসে,
যেন খণ্ডমিলন পূর্ণ করে নতুন জীবন এসে!"

(রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, ২০১২: ৯৫)

'যেন আর না কাঁদায় দ্বন্দ্ব-বিরোধ, হে মোর জীবন-স্বামি!' — এ যেন জীবনযুদ্ধে ক্লান্ত-অবসন্ন প্রত্যেক যোদ্ধার গভীর আকুতি। নজরুলও নানান আঘাতে ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে গিয়েছিলেন হয়তো। 'আপন সুখকে বড় করে' যে দুঃখ জীবনভর পেয়েছেন তা আর পেতে চাইছেন না তিনি। কারও কাছে পরাজয় বরণ করে ছোট হতে চাইছেন। প্রকৃতপক্ষে মানুষ নিজের অহংকে সঠিক ব্যবস্থাপনা করতে না পারলে ধীরে ধীরে মানববর্জিত হয়ে একলা হয়ে পড়ে সে। আবার যে মহামানবের বেদনা কেউ বোঝে না সেও একলা হয়ে পড়ে। নিজের বোধের কাছে একলা হয়ে পরেছিলেন জীবনানন্দ দাশ। মানুষের সাথে মিশে চলবার আকুতি মানুষের সব সময়ই ছিল, আঁকড়ে থাকার প্রার্থনা সরবে-নীরবে সবাই করে হয়তো:

"যেন পূর্ণ করে তোমায় জিনে সব-হারানোর দেশে,
মোর মরণ-জয়ের বরণ-মালা পরাই তোমার কেশে।
আজ চোখের জলের প্রার্থনা মোর শেষ-বিদায়ের শেষে।।"

(রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, ২০১২: ৯৫)

২১.

কাব্যের শেষে শিরোনামহীন ৪ লাইনের কবিতায় কবি পুরো কাব্যে নানান ভাবে প্রেম ও প্রেমানুভব প্রকাশের কৈফিয়ত দিলেন যেন এবং তাঁর প্রেমানুভূতির যে মূল সূত্র তা ধরিয়ে দিলেন। কেন মানুষ প্রেম ছাড়া, প্রিয় ছাড়া একাকী থাকতে পারে না বা থাকে না তার সুস্পষ্ট নির্দেশ তিনি করেছেন। প্রাকৃতিক অন্যান্য আয়োজনের কয়েকটা উপমা সমান্তরালে এনে তিনি দেখিয়েছেন মানুষের প্রাণের আবেগের স্বরূপ। মেঘে এতো কী প্রয়োজন একমাত্র চাতকই জানে। লালন সাঁইজিও তাঁর গানে বলে গিয়েছেন 'চাতক বাঁচে কেমনে মেঘের বরিষণ বিনে'। যার সাথে যার প্রাণের সংযোগ করে বিধাতা তৈরি করেছেন তার মূল্য তো সে-ই অনুধাবন করতে পারে, তাকে পাবার ব্যাকুলতা তো তার মাঝেই কাজ করবে, অন্য কেউ তো তা উপলব্ধি করতে পারবে না। কেতকী ঘন ঘন মেঘের বরিষণ এজন্যই চায় যে মেঘের বর্ষণ ছাড়া তার প্রস্ফুটন সম্ভব হয় না। অন্যদিকে, জ্যোৎস্না পান করে তৃপ্ত যে চকোর পাখি বা জ্যোৎস্নাস্পর্শে প্রস্ফুটিত হয় যে কুমুদী চাঁদের জন্য প্রাণ আনচান তাদেরই করবে। তেমনিভাবে প্রাণমাত্রই জানে কেন প্রিয়তমার জন্য তাঁর

ব্যাকুলতা। প্রাণের সংযোগ যার সাথে, প্রাণের পোষক যে সে ছাড়া তো প্রাণ বাঁচে না। কবি যেন ৪ লাইনের শিরোনামহীন কবিতায় তাঁর প্রেমবিষয়ক সকল কৈফিয়ত দিয়ে গেলেন:

"সে যে চাতকই জানে তার মেঘ এত কি,
যাচে ঘন ঘন বরিষণ কেন কেতকি!
চাঁদে চকোরই চেনে আর চেনে কুমুদী,
জানে প্রাণ কেন প্রিয়ে প্রিয়-তম চুমু দি!"

(রচনাবলি, প্রথম খণ্ড, ২০১২: ৯৫)

প্রেম বিষয়ক প্রথম কাব্য হিসেবে 'দোলন-চাঁপা' তাঁর প্রেম-ধারণার পরিচয়ের সাক্ষ্য বহন করে। সৎ শিল্পীর ব্যক্তিজীবন আর শিল্পীজীবনের মধ্যে খুব বেশি তফাৎ থাকে না। নজরুলের প্রেমের কবিতাগুলো যেন তাঁর প্রেম-ঘটনারই ধারা বিবরণী। এই প্রেমে কোনো স্থিতি নেই, সুখ-মিলন নেই, ক্বচিৎ থাকলেও তা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি। ভূতপূর্ব বিরহাঘাত এবং নতুন জায়গায় মনের আশ্রয় খুঁজে নেবার বিষয় কাব্যের কবিতাগুলোতে স্পষ্ট। সবকিছু ছাপিয়ে তাঁর অসীম প্রেমতৃষ্ণা নিয়ে অতৃপ্তির আহাজারি মূখ্য হয়ে উঠেছে। আসর-মাতানো নজরুল বাস্তব জীবন থেকে চোখের জলকে আড়াল করতে পারলেও কবিতায় এসে সে অশ্রু-সাগর-বারি উথলে পড়েছে। সর্বোপরি, তাঁর নানান বাঁক নেয়া দীর্ঘ প্রণয়-ভ্রমণের শব্দচিত্র 'পূজারিণী' কবিতা। এ কবিতা নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের প্রেম-বিষয়ক সকল কবিতার মধ্যে স্বমহিমায় নিজের আসন অলংকৃত করে রাখবে চিরকাল।

টীকা

১.(https://www.poetryfoundation.org/poems/42891/stopping-by-woods-on-snow-evening)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছায়ানট

'ছায়ানট' কাব্যটি বর্মণ পাবলিশিং হাউস থেকে ১৯২৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশ সালের দিক থেকে এটি 'দোলন-চাঁপা'র পরের কাব্য হলেও এ কাব্যের কিছু কবিতা 'দোলন-চাঁপা'র কিছু কবিতার আগে লেখা হয়েছে। কাছাকাছি সময়ে রচিত হওয়ায় 'দোলন-চাঁপা' এবং 'ছায়ানটে'র কবিতার আবেগ ও সুর প্রায় একই। 'ছায়ানট' মূলত উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত পদ্ধতিতে 'কল্যাণ' ঠাটের অন্তর্ভুক্ত একটি রাগের নাম, এর প্রকৃতি শান্ত এবং দিনের প্রথম প্রহর অর্থাৎ ভোররাতে এটি গাওয়া হয়। ছায়ানট রাগের মতোই নজরুলের প্রণয় জীবনের প্রথম প্রহরের আলো-ছায়াই যেন এ কাব্যের কবিতার বিষয়। এ কাব্যের কবিতাগুলোর সুরও ওই রাগের মতোই করুণ ও মধুর। সমাজের জরা দূরীকরণ এবং নতুন সমাজ গঠনে তাঁর বাঁশিতে যেমন বিষের সুর তিনি সংযোজন করেছিলেন, তেমনি প্রেমের বাঁশিতে সংযোজন করেছেন বিরহের সুর। নজরুলের কৈশোর প্রেমের স্মৃতি, দেওঘরের ভাললাগার ক্ষণিক মুহূর্ত, দৌলতপুরে নার্গিসের সঙ্গে মিলন ও বিচ্ছেদ এবং সর্বশেষে কুমিল্লায় প্রমীলার সঙ্গে পূর্বরাগের সুর মিলিয়ে 'ছায়ানটে'র কবিতাগুলির অভিজ্ঞতা ও আবেগের মধুরতা এবং তিক্ততা রূপায়িত হয়েছে। 'ছায়ানট' রাগিনীতে নজরুল প্রেম-বিরহ, স্নেহ-মমতার সুর সংযোজন করেছেন। বিষয়ব্যঞ্জনা এবং আঙ্গিকবৈচিত্র্যে 'দোলন-চাঁপা'র চেয়ে 'ছায়ানট' অধিকতর পরিণত কাব্য নিঃসন্দেহে। কাব্যটির কবিতাগুলো সম্পর্কে নজরুল জীবনীকার অরুণকুমার বলেছেন:

> "রাজনৈতিক সহকর্মীদের নামে উৎসর্গ করলেও 'ছায়ানট' কাব্যের কবিতাগুলি প্রায় সবই রাজনীতি-স্পর্শতিরিক্ত, কোমল হৃদয়দুর্বলতার কবিতা। নজরুলের কবিতার যে সাধারণ ধর্মটি তাঁকে জনপ্রিয় করেছে, সেই জ্বালাময় ঘোষণা, তীব্র রোষাত্মক মন্তব্য, স্বঘোষিত বিদ্রোহের তেজস্বীতা, অত্যাচারীর প্রতি অভিশাপবর্ষণ এই কবিতাগুচ্ছে নেই। এখানে কবিকণ্ঠ কখনো স্বগত, কখনো স্ফুটবাক, কখনো বিরহার্ত, কখনো প্রণয়ার্দ্র। অধিকাংশ কবিতাই কুমিল্লায় রচিত। প্রথম বিবাহের তিক্ততা মুছে ফেলে কুমিল্লার কান্দিরপাড়ে তিনি

যে নতুন স্নেহ-প্রীতি-সহানুভূতি-দরদের ছায়াবীথিকাটিতে সন্তুষ্ট আশ্রয় গড়ে তুলছিলেন, এই কবিতাবলিতে তারই মেঘচ্ছায়া সঞ্চারিত হয়েছে। নজরুলের বিদ্রোহ-চেতনার আবেগচূড়ায় অবশ্য গোড়া থেকেই একটি কম্পমান জলবিন্দুর লাবণ্য পাঠকের গোচরে এসেছিল। সে বিদ্রোহ- স্ফুরণ বজ্রনিনাদ হুঙ্কারে সমাপ্ত হয় না, তার বিপরীত প্রত্যাশা ধ্বনিত হয় ষোড়শীর হৃদিসরসিজ প্রেমে, কুমারীর প্রথম পরশে, গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনিতে, যৌবনভিতু পল্লিবালার চঞ্চল অঞ্চলে। তাই শেষ পর্যন্ত প্রেমের কাছেই বিদ্রোহী নতজানু হন; আপৎকালের অবসানে যোদ্ধা যেন তাঁর রণসাজ ত্যাগ করে সুন্দর প্রেমিকের সাজ পরেন।" (অরুণকুমার, ২০১৯: ২২৩-২২৪)

১.

বাংলা সাহিত্যে নজরুল যেমন করে নারী সত্তার আরাধনা করেছেন তেমনটি বিরল। 'সাম্যবাদী' কাব্যের 'নারী' কবিতায় তিনি জগত-সংসারে পুরুষের পাশাপাশি নারীর যে আপাত অদৃশ্য অবদান তাকে শব্দবন্ধে এনেছেন। পুরুষের সফলতার পেছনে নারীর ভূমিকা কতখানি তা স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন। জগতের সকল অর্জনে নারীর অর্ধেক কৃতিত্ব তিনি স্বীকার করেছেন। নজরুল সাম্যবাদী রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন, আর সাম্যবাদী দর্শন সকল মানুষের সমান অধিকার ও মর্যাদা স্বীকার করে। মানুষ হিসেবে নারীর মূল্যায়নের পাশাপাশি পুরুষের কামনাসঙ্গী হিসেবে নারীর যে নীলকণ্ঠী ভূমিকা তার নান্দনিক প্রকাশ তিনি করেছেন—'পুরুষ এনেছে দিবসের জ্বালা তপ্ত রৌদ্রদাহ,/ কামিনী এনেছে যামিনী-শান্তি, সমীরণ, বারিবাহ।// দিবসে দিয়াছে শক্তি-সাহস, নিশীথে হয়েছে বধূ,/ পুরুষ এসেছে মরুতৃষা লয়ে, নারী যোগায়েছে মধু।//' নজরুলের এই নারীদর্শন সম্পর্কে গবেষক বেগম আকতার কামাল বলেন:

"পুরাণজগতে ধ্বনিত হয়েছিল ভস্মীভূত প্রেমদেবতা মদনের জন্য রতির করুণ বিলাপ, সেই থেকে মদনহীন রতি নিজের শরীরীবাসনা প্রকাশের ক্ষেত্রে হয়ে আছে মূক, লজ্জিত, পাপীয়সী। রোম্যান্টিকদের কবিপ্রতিভা তাকে করে তোলে আরও বিমূর্ত, eternal she-এর আইডিয়ায় নারী হয়ে ওঠে ব্যক্তিবাচক পুরুষবাদী ধ্যানময়তার পুতুল। আধুনিক নারীবাদ নির্দেশ করে তার পুরুষের মতো হয়ে ওঠার যে সূত্রবিধি তা তো আরেকভাবে পুরুষতন্ত্রই। নজরুলে কি এই গোপন সূত্রবিধিটি কোনো না কোনো ভাবে লুকিয়ে আছে? না কি তাঁর

নারীভাবনা কৃষিসংস্কৃতির নৃতত্ত্বের আদিকাঠামোতেই একভাবে স্থিরীকৃত? আমরা দেখি নজরুল মূর্ত নারীর প্রতিষ্ঠায় উচ্চস্বরে মন্ত্রবদ্ধ করেন এলোকেশী নারীর সাহসিক রূপকে, তাকে দেন অর্ধেক সৃষ্টিভূমিকা। মূল অর্থে তাঁর লক্ষ্য হল বিশ্বের কামশক্তি তথা সৃষ্টির গর্ভরূপী রতির বন্দনা করা। আবার শক্তিরূপিণী পরমাশ্রয়দাত্রী শ্যামার পদতলে নিজেকে সমর্পণ করা। নারীর ইত্যাকার চিরায়ত ভূমিকা ও স্বরূপ নির্দেশ করে নজরুল ফিরে পেতে চান সব মানুষের মানবিক মর্যাদা এবং নিজের জন্য হারানো মায়ের কোল। মিথের পরিকাঠামোই তাঁর এই বহুসন্ধিৎসাযুক্ত নারীপ্রতিমাকে করে তোলে অনেক বেশি সপ্রাণ ও রূপসুন্দর– এটাই লক্ষ্যযোগ্য। কোনো সূত্রবিধির বদ্ধতন্ত্রে তিনি ভাবনাটিকে ঘিরে ফেলেননি, বরং রেখেছেন উন্মুক্ত ও উৎসমুখে প্রত্যাবর্তিত একই সঙ্গে — এ যেন নিরাপদ মাতৃগর্ভে প্রশান্তি খোঁজার অনিরুদ্ধ এষণা।" (আকতার কামাল, ২০১৩: ১০০)

তাঁর প্রেমবিষয়ক কবিতাগুলোর কতকে নিজেকে নারীর পদতলে সমর্পণ করা এবং কতকে মাতৃগর্ভে প্রশান্তি খোঁজার বিষয়টিও দেখব। নিজেকে সমর্পণ করে যখন তিনি যথাযথ মর্যাদা পাননি তখন ক্ষুব্ধ-ক্ষিপ্ত-ক্লান্ত হয়ে মায়ের কাছে আশ্রয় চেয়েছেন। 'ছায়ানট' কাব্যের প্রথম কবিতাই নারী আরাধনার কবিতা। ভারতীয় পুরাণের মূল বীজ এই নারীত্বের আরাধনার মধ্যেই প্রোথিত। 'নারী' কবিতায় নারী যেমন করে তার স্নেহসুধা, ভালোবাসা, কোমলতা, নমনীয়তা দিয়ে পুরুষের 'দিবসের জ্বালা তপ্ত রৌদ্রদাহ' শুষে নেয় তেমনি 'বিজয়িনী' কবিতাতেও পুরুষের 'সমরজয়ী অমর তরবারি' যুদ্ধ করে করে ক্লান্ত হয়ে জয়মুকুট এনে নারীর চরণতলে লুটায়। নজরুলের পৌরুষ কখনো নারীকে হীন করে দেখে না, বরং নারীই তার সকল শক্তি, সাহস, প্রেরণার মূল উৎস। তবে আঘাত যেখানে পেয়েছেন নারীদের কাছ থেকে সেখানে প্রতিঘাত করতেও তিনি কার্পণ্য করেননি। মানুষকে উপরিভাগে যত প্রবল, শক্তিমান, দোর্দণ্ডই দেখা যাক না কেন ভেতরে ভেতরে সবাই নরম, কোমল; উষ্ণ ভালোবাসার কাঙাল। নজরুলের এই 'বিজয়িনী' হয়তো প্রমীলা, রচনার সময়কাল (অগ্রহায়ণ, ১৩২৮) তাই বলে। বিদ্রোহীর বিজয়-কেতন তাঁর রানী প্রমীলার পদতলে এসে লুটিয়ে পড়েছিল, দোলনা দেবীর চোখের জলে তাঁর বিশ্বজয়ী বিপুল দেউল টলমল করে উঠেছিল। শক্তিমানেরা একমাত্র স্নেহ-ভালোবাসার কাছেই পরাজয় বরণ করে, ভালোবাসাকে জয়ী করে তাঁরা হয় পরাজিত:

"আজ বিদ্রোহীর এই রক্ত-রথের চূড়ে

বিজয়িনী! নীলাম্বরীর আঁচল তোমার উড়ে,
যত তৃণ আমার আজ তোমার মালায় পুরে,
আমি বিজয়ী আজ নয়ন-জলে ভেসে।।"

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৫)

এ কবিতা প্রসঙ্গে নজরুল-বিশ্লেষক বলেছেন:

> "'বিজয়িনী' কবিতাটির অন্তরে ভারতীয় ঐতিহ্যে লালিতপালিত নজরুলের প্রেমসাধনার একটি বিশেষ রূপ চিত্রিত। কবির বিজয়িনী রানী তাঁর আকাঙ্ক্ষিত মানবিক প্রেমের জীবন্ত প্রতিমা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। বিদ্রোহী কবি যুদ্ধজয়ী তরবারির ভারবহনে অসমর্থ হয়ে, তাঁর প্রেমপ্রতিমার ধরা দিয়ে শান্তিলাভ করতে ইচ্ছুক। যাঁরা নজরুলকে 'বিদ্রোহী কবি' আখ্যা দিয়ে তাঁর সংগ্রামশীল রূপকেই তাঁর চরম বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক বলতে চান, তাদের এই 'বিজয়িনী' কবিতাটি অন্তরঙ্গভাবে পাঠ করতে অনুরোধ করি। আমার মনে হয়, নজরুল জীবনেও যেমন, কাব্যেও তেমনি প্রেমই মুখ্য বস্তু। এই প্রেমলাভের জন্যই তাঁর প্রচণ্ড বিদ্রোহ। আবার এই প্রেমের বিচিত্র রূপের মধ্যে তার অশ্রুকোমল রূপের প্রতিই কবির আকর্ষণ সবচেয়ে বেশি।" (সুশীলকুমার, ১৯৯৭: ১৫০)

২.

মানবমনে কোমলতা-কঠোরতার দ্বন্দ্ব সর্বক্ষণই চলে। মনে হিংসা, লোভ, ঘৃণা, কঠোরতার অস্তিত্ব যেমন আছে; আছে দয়া, মায়া, ক্ষমা, কোমলতা, ভালোবাসার অস্তিত্বও। চর্চার মাধ্যমে, অবদমনের মাধ্যমে যে যত সুন্দর করে এসব প্রবৃত্তির ব্যবস্থাপনা করতে পারে তার ভেতরটার অবয়ব তেমনই হয়। কিন্তু, সচেতন-সংবেদনশীল মানুষ তার মধ্যে বা অন্যদের মধ্যেও কর্কশতার আধিপত্য দেখলে ব্যথিত হন, মর্মাহত হন। এটা নিরসনে তিনি ভাবিত হন, কাজ করেন। 'কমল-কাঁটা' কবিতায় 'হিংসা-মদের মত্ত বারণ-রণে' যখন পদ্মবনরূপ মনের সকল কোমল সৌন্দর্যময় ফুল নিষ্পেষিত হয়ে শুধু কাঁটা পড়ে থাকে তখন ব্যথিত কবিমন 'শুধায় ক্ষণে ক্ষণে' — 'ঢেউএর দোলায় মরাল-তরী নাচবে না আনমনে।।' সকল সৌন্দর্যের লীলাভূমি মানুষের মন, সকল কুৎসিত জিনিসের আধারও মানুষের মন। সে ভূমিতে মুক্তমনের অধিকারী তো শুধু রাখবেন না। তিনি চাইবেন, 'কাঁটাও আমার যায় না কেন, কমল গেল যদি।' একটা সময় কাঁটা চলে যায়, সেখানে

আবার পদ্ম দোল খায়। তার জন্য কাওকে না কাওকে সে গরল পান করতে হয়। মানুষই দুঃখে, বেদনে, বিষণ্নতায়, একাকীত্বে মানুষের পাশে থাকে। ভাগাভাগি করে নেয়, সময় দিয়ে যত্ন দিয়ে কাছের মানুষের হৃদয়-বাগানের 'কাঁটা' সরিয়ে ফুলের আবাদে সঙ্গ দেয়। কবির তেমনই জিজ্ঞাসা; তেমন কাওকেই তাঁর খুঁজে ফেরা:

"আসবে কি আর পথিক-বালা?
পরবে আমার মৃণাল-মালা?
আমার জলজ-কাঁটার জ্বালা
জ্বলবে মোরই মনে?
ফুল না পেয়েও কমল-কাঁটা বাঁধবে কে কঙ্কণে?"

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৬)

৩.

'ছায়ানট' কাব্যের অন্যতম বৃহৎ কলেবরের ও উল্লেখযোগ্য এবং নজরুলের প্রেম ও প্রকৃতি বিষয়ক কবিতার মধ্যে শীর্ষস্থানীয় একটি কবিতা 'চৈতী হাওয়া'। গবেষক বলেছেন:

> "বিয়ের পর প্রায় বছর খানেক কবি প্রাক্তন প্রেমিকা অথবা কাল্পনিক প্রণয়ী কাউকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন বলে মনে হয় না। তারপর ১৯২৫ সালে মার্চ-এপ্রিল অর্থাৎ চৈত্র মাসে তিনি একটি অসাধারণ প্রেমের কবিতা রচনা করেন সম্ভবত যাঁর চুলের কাঁটা করাচি পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন, সেই নারীকে নিয়ে।...। মনে হয় কবিতাটি তিনি যেদিন রচনা করেন, সেদিন ছিলো এই গোপন প্রিয়ার জন্মদিন।" (গোলাম মুরশিদ, ২০২১: ২১২)

জন্মদিনের স্মৃতিতে লিখলেও নজরুলের প্রেমের কবিতার মূখ্য সুর 'বিরহ' এ কবিতারও মূল উপজীব্য। ১৫ স্তবকের স্বরবৃত্ত ছন্দের এ কবিতার স্তবকে স্তবকে চৈত্রে হারিয়ে যাওয়া প্রেমিকার জন্মদিনের স্মৃতিতে কাতর হয়েছেন কবি অনেক সময় পরে আরেক চৈত্রের জন্মদিনে। প্রকৃতির আড়ালে অতীতের তপ্ত-প্রণয়, দেহজ সম্পর্কের স্মৃতিতে বিভোর কবি। অতীতের স্মৃতি রোমন্থনে নিবিড় বেদনা ছাড়া আর কিছু তো পাওয়া যায় না, পাননি নজরুলও। সপ্ত পারাবার দূরে অবস্থিত গতপ্রিয়াকে তাই অকূল অন্ধকারে কেবলি হাতড়ে ফেরা। সেই প্রণয়পাতার ভাঁজে ভাঁজের যে গাঁথা তাঁর স্মৃতিতে উথলে উঠেছে তাও

আওড়েছেন তিনি কাব্যছন্দে। স্মরণ-পারের সে প্রিয়া কবির মনের শূন্য দিঘির শীতল কালো জলে নীলোৎপল হয়ে ফুটেছিল। এই নীলোৎপলসম প্রিয়াকে কোনো পূজারী নিয়ে পাষাণ-দেবতার পূজায় ব্যবহার করেছে (অন্যত্র বিয়ে হয়েছে?)। সেই উৎপাটিত নীলোৎপলকে কবি 'অস্ত-খেয়ার হারামাণিক বোঝাই করা না'-এ খুঁজে ফেরেন। যেমন চৈতী হাওয়ায় দেখা হয়েছিল তার সাথে তেমন চৈতী হাওয়া এখন বহমান, তেমনিভাবে ফুল-শোভিত কানন দক্ষিণ হাওয়ায় উচাটন, তেমনিভাবে মহুয়া-মউ, মৌমাছিদের কৃষ্ণা-বউ মধু পান করে দুলছে; শুধু সেদিনের মতো প্রিয়াসান্নিধ্য নেই। স্মৃতি মানুষকে বিপর্যস্ত করে। মন্দ সময়ে মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু তার ভালো সময়ের স্মৃতিগুলো। কারণ সেই সুখময় স্মৃতি মনের দেয়ালের চারপাশে ঘুরে ঘুরে কুঁড়ে কুঁড়ে যেন মনকে ক্ষত-বিক্ষত করে তোলে। প্রেমেও তো একই কথা সত্য, বিরহের সময় পূর্বের মিলনস্থান, মিলন-সময়ের পরিবেশ আবার যদি সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে নির্দয়ভাবে পুরনো বেদনা হৃদয় খুঁড়ে জাগিয়ে তোলে তবে তা মানবমনকে করুণাসাগরে পতিত করে। কবিতায় টগর, চাঁপা, বেল, চামেলি, জুঁইয়ের ভ্রমর দেখে নুইয়ে পড়া, তপ্ত ও-গাল ছুঁয়ে থলকমলির আওড়ে যাওয়া সবই শরীরী উষ্ণ পরশজাত অভিব্যক্তির প্রতীকী প্রকাশ। প্রকৃতির আড়ালে কবি গত-প্রিয়ার সাথের দেহজ সংস্পর্শের প্রকাশ করেছেন। কমল-ঝিলে হঠাৎ পা রাখায় দিঘির গা শিউরে উঠে কাঁটা দিয়ে মৃণাল ফোটা প্রিয়ার নিবিড় সান্নিধ্যে শরীর শিহরিত হওয়া কামজ বাসনা জাগ্রত হওয়ার রূপকায়ন। কবি-প্রিয়ার দেহজ মিলনস্মৃতির আড়ালে রূপ পেয়েছে চিরকালীন নর-নারীর সম্পর্কের নিবিড়তা। কী স্নিগ্ধ, কোমলভাবে কবি এক সাওতালিয়া জুটির আবেগকে তাঁর এবং তাঁর প্রিয়ার মধ্যে এবং তাঁদের আবেগকে সঞ্চারিত করে রেখে গিয়েছেন পরবর্তী পাঠকদের জন্য:

"পিয়াল-বনায় পলাশ ফুলের গেলাস-ভরা মউ
খেতো বঁধুর জড়িয়ে গলা সাঁওতালিয়া বউ!
লুকিয়ে তুমি দেখতে তাই,
বলতে, 'আমি অমনি চাই!'
খোঁপায় দিতাম চাঁপা গুঁজে, ঠোঁটে দিতাম মউ!
হিজল শাখায় ডাকত পাখি 'বউ গো কথা কও!'"

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৮)

সেই স্নিগ্ধ সময় এখন আর নেই, বিচ্ছেদের সুর বেজেছে। বন ঘিরে সন্ধ্যা নেমেছে, ঝাউয়ের শাখায় ভেজা আঁধার, মাঠে উদাস ভীমপলাশি গান গায়। প্রেমাষ্পদের সাথে সৃষ্টি হয়েছে অলঙ্ঘ্য দূরত্ব। শারীরিক দূরত্ব তৈরি হলেও মানসপটে যখন সে-দিনের স্মৃতি ভেসে ওঠে তখন মন-প্রান্তরের কাছে এসে পড়ে সেদিনের সকল ঘটনা। মুক্তি রায় চৌধুরীর কলমে মান্না দে'র কণ্ঠের সেই হৃদয়-খোঁড়া গান —'এখনো কি প্রথম সকাল হলে স্নানটি সেরে পূজার ফুল তুলে পূজার ছলে আমারই কথা ভাবো বসে ঠাকুর ঘরে? জানতে ইচ্ছে করে, খুব জানতে ইচ্ছে করে। এখনো কি সন্ধ্যাবেলা আমার বাড়ি ফেরার সময় পেরিয়ে গেলে, অনেক অভিমানে চোখ দুটো কি জলে ভরে? এখনো কি রাত নিঝুম হলে শরৎ কাহিনী পাশে খোলা পড়ে থাকে? ব্যাকুল তিয়াষে আমারই পিয়াসে অন্তর কেঁদে মরে'-র মতো বিচ্ছেদক্ষণে স্মৃতিকাতর কবির মনে হয়, তাঁর প্রিয়া কি খোঁপায় আম-মুকুলের কাঠি গোজে আর? ডাবের শীতল জল দিয়ে মুখ ধোয়? এই খুব জানতে চাওয়ার ইচ্ছা মানবমনের চিরন্তন ইচ্ছা। সেই প্রিয়ার সাথে সেদিন 'বউল' হয়ে যে প্রেম মুকুরিত হয়েছিল তা আজ পূর্ণ ফলরূপ বিকশিত হয়ে পূর্ণ যৌবনে পড়েছে, কিন্তু সে-প্রিয়া বিনে কে মূল্য দিবে এই পূর্ণ যৌবনের?:

"বউল ঝরে ফলেছে আজ থোলো থোলো আম,
রসের-পীড়ায়-টসটসে বুক ঝুরছে গোলাবজাম।
কামরাঙারা রাঙল ফের
পীড়ন পেতে ঐ মুখের
স্মরণ করে চিবুক তোমার, বুকের তোমার ঠাম–
জামরুলে রস ফেটে পড়ে, হায়, কে দেবে দাম!"

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৯)

এ বাসনা বাসনাতেই রয়, দাম দিতে প্রিয়া আসে না। বিরহে আঁখি জল সাতনরী-হার হয়ে হয়ে বক্ষে দোলে, প্রেমতরী কোনো কিনারা খুঁজে পায় না। স্মরণ-পার (স্মৃতি) থেকে যে কমলা নেবুর ফুলের গন্ধ আসে তাতে মন আরো বিষিয়েই ওঠে। এই ভুল মানুষকে প্রেম দিয়ে কবিমনের শ্বাশত হাহাকারমেশা জিজ্ঞাসা, 'কোথায় তুমি কোথায় আমি চৈতে দেখা সেই', 'তেমনি করে জাগছ কি রাত আমার আশাতেই?'। জিজ্ঞাসার উত্তর মিলবে তাই তো স্বাভাবিক কিন্তু, সর্বোপরি নজরুলীয় প্রেমের বৈশিষ্ট্য হলো তিনি আশাহত হন না, তাঁর

হাহাকার আশা ছেড়ে দিয়ে উদ্ভ্রান্ত হয়ে যায় না। আর এ আশাই শত বিরহে স্থির রাখে মানুষকে, কবিও পাবার আশা বুকে নিয়ে ঘাটে না' বেধে বসে থাকেন, যদি প্রিয়ার পা আবার এ-ঘাটে এসে পড়ে:

"পারাপারের ঘাটে প্রিয় রইনু বেঁধে না'
এই তরীতে হয়তো তোমার পড়বে রাঙা পা।
আবার তোমার সুখ-ছোঁওয়ায়
আকুল দোলা লাগবে নায়,
এক তরীতে যাব মোরা আর-না-হারা গাঁ,
পারাপারের ঘাটে প্রিয় রইনু বেঁধে না'।।"

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ১০)

এ কবিতা সম্পর্কে আলোচক বলছেন:

"'ছায়ানট' কবিতাগ্রন্থের অন্তর্গত 'চৈতী হাওয়া' কবিতায় কল্পনা-নির্মুক্তি আশ্চর্য-সুন্দর ভূস্বর্গ রচনা করেছে। সেই ভূস্বার্গিকে কল্পনা, নিসর্গ, সুন্দরতা স্থান দখল করেছে পরস্পরের। 'মৃত্যুর আগে' কবিতায় যেমন জীবনানন্দের রূপতৃষ্ণা চমৎকার প্রকাশ রাস্তা খুঁজে পেয়েছে, তেমনি এই কবিতায় নজরুলি কল্পনা নির্মুক্ত অথচ স্বরাট। এরকম আত্মকর্তৃত্বের নজির নজরুল কবিতায় বিরল, যদিভ এটি প্রেমজ আবেগে মুক্তপাখা। শান্ত, মধুর, বিভোর, উতল, সায়ন্তন, একটি বিষাদ লেগে আছে। পঞ্চদশ স্তবকের এই যৌগিক মঞ্জরীতে কল্পনা উতল-উতরোল হয়ে উঠেছে চিত্রকল্পের পর চিত্রকল্পে– শুধু স্তবকে নয়, ছত্রে-ছত্রে দ্যুতিমান মণিরত্নাবলি পরিকীর্ণ।" (আব্দুল মান্নান সৈয়দ, ২০১৬: ২৩৭)

৪.

কবির অভিমানী, স্নেহ-ক্ষুধাতুর, ভালোবাসা-বুভুক্ষু মন, কিন্তু বেদনা-অভিমানে ধরা দেবে না কারো কাছে। বুকের বেদনা যেন কবির অন্য এক সত্তা, সে সত্তা তার নিজের নিয়মে চলে; তাকে বুঝিয়ে চলতে হয় কবির। নিজের মনের সাথে বেদনার সাথে কথোপকথন করছেন কবি। নিজের কাছেই নিজের বিরহের স্বরূপকে উদঘাটন করেছেন। 'ভুবন-ভরা ভালোবাসা হেলায়' হারিয়ে, তাকে এড়িয়ে চলে তিনি ঘর ছেড়ে বাহির হয়েছেন বটে কিন্তু,

'বুকের বেদনা' 'ঝনঝা-কাতর নিশীথ রাতের কপোত সম' আকুল কাঁদন কাঁদে। ভালোবাসা এসে যখনই তাঁকে বন্ধনে আবদ্ধ করতে চেয়েছে তখনই তিনি হয়েছেন 'বাঁধন-হারা'। নজরুলের চির উদাসী, চির সন্ন্যাসী মন উদ্দাম বায়ুর মতো বহমান নদীস্রোতের মতো নিত্য নতুন জগতে ভ্রমে বেড়ায়। কিন্তু সে ভ্রমণে তিনি আনন্দিত থাকেননি, গভীর বেদনাই তাঁর সঙ্গী হয়েছে। তাঁর এই স্বেচ্ছানির্মিত বেদনা সম্পর্কে গবেষক বলছেন:

> "প্রেমকবিতা ও গানে নজরুল তীব্র ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমের উপাসক। দেবেন্দ্রনাথ, গোবিন্দচন্দ্র দাস, মোহিতলাল যে প্রেমকবিতা লিখেছেন, নজরুল তাকেই শিল্পসুন্দর রূপ দিয়েছেন। তীব্র passion, হৃদয়াবেগ, উন্মাদনা, সব ভোলানো প্রতপ্ত প্রেমাবেগের পূজারী ছিলেন নজরুল। বায়রণ, কীটস্, বার্নস-এর প্রেমকবিতায় যে তীব্রতা, তা নজরুলের রচনায় সমুপস্থিত। তথাপি নজরুল দেহভিত্তিক প্রেমের পূজারী নন, তিনি রোমান্টিক প্রেমের উপাসক। প্রথম জীবনে রচিত 'বাঁধনহারা' পত্রোপন্যাসে তিনি যে ব্যর্থ প্রেমের ছবি এঁকেছিলেন (যাতে ব্যক্তিগত জীবনের প্রভাব অনতিস্পষ্ট), তার ধুয়া নজরুল সারাজীবন ধরে গেয়েছেন। রোমান্টিক কৈশোর-প্রেমের উচ্ছ্বাস এই পত্রোপন্যাসের মূল বক্তব্য, প্রেমকবিতা ও গানেও সেটি আবিষ্কার করা বিশেষ কঠিন নয়।"
> (অরুণকুমার, ১৯৫৯: ২১১)

এই ব্যর্থ প্রেমের বেদনা তিনি নিজে তৈরি করে করেই কি নিজেকে পীড়ন করেছেন? সম্ভবত তাই। তাঁর ভালোবাসার গভীরতা যেমন ছিল, অভিমানের তীব্রতাও তেমন ছিল। কিন্তু গৃহ ছেড়ে বের হলেই তো একাকী সন্ন্যাসী হওয়া যায় না; ঘরের ক্ষুদ্র গণ্ডি ছেড়ে যে বের হয় অসীম প্রকৃতি তার সঙ্গী হয় আর মন সে তো ব্যক্তে বা অব্যক্তে কাউকে খুঁজেই ফেরে:

> "চললে একা মরুর পথেও
> সাঁঝের আকাশ মায়ের মতন ডাকবে নত চোখে,
> ডাকবে বধূ সন্ধ্যাতারা যে!
>
> জানি ওরে, এড়িয়ে যারে চলিস তারেই পেতে চলিস পথে।
> জোর করে কেউ বাঁধে না তাই বুক ফুলিয়ে চলিস বিজয়-রথে।"
>
> (রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ১১)

৫.

যে তীব্র প্রেম কখনো প্রকাশিত হয় না, হলেও গোপনে-নিভৃতে 'নিশীথ-রাতের গোপন সাথী' হয়ে কদাচিৎ ধরা দেয়, দিনের আলোর অগোপন জীবনে তাকে পাওয়া হয়ে ওঠে না সে প্রিয়া 'নিশীথ-প্রিতম্'। সমাজ নিষিদ্ধ সেই প্রেমে 'সুদূর থেকে' 'একলা জেগে রাতি' 'দুজনারেই জনম ভরে' কাঁদা ছাড়া আর কী বা গতি হতে পারে! এমন কতশত প্রেম লোকচক্ষুর আড়ালে তৈরি হয়ে আড়ালেই শেষ হয়ে যায়। অপ্রকাশ্য বেদনা লালন করে করে দিনরাত অতিবাহিত করে সেই প্রেমের মানব-মানবীরা। নজরুল-প্রমীলার প্রেম তো এমনই অনিশ্চয়তার আশঙ্কায় পূর্ণ প্রেম ছিলো। হিন্দু-মুসলিম প্রেমে পরিণয়ের সম্ভাবনা দেখা সেই সময়ে বেশ কঠিনই ছিল। তাই যখন 'ভুবন-ছাওয়া আঁচল পেতে নিশীথ' ঘুমে যায়, আকাশ-বাতাস সব 'নিঝঝুম' হয় তখন মন খুব নিজের করে যাকে পেতে চায় সে না থাকায় তার স্মৃতি-ছোঁয়া নিয়েই ক্ষণ কাটায়; 'চিঠির নাম-সহিতে চুম' দেয়। নানারকম বাধা নিষেধের দেয়ালের কারণে মন ছুটেছে যার কাছে, খুব করে চেয়েছে যাকে, তাকে হয়নি পাওয়া, হয় না পাওয়া। এ ব্যাকুলতা প্রকাশের সব পথ রুদ্ধ হলেও চোখের ভাষা সামান্য পথ পেলেই প্রকাশিত হয়। সেই 'নিশীথ-প্রিতম্'-এর সাথে চোখে চোখে কথা বিনিময় করে না পাওয়ার বেদনায় পিষ্ট হতে হয়:

"কভু কি কথা সে কইতে গিয়ে হঠাৎ যাব থেমে,
অভিমানে চারটি চোখেই আসবে বাদল নেমে!
কত চুমুর তৃষায় কাঁপবে অধর, উঠবে কপোল ঘেমে!
হেথা পুরবে না নাকো ভালোবাসার আশা অভাগিনী,
তাই দলবে বলে কলজেখানা রইনু পথে পাতি।।"

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ১২)

৬.

বেলা ফুরিয়ে অবেলায় এসে আক্ষেপ করা মানব চরিত্রের প্রায় অনিবার্য প্রবণতা। জগৎ সংসারের অন্য সকল ক্ষেত্রে যেমন এ আক্ষেপ আছে, আছে প্রেমের আবেগের ক্ষেত্রেও। যথা সময়ে যথা কাজ করার গুরুত্ব উপলব্ধি না করা, তা সম্পাদন না করার আক্ষেপ অনেকেরই থাকে। কবি এমন আক্ষেপের একাধিক কবিতা লিখেছেন। 'অবেলার ডাক' শিরোনামের দীর্ঘ কবিতায় বারবার যে নিবেদন উপেক্ষা করেছেন সে নিবেদনের কথা আউড়েছেন। প্রেমকে উপেক্ষা করে কৃত্রিম শোক তৈরি করে বৃথা কাঁদা যেন নজরুলের স্বভাবধর্ম। এই রোমান্টিক কবি সততই তাঁর হৃদয়ের চারপাশে একটা বিরহের দেয়াল তৈরি করে রাখতেন। 'অবেলায়' কবিতায় দৌলতপুরে থাকাকালীন নজরুলের আক্ষেপ হয়েছিল কোন অসম্পাদিত কাজের কথা মনে করে, যা তার করা উচিত ছিলো, কিন্তু করা হয়নি। সেটা ছোট্ট বুকের ভালোবাসায় সাড়া দিয়ে তার দ্বারে না নামা। ছোট্ট সে বুকের ভালোবাসা উপেক্ষা করে যে কবি অন্য কাউকে নিয়ে সুখ-সাগরে ভাসছেন এমন নয়। উপেক্ষা যে করে তার মনেও ব্যথা রয়ে যায়। ব্যথা যে দেয় সেও ব্যথা পায়। হাত-পা তো ভাঙা কাঁচেই কাটে, ভালো কাঁচে নয়। যে আঘাত করে সে অনিয়ন্ত্রিত থাকে, অগোছালোই থাকে। আপাতভাবে বাইরে থেকে তার উপেক্ষা, দম্ভ, কঠোরতা দেখা গেলেও ভেতরে অন্যরকম ছবি থাকে। নিজের ভেতরের সে ছবিকেই তিনি উন্মোচন করছেন যেন তাঁকে ভুল না বোঝা হয়:

"জানলে না সে ব্যথাহতা
পাষাণ-হিয়ার গোপন কথা,
বাজের বুকেও কত ব্যথা
কত দামিনী!
আমার বুকের তলায় রইল জমা গো–
না-কওয়া সে অনেক দিনের অনেক কাহিনী।"

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ১৩)

৭.

শিশুরা সর্বদাই মায়াজাগানী, আদরকাড়া এবং হৃদয়হরা হয়। শিশুদের সরলতা, কোমলতা আকৃষ্ট করে যেকোনো সংবেদনশীল মনের মানুষকে। এ কাব্যে কয়েকটি কবিতাতেই বাৎসল্য রসের ছায়া এসেছে। দৌলতপুরের শিশুরা মণি-মালার মতো নজরুলের কণ্ঠে জড়িয়েছিল। তাদের ছোট্ট বুকের ভালোবাসা দিয়ে কচি বাহুর রেশমি ডোর তাঁকে ঘরের বন্ধনে বেঁধেছিল। সচেতনতার সাথে নজরুলকে যারা যশ, মান, অর্থ, বিত্ত, রূপ-যৌবন দিয়ে বাঁধতে চেয়েছিল তারা ব্যর্থ হয়েছে। এক তিনি হার মেনেছেন বিশুদ্ধ প্রেমের কাছে আর তিনি হার মেনেছেন বিশুদ্ধ স্নেহের কাছে। চলতে গেলেই শিশু-কিশোরদের না না বলে ঘাড় নাড়ানোর মধ্যে যেন ভেসে ওঠে রবীন্দ্রনাথের সেই অমর শব্দত্রয়ী 'যেতে নাহি দিব'। কিন্তু, বাৎসল্য রসের কবিতা হলেও দেশ-বিদেশের ঘাত-প্রতিঘাত সওয়া চিরবিরহী নজরুলের চিরব্যথিত মনে শিশুদের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে পুরনো ব্যথা জেগে উঠেছিল। এই শীতসদৃশ পাথরকঠিন হৃদয়কে তারা শরতের আলতো পরশ দিয়ে উষ্ণ করেছিল:

"কত দেশ-বিদেশের কান্না হাসির
বাঁধন-ছেঁড়ার দাগ যে বুকে পোরা;
তোরা বসলি রে সেই বুক জুড়ে আজ,
চিরজয়ীর রথটি নিলি কাড়ি।
ওরে দরদিরা! তোদের দরদ
শীতের বুকে আনলে শরৎ,
তোরা ঈষৎ ছোঁয়ায় পাথরকে আজ
কাতর করে অশ্রুভরা ব্যথায় ভরালি।।"

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ১৪)

৮.

'লক্ষ্মীছাড়া' কবিতায় নজরুলের প্রেম বৈশিষ্ট্যের অন্যতম দুটি দিক প্রকাশিত হয়েছে–

১. 'আমি নিজেই নিজের ব্যথা করি সৃজন।'

২. 'প্রেম-পিয়াসী প্রণয়-ভুখা শাশ্বত যে আমিই তৃপ্তিহারা;'

এই দুটি অন্যতম নিয়ামক নজরুলের প্রেমের কবিতার প্রধানতম চালিকাশক্তি। ক্ষেত্রবিশেষে তিনি নিজেই নিজের বেদনা তৈরি করেন এবং ঘনীভূত করেন আর যৌবনের অতৃপ্তি তাঁকে নিত্য তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। প্রতিটি মানুষ তার নিজের সত্ত্বার কাছে একলা, বাহ্যত সে অন্য মানুষের সাথে থাকলেও অন্তর্জগতে নিঃসঙ্গ, ভয়ানকভাবে নিঃসঙ্গ। অধিকাংশ মানুষই ভেতরে ভেতরে বিরহী, একাকী। দূর হতে কবির সৃষ্টিতে মুগ্ধ হয়ে অনেকেরই তাঁর প্রতি অনুরাগ তৈরি হয় কিন্তু তাঁকে সয়ে থাকতে পারে না কেউই। যাকেই তিনি হৃদয়ে টেনেছেন সেই বিষিয়ে উঠেছে। নজরুলের প্রেম গৃহের প্রেম ছিল না। এজন্য কবি অন্যদের দোষ দিচ্ছেন না। এটিও মূলত নজরুলের প্রেম-মানসের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। পরকে আপন করার ব্যর্থ প্রয়াসে তিনি নিজেই নিজের ব্যথা তৈরি করেন। চিরপথিক নজরুলের বাহিরই যেন আপন, ঘরের মায়াডোরে আবদ্ধ হতে চেয়েছেন যতবার ততবারই আঘাত পেয়ে ফিরে এসেছেন। নজরুলের এই বোহেমিয়ান জীবন সম্পর্কে গবেষক বলছেন :

> "নজরুলের জীবন ও কাব্য– দুই'ই বিস্ময়কর, অভিনব, উৎকেন্দ্রিক। রবীন্দ্রযুগে প্রেম, অধ্যাত্মবাদ, সৌন্দর্যবোধ প্রভৃতি শান্তরসাম্পদ কাব্যপ্রত্যয় ছেড়ে হাবিলদার-কবি নজরুল ইসলাম একেবারে সামরিক হুঙ্কার দিয়েই কাব্যপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করলেন। শিক্ষাদীক্ষায় পোশাকীভাবে বেশী অগ্রসর হননি, কিন্তু শিক্ষার যে ফল জ্ঞানলাভ ও ভূয়োদর্শন, তা তাঁর আয়ত্ত হয়েছিল অবলীলাক্রমে। প্রথম মহাযুদ্ধে নাম লিখিয়ে নজরুল কিছুকাল সামরিক আবহাওয়ায় বাস করে নিজের কাব্যবোধকে শানিয়ে নিয়েছিলেন। ফিরে এসে ঘর বাঁধলেন বটে, কিন্তু ঘরের মায়া তাঁকে কখনো বেঁধে রাখেনি। বন্ধুবৎসল নজরুল বন্ধুদের আড্ডায় ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হতেন, ওষ্ঠাধরে পানের রস এবং কণ্ঠে সুরের

রেশ নিয়ে তিনি সঙ্গীতে ডুবে যেতেন, যৌবধর্মের অতিরেকে সারা দেশটাকে যেন চষে বেড়াতেন। তেজী ঘোড়ার মতো দুর্মদ যৌবনাবেগ তাঁকে কোথাও স্থির থাকতে দেয়নি।" (অসিতকুমার, ২০১৯: ৫৩২)

'দুখু মিয়া'র রুটির দোকানে কাজ করা, লেটোর দলের সাথে বেড়ানো, সৈনিক জীবন, পরবর্তীতে সাহিত্য ও সংস্কৃতির কাজে বিভিন্ন জায়গায় পরিভ্রমণ করে বেড়ানো জীবন তো গৃহহারা জীবনই। ঘরকাতরতা থাকলেও তিনি বুঝে গিয়েছিলেন ঘরের স্থির জীবন তাঁর নয় এবং তিনিই 'লক্ষ্মীহারা':

"জানি আমি লক্ষ্মীছাড়া
বারণ আমার উঠান মাড়া,...
আর কেউ হবে না আপন যখন, সব হারিয়ে চলতে হবে
পথটি আমার নিজন!
আমি নিজেই নিজের ব্যথা করি সৃজন।।"

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ১৫)

৯.

লক্ষ্মীছাড়া জীবন নিয়ে এ প্রান্তর থেকে ও প্রান্তরে কবি ছুটে বেড়ান। এ ভ্রমণে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে হলে বিদায় নিতে হয় বিদায়ী জায়গা ও জনদের কাছ থেকে। সাহিত্য, সামাজিক, রাজনৈতিক বিভিন্ন সভা-সমাবেশে নজরুল যোগ দিতেন। কাজে-অকাজে যেতেন অনেক জায়গায়। সেখানে ছেলে-বুড়ো বা সমবয়সী সঙ্গী সাথীদের মায়ায় পড়তেন। হৃদয়ের যোগও হতো কারো কারো সাথে। এই মায়া-মমতা, প্রেম-স্নেহের বন্ধন ছিঁড়ে বিদায় নেয়াটা কঠিন, কিন্তু মানুষকে তো বিদায় নিতে হয়। বিদায়বেলায় 'দূরের বাঁশি' যখন ডাক দেয় 'বাঁধন-পাশে' তখন আর বেঁধে রাখা যায় না। অনাগতার হাতছানিতে সাড়া দিয়ে মানুষকে আবার পা বাড়াতে হয়। পেছনে পড়ে থাকে মন, মনের মানুষেরা। কবি আকাশ-সীমায় শব্দ শোনেন অচিন পায়ের আসা-যাওয়ার, তাতেই বোঝেন এখানে অনেক দাবি-দাওয়ার শেষ হয়েছে। মানুষের মধ্যে পিছনে ফিরে তাকাবার প্রবণতা কম, তাকালেও সেখানে সমবেদনা বা সহমর্মিতা কমই থাকে। সামনের

দিকে অগ্রসরমান মানুষ সাধারণত শুরুতে তার পিছনের সব কিছুকে উচ্ছিষ্টের মতো করেই দেখে। প্রবল বস্তুতান্ত্রিক ভোগবাদী মানুষদের এমনই প্রবৃত্তি। নজরুল কোমল হৃদয়ের কবি, একটা বেদনার চাদর দিয়ে তাঁর হৃদয়পাশ আবৃত ছিলো। সেই চাদরে নিজের ব্যথা এবং অন্যের ব্যথা সমভাবে অনুভব করতেন তিনি। 'শেষের গান' গেয়ে তিনি বিদায় নেন তাদের কাছ থেকে। প্রকৃতির মধ্যে সম্প্রসারিত যার চেতনা সে অনুভব করে তার বিদায়ে ভারাক্রান্ত প্রকৃতিও, তার 'বেদনার কর্পূর-বাস ভরপুর আজ দিগ্বলয়ে; অথবা, প্রকৃতির আড়ালে তিনি মানুষের ভারাক্রান্ততাই প্রকাশ করেন:

"আমার বিদায়-রথের চাকার ধ্বনি ঐ গো এবার কানে আসে।
পূবের হাওয়া তাই কেঁদে যায় ঝাউএর বনে দীঘল শ্বাসে।।
ব্যথায় বিবশ গুলঞ্চ ফুল
মালঞ্চে আজ তাই শোকাকুল,
মাটির মায়ের কোলের মায়া ওগো আমার প্রাণ উদাসে।।"

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ১৫-১৬)

১০.

'শেষের গান' গেয়ে কবি বিদায় নিলেন বটে, কিন্তু সে বিদায়ের তাঁর কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্য নেই, 'নিরুদ্দেশের যাত্রী' হয়ে ঝড়-ঝঞ্ঝাময় বৈরী আবহাওয়া মাথায় নিয়ে চলছেন কোন অজানা পথে। গন্তব্যহীন এই বন্ধুর পথ একলা পাড়ি দিতে গিয়ে 'নিবিড় সে কোন বেদনাতে ভয়-আতুর এ-বুক কাঁপল দুরু-দুরু'। এমন অনিকেত যাত্রায় মানুষ স্বভাবতই ভয়ার্ত হয়, হয়েছেন কবিও। বিদায় নিচ্ছেন যেখান থেকে সেখানটায় এখনো চেনাজানা হয়নি সেভাবে, এরই মধ্যে অস্থির বিদায়বার্তা বেজেই চলেছে। এমন বিদায় কবিকে বারবার নিতে হয়েছিল। বিয়ের রাতেই সদ্য পরিণীতাকে রেখে কবি যে নিরুদ্দেশে বেরিয়েছিলেন তার সুর যেন এ কবিতাতে ধ্বনিত —'হাতছানি দেয় রাতের শাঙন/ অমনি বাঁধে ধরল ভাঙন,/ ফেলিয়ে বিয়ের হাতের কাঁঙন–/ খুঁজে বেড়াই কোন আঙনে কাঁকন বাজে গো!' খুঁজে কবি সহসাই কোনো মানবসান্নিধ্য পাননি, তাঁকে মোকাবেলা করতে হয়েছে বৈরি প্রাকৃতিক পরিবেশ। 'বাদলি হাওয়া', 'ঝড়ের মাতন', 'দেয়ার গুরু-গুরু', 'মুখে

মেঘের ঝাপ্টা', প্রভৃতি। এই বিপদসংকুল পরিবেশের চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে নজরুল দারুণ এক চিত্রকল্প তৈরি করেছেন:

'তাল-বনা'তে ঝঞ্ঝা তাথৈ হাততালি দেয়, বজ্রে বাজে তূরী,
মেখলা ছিঁড়ি পাগলি মেয়ে বিজলি-বালা নাচায় হীরের চুড়ি
ঘুরি ঘুরি ঘুরি
ও সে সকল আকাশ জুড়ি!'

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ১৭)

মেখলা দিয়ে বিজলি-বালা পাগলি মেয়ের সারা আকাশ জুড়ে নাচার মধ্যে নজরুলের মুক্ত-বিহঙ্গ মনের স্বাধীন বিচরণের চিত্রই যেন ধরা পড়ে। এই সকল প্রাকৃতিক বৈরিতা মোকাবেলা করে করে কবির জীবনপথে যাত্রা। প্রাকৃতিক বৈরীতার আড়ালে মনুষ্যপ্রদত্ত বৈরীতাকেই রূপায়িত করেছেন তিনি। যতটা না বাহ্যিক প্রতিবন্ধকতা ছিল তার চেয়ে বেশি ছিল তাঁর হৃদয়ের ক্ষত এবং মানুষের দেয়া কষ্ট, বেদনা, যন্ত্রণা। শ্বাশত মানবের জীবনপথও এমনই বন্ধুর, এমনই বিপদসংকুল। হয়তো কম বা বেশি। এই বন্ধুরতা তো চিরস্থায়ীভাবে থাকে না। কখনো কখনো কাঁদা থামে, ধাঁধা কাটে; ভোরের তারারা বিদায় নেয়, তখন আবার কানের কাছে বহমান শীতের বায়ু নিয়ে সন্ধ্যাতারার চলার পথে যাত্রা করতে হয়:

"থামল বাদল রাতের কাঁদা
হাসল, আমার টুটল ধাঁধা,
হঠাৎ ও কার নূপুর শুনি গো?
থামল নূপুর, ভোরের তারা বিদায় নিল ঝুরি।
আমি এখন চলি সাঁঝের বধূ সন্ধ্যাতারার চলার পথ গো!
আজ অস্তপারের শীতের বায়ু কানের কাছে বইছে ঝুরু-ঝুরু।।"

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ১৭)

১১.

'চিরন্তনী প্রিয়া' ধারণাটি নজরুলের প্রেমদর্শনের অন্যতম আরেকটি দিক। শেষের দিকের কাব্য 'নতুন চাঁদ' এ আমরা 'চির-জনমের প্রিয়া' নামের আরেকটি কবিতা পাই। নজরুল এক প্রেমে কখনো স্থির ছিলেন না, তাঁর প্রণয় দর্শনেও এটা নেই। কিন্তু, ছুটে ছুটে বেরিয়েও কোনো স্থির প্রশান্তির দেখা তিনি পাননি। তাই যতবার আহত হয়েছেন ততবার হৃদয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখেছেন সেখানে ধ্রুব-আসনে একজন আসীন। মানুষ অনেকের প্রেমের পরলেও একজন কেউ থাকে যে যায় না কোথায় চিরতরে মন-প্রাঙ্গন ছেড়ে। এই না ছেড়ে যাওয়া জনই চিরন্তন জন।

এ পৃথিবীতে মানুষ ক্ষণিকের জন্য আসে, পরিচিত হয় কতশত মানুষের সাথে। অপরিচিত থেকে পরিচিত হয়, পরিচিত থেকে প্রিয় হয়, প্রিয় থেকে অপ্রিয় হয়। কিছু বন্ধন থাকে কিছু বন্ধন শিথিল হয়ে যায়। এরই মাঝে কেউ কেউ থাকে চিরন্তনী প্রিয়/প্রিয়া হয়ে। প্রাণের দোসর হয়ে প্রাণে তাদের নিত্য বসবাস। বারবার ফিরে ফিরে তাদের কাছেই আসা হয়। কত 'নিত্য-নূতন বাঁধন' আসে; ভালোবাসার আশাতে এসে আশাহত হয়, হঠাৎ পরিচয়ে হঠাৎই ক্ষণিকের গভীর বন্ধন তৈরি হয়। সে বাঁধন সহসা কেটেও যায়। এখন একবিংশ শতকে এসে আমরা দেখি যেখানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং ইন্টারনেট-প্রযুক্তি মানুষের জীবন এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে সেখানে আবেগ কত ঠুনকো। তৈরি হতেও সময় লাগে না, মিলিয়ে যেতেও সময় লাগে না। এসবের মাঝেও কেউ থাকে যে চিরকালের জন্য হৃদয়ে দাগ কেটে যায়। ক্ষণিকের জনেরা সবাই ক্ষণিক থেকে ছেড়ে গেলেও চিরন্তন যে জন সে জানে তার কাছেই আবার ফিরে আসতে হবে এবং আসেও মানুষ তাই:

"বিজয়িনী চিরন্তনী মোর!
একা তুমিই হাসো বিজয়-হাসি! দীপ দেখিয়ে পথে ঘুরানো।।

তুমি যেদিন মুক্তি দিলে হেসে বাঁধন কাটলে আপন হাতে,
প্রেম-গরবী আপন প্রেমের জোরে,
জানতে, আমায় সইবে না কেউ বইবে না ভার,
হার মেনে সে আসতে হবে আবার তোমার দোরে।"

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ১৮)

১২.

বুকের গভীরে যে আঘাত কবি পেয়েছেন তাকে 'মণি', 'কৌস্তভ', 'হিরে-মানিক' ইত্যাদি বলে অভিহিত করেছেন। জীবনটাকে তিনি আঘাত আর বঞ্চনার ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। 'দারিদ্র্য' কবিতায় আমরা দেখি কিভাবে দুঃখ-দরিদ্রতার বন্দনা তিনি করেছেন। আসলে দুঃখই পরশপাথর। এ পাথরের স্পর্শে সবাই খাঁটি হয়ে যায়। নজরুল তাঁর জীবনের আঁধার ঘরে একটাই মানিক পেয়েছিলেন তা 'বেদনা-মানিক'। কাল বা সময়কে তিনি তুলনা করেছেন ফণীর সাথে। নজরুলের সময় আসলে ফণীসদৃশ ছিল। ভারতের জাতীয় অঙ্গন, আন্তর্জাতিক অঙ্গন কিছুই স্থিতিশীল ছিলো না। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, ঔপনিবেশবাদ বিরোধী আন্দোলন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, ব্যক্তিক ও পারিবারিক জীবন সব মিলিয়ে তাঁর পুঁজি ছিল একটা বেদনা-মানিক। তাঁর এই বেদনা-বিধুরতা সম্পর্কে আলোচক আবুল কালাম শামসুদ্দিন বলেন:

> "নজরুল ইসলাম বেদনার কবি। তাঁহার প্রায় সমস্ত রচনাই বেদনার সুরে ভরপুর। আর্ত-ব্যথিত উৎপীড়িত মানব-মনের ব্যথাকেই তাঁহার রচনার মধ্য দিয়া তিনি ফুটাইয়া তুলিতেছেন। বেদনা ব্যক্তিগত মনের অভিব্যক্তি হইলেও ইহার অনুভূতি বিশ্ববাসীর মনেই খেলা করে। সুতরাং বেদনা একটা বিশ্বজনীন অনুভূতি। একজনের ব্যথা দেখিয়া যে অপর একজন লোকও হৃদয়ে বেদনা অনুভব করে, তাহার ব্যথার ব্যথী হয়, বেদনার বিশ্বজনীনতার ইহাই কারণ। ...। নজরুলের কাব্যে বেদনার এই বিশ্বরূপ আছে বলিয়াই তাঁহার কাব্যকে আমরা বিশ্ব-সাহিত্য বলিয়া অভিনন্দন করি।" (উদ্ধৃত, মঈনুদ্দিন, ২০১৬: ১৩২-১৩৩)

নজরুলের ভাষায়:

> "একটি শুধু বেদনা-মানিক আমার মনের মণি-কোঠায়,
> সেই তো আমার বিজন ঘরে দুঃখ-রাতের আঁধার টুটায়।

সেই মানিকের রক্ত আলো
ভুলাল মোর মন ভুলাল গো।
সেই মানিকের করুণ কিরণ আমার বুকে মুখে লুটায়।।"

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ১৯)

১৩.

সুফি তত্ত্বে আশেক এবং মাশুক যখন লীন হয়ে যায় একে অন্যের মাঝে তখন মুছে যায় শরীরী সীমা। সৃষ্টি এবং স্রষ্টা তখন একাকার হয়ে যায় একে অন্যের মাঝে। তেমনি প্রেমে প্রিয় এবং প্রিয়া যখন একাকার হয়ে যায় তখন একজনের স্মৃতিতে-অনুভবে অন্যজন জীবন্ত হয়ে থাকে। দৈহিক দূরত্ব ঘুঁচে যায়। প্রিয়ার/ প্রিয়র মনে হয় প্রিয়স্পর্শ যেখানে যেখানে লেগেছিল সেখানে সেখানে জীবন্ত হয়ে আছে তা। তাই প্রিয়ার সাথে শরীরী বিদায় হলেও অগোচরে অপ্রত্যক্ষে প্রিয়া থেকে যায় সেইসব ছোঁয়ায় ছোঁয়ায়। প্রিয় সান্নিধ্যের অনুপস্থিতি খুব তীব্রভাবে অনুভূত হলে নিজেকে নিজে ছোঁয়াতেই লাগে প্রিয়-ছোঁয়ার শিহরণ। নিজেকে নিজে আলতো চুমু এঁকে নেয় প্রিয়ার চুমুর অনুভূতি। নজরুল দৈহিক প্রেমের কবি তাই দেহসান্নিধ্যেই প্রিয়াকে অনুভব করেন। প্রিয়ার অনুপস্থিতিতেও প্রিয়ার শরীরী স্পর্শেরই পূজা করেন। সেই ঘোরলাগা অনুভবকে নজরুল ভাষা দিয়েছেন এভাবে:

"আমারি এই সকল দেহে
চুমব আমি চুমব নিজেই অসীম স্নেহে গো,
আহা পরশ তোমার জাগছে যে গো এই সে দেহে মম।।

তখন তুমি নাই বা প্রিয় নাই বা র'লে কাছে।
জানব আমার এই সে দেহে এই সে দেহে গো
তোমার বাহুর বুকের শরম-ছোঁয়ার কাঁপন লেগে আছে।"

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ১৯)

১৪.

সংবেদনশীল মন মাত্রেই অন্যের বেদনা অনুভব করতে পারে। অন্যকে অনিচ্ছাকৃত আঘাত দিলে সে আঘাতের ব্যথা সেও অনুভব করে আগে অথবা পিছে৷ এটি মানবচরিত্রের কোমল বিরলতম দিক৷ বিরল বলেই এটি অনিন্দ্যসুন্দর, অনুপম। মানুষ এখানেই তার সীমানা ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বে উঠে যায়। কবি এখানে কষ্ট পাওয়া জন নয়, কষ্ট দেওয়া জন। যাকে অবহেলা-অনাদর করেছি যখনই বুঝতে পারি যে তাকে অবহেলা অনাদর করেছি এর চেয়ে সুন্দরতম আদর বোধ হয় আর হয় না। 'অনাদৃতা' সেই ব্যথা সয়ে নেয়া প্রিয়াকে কবি 'হারা-মণি' বলে সম্বোধন করছেন। অবহেলা সয়ে সয়ে যায় যেজন সে যে চিরকাল অবহেলা সয়ে যায় না, নিরবে নিভৃতে মিলিয়ে যায় কোথাও নজরুল বোধ হয় সেটা গভীরভাবে উপলব্ধি করেননি। তাঁর অনেক কবিতাতেই এমন আক্ষেপ দেখা যায়। সময়ে রাখা যায়নি যাকে অসময়ে মনে পড়ে তাকে, এই তো মানবের নিষ্ঠুরতম পরিহাস! অবশেষে সেই 'অভিমানিনী', 'অনাদৃতা'র প্রতিই কবির যে নিবেদন রয়ে যায় সকল উপেক্ষা করা মানুষের নিবেদনের প্রতিনিধি হয়ে তা হলো:

"না-কওয়া তোর সেই সে বাণী,
সেই হাসি-গান সেই মু'খানি হায়!
আজো খুঁজি সকল ঠাঁই।
তোরে যাবার দিনে কেঁদে কেন ফিরিয়ে আনিনি?
ওরে অভিমানিনী।।"

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ২১)

১৫.

'পূজারিণী' কবিতায় আমরা দেখি ব্যথিত, বঞ্চিত, অপমানিত কবি আশ্রয় নেন এক মায়ের কাছে। তিনি মাতৃস্নেহদাত্রী বিরজাসুন্দরী দেবী হতে পারেন বা প্রতীকী অর্থে কবি ধরিত্রী মা কেও বোঝাতে পারেন। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অন্যায়ে কবি যেখানে বিধাতার বুকে লাথি মারতেও দ্বিধা করেন না সেখানে হৃদয়ের কারবারের জায়গায় বড় নাজুক হয়ে পড়েন তিনি। ব্যথিত, নীড়-হারা কবি নিজেকে বাণবেঁধা পাখির সাথে তুলনা

করেছেন। এই বাণবিদ্ধ আহত হৃদয় নিয়ে তিনি এই কবিতাতেও মাতৃসম বিরজাসুন্দরী দেবীর কাছে মাতৃস্নেহে আশ্রয় পেয়েছিলেন। বাৎসল্য রসের কবিতা এটি মূলত। লিখেছেন সেই মায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে। মাকে তিনি খানিকটা বুঝেছেন আর খানিকটা নির্মাণ করেছেন নিজের মনের আদলে। মানুষ তা-ই করে, খানিক আপাত জানা-শোনা নিয়ে নিজের জ্ঞান, বিশ্বাস, আদর্শ দিয়েই সে সবাইকে বাকিটা নির্মাণ করে নেয়। নজরুলের নির্মিত মা বলেই মায়ের স্নেহ, আদর, উৎকণ্ঠাও এখানে নজরুল কণ্ঠের এবং নজরুল-হৃদয়ের। স্নেহের আড়ালে ধরা পরেছে কবির আহত হৃদয়। 'কোমল বুকে কাঁটা-বেঁধা পাখি', 'বক্ষে বিঁধে বিষ মাখানো শর', এসব শব্দবন্ধে কবির প্রাপ্ত আঘাতের তীব্রতাই প্রকাশিত হয়েছে। এই আহত কবিকে মাতৃস্নেহের রসে মাতৃসমের ভাষ্যে এসেছে—কে চিনালে পথ তোরে হায় এই দুখিনীর ঘর?/ তোর ব্যথার শান্তি লুকিয়ে আছে আমার ঘরে নাকি?' ব্যথার শান্তি পেতে আসলেও নজরুলের মা যেন নজরুলের মতোই কাতর। সেই শক্তিহীন মায়ের দ্বারে সেই আসে মরণ তাকে বরণ করতে আসে, তাই নজরুলের মতোই মাও এখানে করুণ অবস্থার শিকার এবং তার আশ্রয়ে গদগদ আবেগ আর উৎকণ্ঠাই শুধু আছে, নিরাপত্তা নেই। এ মায়ের রূপ যেন আবহমান বাংলার মায়েদেরই রূপ, যাদের চোখের জল আর হৃদয়ের হাহাকারই একমাত্র সম্বল:

"মরণ যে বাপ বরণ করে তারে,
'মা' 'মা' ডেকে যে দাঁড়ায় এই শক্তিহীনার দ্বারে!
মাণিক আমি পেয়ে শুধু হারাই বারেবারে,
ওরে তাই তো ভয়ে বক্ষ কাঁপে কখন দিবি ফাঁকি!
ওরে আমার হারামণি! ওরে আমার পাখি!
কেমন করে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি?

হারিয়ে-পাওয়া ওরে আমার মাণিক!
দেখেই তোরে চিনেছি, আয়, বক্ষে ধরি খানিক!
বাণ-বেঁধা বুক দেখে তোরে কোলে কেহ না নিক,
ওরে হারার ভয়ে ফেলতে পারে চিরকালের মা কি?
ওরে আমার কোমল-বুকে কাঁটা-বেঁধা পাখি!
কেমন ক'রে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি।"

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ২২)

এমনই বাৎসল্য রস এবং সম-আবেগের কবিতা আরো কয়েকটি আছে এ কাব্যে পর্যায়ক্রমে— ১৬.'হারা-মণি', ১৮.'স্নেহ-ভীতু', ১৯.'পলাতকা', ২০.'চিরশিশু'।

১৭.

পরপর পাঁচটি বাৎসল্য রসের কবিতার মাঝে ছোট একটি কবিতা 'নীল পরী'। কবি যখন ট্রেনে কুমিল্লার পথের যাত্রী তখন সর্ষে ফুলের হলুদ রঙকে কারো উত্তরীয়র সাথে তুলনা করেছেন৷ হলুদ সরিষা ক্ষেতের উপরে আকাশের নীলে মুগ্ধ হয়ে তাকে নীল পরীর দূর তরী বলেছেন। চলমান ট্রেন যখন সবুজ-হলুদ রঙের মাঠ-রঙ পেরিয়ে গন্তব্যের পথে তখন এহেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মুগ্ধতার পাশাপাশি নিজ হৃদয়ের ব্যাথা, উদাসীনতাকেও সঞ্চারিত হতে দেখেছেন প্রকৃতির মাঝে:

"মাঠ-ঘাট তার উদাস চাওয়ায়
হুতাশ কাঁদে গগন মগন
বেণুর বনে কাঁপচে গো তার
দীঘল শ্বাসের রেশটি সঘন।"

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ২৫)

২১.

যে প্রিয়াকে কল্পনার জগতে এঁকে কবি মানস-বধূ রূপে সাজিয়ে রেখেছেন সে প্রিয়ার রূপ এবং অভিব্যক্তিকে তিনি বহির্প্রকৃতির সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন। প্রজাপতির ডানায় ছোঁয়ায় যেমন ছাঁচি পানের কচি পাতা নুইয়ে পড়ে তেমনি প্রিয়ার কাঁপন-আকুল ঠোঁটও একটি চুমায় নুইয়ে পড়ে। নিবিড় নয়ন-পাতায় চঞ্চল আঁখির তারার মলিন চাওয়া যেন দূরের সবুজ ধোঁয়া। সে কল্পপ্রিয়ার ম্লান গালের লালিম যেন 'রোদ-পাকা আধ-ডাঁশা ডালিম'। এমনি নানারূপ উপমায় কবি তাঁর নাম-হারা প্রিয়ার রূপের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু, এই বধূকে কবি বাস্তবে আপন করে পাননি। 'নিশীথ-রাতের স্বপন'সম সে বধূকে পেয়েও

পাওয়া হয় না। তার সিঁথির বীথি, নাকের নোলক, চূর্ণ কেশ, নাক, ঠোঁট, টোল-খাওয়া চিবুক, নিটোল বুক, পায়ের ভাষা সকল রূপের অনুষঙ্গই কবি এনেছেন। প্রকৃতির পটে এসেছে তার চাউনি, চুড়ি, অশ্রুর তুলনাও। বিধাতা তাঁর নিজের মনের মাধুরি মিশিয়ে নির্মাণ করেছেন প্রকৃতির অপরূপ শোভা আর এদিকে কবিও তাঁর 'মানস-বধূ'কে নির্মাণ করতে গিয়ে প্রকৃতির উপমাই এনেছেন। কারণ বিশুদ্ধ সৌন্দর্য তো প্রকৃতিতে বিদ্যমান এবং তা স্রষ্টার হাতে গড়া, তাই প্রিয়ার রূপবর্ণনে বারবার প্রকৃতির রূপের কাছে ফিরে ফিরে যাবার যেন কোনো বিকল্প নাই:

"দীঘল শ্বাসের বাউল বাজে নাসার সে তার জোড়-বাঁশিতে,
পান্না-ক্ষরা কান্না যেন ঠোঁট-চাপা তার চোর হাসি সে।
ম্লান তার লাল গালের লালিম,
রোদ-পাকা আধ-ডাঁশা ডালিম,
গাগরি ব্যথার ডুবায় কে তার টোল খাওয়া গাল-চিবুক-কুয়ায়।।

চায় যেন সে শরম-শাড়ির ঘোমটা চিরি পাতা ফুঁড়ি,
আধ-ফোঁটা বউ মউল-বউল, বোলতা-ব্যাকুল বকুল কুঁড়ি,
বোল-ভোলা তার কাঁকন চুড়ি
ক্ষীরের ভিতর হিরের ছুরি,
দু-চোখ-ভরা অশ্রু যেন পাকা পিয়াল শালের ঠোঙায়।।"

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ২৮-২৯)

২২.

পথিক-কবি যিনি, ব্যাথাভরা যাঁর মন তাঁকে যে ভালোবেসে আগলে রাখতে চায় তাকে তো তাঁর দহন-জ্বালার ভাগ নিতে হয়। 'মোহন-মালা' দিয়ে দহন-জ্বালা আদৌ নিবে কি প্রিয়া? এই আশঙ্কা প্রতিটা দগ্ধ এবং বিপর্যস্ত মানুষের থাকে। কারণ ভাগ্য যাকে বঞ্চনা করে সে চায় না তার সান্নিধ্যে এসে অন্য কেউও এই বঞ্চনার শিকার হোক। নজরুল ছিলেন 'পথহারা' 'লক্ষ্মীছাড়া', কে তাঁকে দিবে ঘরের মায়া? কে নিবে তাঁর পথের ক্লান্তি, কালিমা,

যন্ত্রণা? নিলেও তো কবি চান না দিতে। যে-বিষ তিনি পান করেছেন তার যন্ত্রণা কেমনে তিনি অন্যকে দিবেন। কিন্তু, মানুষ ব্যথা দেয় আবার মানুষই তো ব্যথা ভুলায়। যে ব্যথা কবি নার্গিসের কাছ থেকে পেয়েছিলেন তার উপশমও আশালতা কাছে পেয়েছিলেন। তবুও সংবেদনশীল মনের মানুষ নিজের দুঃখ-দুর্দশার বোঝা যথা সম্ভব নিজের মধ্যেই রাখতে চায়। চায় না তার ভারে অন্য কেউ ভারাক্রান্ত হোক। এ কবিতায় কবিও চাইছেন তা তেমন:

"লক্ষ্মীমণি! তোমার দিকে চাইতে আমি নারি,
দু'চোখ আমার নয়নজলে পুরে,
বুক ফেটে যায় তবু এ-হার ছিঁড়তে নাহি পারি,
ব্যথাও দিতে নারি, নারী! তাই যেতে চাই দূরে।...
কল্যাণী! হায় কেমনে তোমায় দেব
যে-বিষ পান করেছি নীলের নয়ন-গালা।।"

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৩০)

২৩.

'শেষের গান' এবং 'নিরুদ্দেশ যাত্রী' কবিতার মতো একই বিষয়ের কবিতা 'বিদায়-বেলায়'। এখানেও বিদায়, বিদায়জনিত বেদনা আছে। নজরুলের বিশেষত্ব হচ্ছে তিনি বিদায়ী এবং বিদায়দাতা দুজনের জায়গা থেকেই বেদনাকে দেখেন। শিল্পী তো অনেক সময়ই মনের অলিগলিতে চলমান ঘটনার সর্বজ্ঞ ভাষ্যকার হিসেবেই ভূমিকা পালন করেন, এজন্যই তিনি শিল্পী। পৃথিবীতে পথিক যারা, পরিব্রাজক যারা, ঘুরে ঘুরে বেড়ান যারা পৃথিবীর এ প্রান্তর থেকে ও প্রান্তর তাদের বারবার বিদায় নিতে হয়; বিদায় দিতে হয়। যেকোনো বিদায়ই বেদনার, আমরা ভেতরের চাওয়া থাকে যাদের সাথেই আমরা আত্মার বন্ধনে আবদ্ধ হই তাদের সাথে আমরা মিলেমিশে থাকি, কাছাকাছি থাকি। কিন্তু, অনিবার্য কারণেই তা হয় হয় না। বিয়োগব্যথা যেন প্রাণের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ অনিবার্য বিদায়ে আমাদের মেনে ছাড়া তেমন কিছু করবার না থাকলেও চাওয়া থাকে বিদায়টা যেন হাসিমুখে হয়। বিদায়ের গান গেয়ে জল-ছলছল চোখে বারবার ফিরে তাকাতে তাকাতে যে বিদায় নেয় সে নিজে কেঁদে যায়, সবাইকেও কাঁদিয়ে যায়। তাই সেই দূরের পথিকের প্রতি

বা প্রকারান্তরে নজরুলের নিজেরই হয়তো নিজেকে বলা, 'হাসি দিয়ে যদি লুকালে তোমার সারা জীবনের বেদনা,/ আজো তবে শুধু হেসে যাও, আজ বিদায়ের দিনে কেঁদো না।' যে চলে যায় সে হয়তো জানে না তাকে বিদায় যারা দেয় তাদের বুকেও ব্যথা বাজে, একলা সেই বেদনা পায় না:

"তবে জানো কি তোমার বিদায়-কথায়
কত বুক-ভাঙা গোপন ব্যথায়
আজ কতগুলি প্রাণ কাঁদিছে কোথায়–
পথিক! ওগো অভিমানী দূর-পথিক!
কেহ ভালবাসিল না ভেবে যেন আজো
মিছে ব্যথা পেয়ে যেও না,
ওগো যাবে যাও, তুমি বুকে ব্যথা নিয়ে যেয়ো না।।"

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৩১)

২৪.

এই পথিক-কবিকে কিশোর বেলায় এক প্রিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল। সেই কিশোরী প্রিয়ার 'হারা মায়া' পুরো ভুবন জুড়ে ছড়িয়ে গেছে। কবির সকল পথে সে মায়া ছায়া হয়ে হয়ে দুলে দুলে বেড়ায়, কোথাও স্থির হতে দেয় না তাঁকে। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে যেমন আমরা দেখি বনবিহারী কপালকুণ্ডলাকে সংসারী হতে দেয়নি কাপালিক। অদৃশ্য মায়ার জগৎ তৈরি করে তাকে ঘর থেকে বের করে বিসর্জিত করেছে। তেমনি কিশোর বয়সে বাঁধন-টুটা প্রিয়াও তার ব্যথার নির্দয়তা দিয়ে কবিকে আর স্থির হতে দেয়নি। তার সে বিদায়-রেণুর কাঁদন কবিকে পথে পথে নিয়ে বেড়িয়েছে। এ যেন অধিজাগতিক কোনো চালক যা নীরবে নিশ্চুপে তাড়িয়ে বেড়ায় তাঁকে। মানুষের গহীনে অব্যক্ত এমন কী যেন থাকে, যার তাড়নায় সে নিজের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চালিত হতে থাকে, যেমন হয়েছিল কপালকুণ্ডলার। কবির ক্ষেত্রে সেই অকরুণ পিয়া আড়ালে আড়ালে তাড়িয়ে বেড়ায় কবিকে। কোথাও একটু স্থিতি দেখলে তার মনে ঈর্ষা জাগে। করুণা না পাওয়া সেই প্রিয়াই এখন পালন করে 'অকরুণ-প্রিয়া'র ভূমিকা:

"আমার পিয়াল বনের শ্যামল পিয়ার ঐ বাজে গো বিদায় বাঁশি,
পথ-ঘুরানো সুর হেনে সে আবার হাসে নিদয় হাসি।।

পথিক বলে পথের গেহ
বিলিয়েছিল একটু স্নেহ,
তাই দেখে তার ঈর্ষা-ভরা কান্নাতে চোখ গেল ভাসি।।...
সেই কিশোরীর হারা মায়া
ভুবন ভরে নিল কায়া,
দুলে আজো তারি ছায়া আমার সকল পথে আসি।।"

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৩১-৩২)

২৫.

একাকী সঙ্গীহীন সময়ে বিশেষ করে গভীর নীরব রাতে মানুষের গহীনে লুকানো ব্যথা গুমরে ওঠে। কী কথা স্মরণে এনে কোন অনুভবের মধ্য দিয়ে মানুষকে নিয়ে যায় এমন ঘোরলাগা রাত তা অনেকটা মায়াজালের মতো। বুকে কবে কার 'হতাদর' এসে বেজেছিল, কবে কোন ব্যর্থতাতে গুমরেছিল মন তা ভেসে ওঠে মানসপটে। জীবনের যত ব্যর্থতা ছিল তা এমন একাকী গোপন রাতে চোখের জলের ধারা হয়ে অবিরাম ঝরে ঝরে পড়ে। প্রেম মিলন আর বিরহ দুই নিয়েই, কিন্তু মিলনের সুখের চেয়ে বিরহের বেদনাই তীব্র করে বাজে মনে। এ বিষয়ে গবেষক বলছেন:

> "প্রেমের মধ্যে মিলন ও বিরহ দুই-ই রয়েছে। মিলন ক্ষণিকের, বিরহ অনন্তের। বিরহ রয়েছে বলে প্রেম এত সুন্দর, দুঃখ আছে বলেই সুখের মাহাত্ম্য মানুষ উপলব্ধি করে বেশী করে। কেননা, প্রেমের অমৃত-দীপ-শিখাটিকে আগ্রহের স্নেহরসে প্রোজ্জ্বল করে রাখে এই বিরহ, ভবিষ্যৎ সুখ-সম্ভাবনার একটি গভীরতর আনন্দের প্রেরণাকে জ্বালিয়ে রাখে এই দুঃখ।" (আজহার, ১৯৯৭: ৩৩৫-৩৩৬)

নজরুলে আনন্দের চেয়ে বেদনার দিকটিই বেশি ছিল। আসলে আনন্দের মাঝে তো মানুষ মানুষকে নিবিড় করে খুঁজে পায় না। দুঃখেই মানুষ অবসর পায়, নিজেকে দেখবার এবং জানবার সুযোগ পায়। তাই যে রাত 'ব্যথা-নিশীথ' হয়ে আসে সে রাতে মনে পড়ে কোন বিশেষ দিনের বিশেষ ক্ষণের স্মৃতি। দিনমানে মানুষের মাঝে বেদনাবারি লুকানো গেলেও একলা নিশীথে আর লুকিয়ে রাখা যায় না:

"মম ব্যর্থ জীবন-বেদনা
এই নিশীথে লুকাতে নারি।
তাই গোপনে একাকী শয়নে
শুধু নয়নে উথলে বারি।
ছিল সেদিনো এমনি নিশা
বুকে জেগেছিল শত তৃষা,
তারি ব্যর্থ নিশাস মিশা
ওই শিথিল শেফালিকাতে
আর পূরবীর বেদনাতে।।"

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৩২)

২৬.

'জীবন-রসের রসিক কবি নজরুল প্রকৃতি-প্রেমেও মাঝে মাঝে স্বপ্নমদির বিহ্বলতা যে অনুভব করেছেন তার স্বাক্ষর তাঁর কাব্যের মধ্যেই চিহ্নিত হয়ে আছে।' কবির ব্যর্থ চাওয়ার নিশ্বাস যেমন শিথিল শেফালিকাতে মেশে তেমনি তাঁর প্রিয়াহারা একাকীত্বের সাথে অনায়াসে মিলিয়ে ফেলেন একাকী সন্ধ্যাতারাকে। প্রকৃতির সাথে নিজের অনুভবকে মেলানো বা প্রকৃতিকে অনুভবের দোসর বানানো বিশেষ নজরুলীয় বৈশিষ্ট্য। একাকী সন্ধ্যাতারা আমরা কমবেশি দেখে থাকি, কিন্তু তাকে গৃহস্তবাড়ির ঘোমটা-পরা বউ বলে তো মনে হয় না। কার হারিয়ে যাওয়া বধূ অমন মৌন মুখে সাঁঝের প্রদীপ জ্বেলে বসে থাকে। এ যেন অপেক্ষমাণ কবির মনেরই প্রতীকী প্রকাশ। গৃহহীনের বুকে এমন ঘরের মায়া জাগানো সন্ধ্যাতারার কাছে কবির জিজ্ঞাসা:

"কার হারানো বধূ তুমি অস্তপথে মৌন মুখে
ঘনাও সাঁঝে ঘরের মায়া গৃহহীনের শূন্য বুকে।
এই যে নিতুই আসা-যাওয়া
এমন করুণ মলিন চাওয়া,
কার তরে হায় আকাশ-বধূ
তুমিও কি প্রিয়-হারা।।"

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৩৩)

২৭.

যে 'অকরুণ পিয়া'র না পাবার বেদনা সদাই পথে পথে নজরুলকে নিয়ে বেড়ায় সেই বেদনাই আবার হয়তো 'দূরের বন্ধু' হয়ে এসেছে। দুটি কবিতার মূল বক্তব্য একই। নজরুলের পথে পথে বেড়ানোর কারণ হিসেবে এই কারণটির দেখা পেয়েছেন মন-মাঝে। সেই দূরের বন্ধু 'ব্যথার-সুরে' ডাক দিয়ে বারবার তাঁর পথের বাসা ভেঙে দূর থেকে সুদূরের নিজন-পুরে নিয়ে যায়। এমন শব্দহীন ডাক যারা শুনতে পায় তারাই কালে কালে পরিব্রাজক হয়েছে, অভিযাত্রীক হয়েছে। সেই অজানা 'বাঁশির উদাস কাঁদন' 'সকল বাঁধন' ছিন্ন করে নিয়ে যায় পথ থেকে পথে। একটু থামতে চাইলে তার বুকে ব্যথা লাগে, হিংসা জাগে; দূর দূরান্তে ছুটিয়ে নিয়ে যাওয়াতেই যেন সে বন্ধুর সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথের 'মানস সুন্দরী' যেমন তাঁর সকল কাজে, কাব্যে-লেখায় এসে প্রেরণা দিয়েছে, তেমনি নজরুলের আছে অকরুণ প্রিয়া এবং দূরের বন্ধু। সে তাঁকে তার নির্দেশিত পথে নিয়ে বেড়ায়। মনে হয় কোন এক অলীক মায়ার জগতের হাতছানি দিয়ে দিয়ে সে চলমান রাখে কবিকে, স্থির হতে দেয় না। কবি বলছেন:

"হে মোর প্রিয়! তোমার বুকে একটুকুতেই হিংসা জাগে,
তাই তো পথে হয় না থামা–তোমার ব্যথা বক্ষে লাগে!

বাঁধতে বাসা পথের পাশে
তোমার চোখে কান্না আসে,

উত্তরী বায় ভেজা ঘাসে
শ্বাস ওঠে আর নয়ন ঝুরে,
বন্ধু তোমার সুরে সুরে।।"

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৩৪)

২৮.

এই যে ছুটে চলেন কবি, তাঁকে যে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় মনের মাঝে একটা 'আশা' পুষে রাখেন যে তাঁর সেই প্রিয়ার দেখা হয়তো পাবেন তিনি চলতে চলতে। যতক্ষণ শ্বাস থাকে ততক্ষণ একটা আশা রাখে মানুষ। আশা রাখা ছাড়া প্রেরণাহীন হয়ে চলার শক্তি পাওয়া যায় না। কবি আশা রাখেন ওই যে দিগন্তে আকাশ ছুঁয়েছে বনের রেখা সেখানেই পাবেন তিনি প্রিয়ার দেখা। কিন্তু দিগন্ত যেমন আকাশ ছোঁয়নি কোথাও প্রিয়ার দেখাও কবি পাননা কোথাও। সেটা আমরা তাঁর পরবর্তীতে লেখা কবিতাগুলো দেখলেই বুঝতে পারি। এ কবিতায় গোপন-দূতী দক্ষিণ হাওয়া খবর এনেছে প্রিয়া-মিলনেরবআর দিগ্বলয়ের অরুণ-লেখায় লেখা আছে প্রিয়ার আসন্ন চুম্বনের কথা। এ প্রেরণা নিয়েই নজরুল একাকী হেঁটে চলেন দিগন্তে, হয়তো:

"ঐ সুদূরের গাঁয়ের মাঠে,
আলোর পথে, বিজন ঘাটে;
হয়তো এসে মুচকি হেসে
ধরবে আমার হাতটি একা।।
ঐ নীলের ঐ গহন-পারে ঘোমটা-হারা তোমার চাওয়া,
আনলে খবর গোপন-দূতী দিক-পারের ঐ দখিন হাওয়া।"

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৩৪)

২৯.

পারস্য সাহিত্যের গল্প-কাহিনি থেকে আমরা জানি প্রেমিক-প্রেমিকার একাত্মতা। তারা যেন দুই দেহে এক আত্মা। লাইলী-মজনু আখ্যানে লাইলীকে আঘাত করা হলে সে আঘাতে মজনুও জর্জরিত হয়ে যায়, মানসিক এবং শারীরিক উভয় ভাবেই। প্রেমে-ধ্যানে-সাধনায় মানুষ যখন একাত্ম হয়ে যায় তখনই এমন অনুভব সম্ভব। এ ধরনের কবিতায়

স্পষ্টত সুফি ভাবধারার প্রভাব রয়েছে। মরমী প্রিয়ার মরম-ব্যথা বেদনা হানে প্রিয়র বুকেও। কবির কাঁদনও যে প্রিয়ার ডাগর চোখে অশ্রু হানে তা তিনি প্রাণের টানে বুঝে যান। বহির্প্রকৃতিতে যখন উদাস বায়ু ধানের ক্ষেতে সাঁঝের মায়া ঘনায় তখন দুজনারই নয়ন-পাতায় কাজল-ছায়া ঘনায়। বহির্প্রকৃতির পরিবেশের সাথে কবির অনুভব আর তাঁর প্রেমাষ্পদের অনুভব একাত্ম হয়ে গিয়েছে। দুটি মন যেন পদ্মে বসা বদ্ধ ভ্রমরের মতো, তাদের এহেন বেদনা পুবের বায়ুর হুতাশ তানে সাঁঝের গানে বাজে। প্রকৃতি যেন দ্বৈত মনের অনুভবের যুগলবন্ধনের কাজ করছে। বাইরে থেকে মনকে যতই বেঁধে রাখা হোক প্রেমাষ্পদের মরমে গিয়ে সে আঘাত পৌঁছে। 'মরমী' প্রেম সাধনায়ই কেবল এমন অনুভব সম্ভব, নজরুল দেহজ প্রেমের কবি হলেও তাঁর প্রেম কোথাও কোথাও দেহের সংকীর্ণ সীমাকে অতিক্রম করে গিয়েছে, হয়ে উঠেছে মরমের সঙ্গী:

"বাইরে বাঁধি মনকে যত
ততই বাড়ে মর্ম-ক্ষত
মোর যে ক্ষত ব্যথার মতো
বাজে গিয়ে তারও প্রাণে,
কে কয়ে যায় হিয়ার কানে।।"

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৩৫)

৩০.

দীর্ঘ সময় পর যখন প্রিয়-অভিসারে যায় যখন মানুষ তখন তসর আবেগ বাঁধ-ভাঙা উচ্ছলতা পায়। নজরুল বেশ কয়েকবার কারাবরণ করেছেন। কারা থেকে মুক্তিলাভের পরের প্রিয়াভিসারের অনুভূতিই কি এ কবিতায় রূপ লাভ করেছে? দীর্ঘ বিরতির পর এমন প্রিয়-সাক্ষাতে প্রাণ পাখা মেলে, মলিন মুখে হাসি ফোটে, মুক্ত হাওয়া বয় চারিধারে, কথায়-গানে রাত্রি হয় ভোর। বিচ্ছেদ আছে বলেই মিলন এতো সুন্দর। বিরহে প্রেমের আরো ঘনত্ব বাড়ে, গভীরতা বাড়ে। দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর এমন 'মুক্তি-বার' যখন আসে তখন কত জমানো কথা ঝর্ণা হয়ে নেমে আসে, কত জমানো অনুভূতিরা প্রাণ পায়। নজরুলের মতোই বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জীবনের দীর্ঘ সময়

কারাবরণ করেছিলেন। তাঁর লেখা বই 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' এবং 'কারাগারের রোজনামচা' পড়ে আমরা বুঝতে পারি পারি কারামুক্তির অনুভূতি। দীর্ঘ অদর্শনের পর স্ত্রী, সন্তান, পিতা-মাতাসহ অন্যান্য শুভাকাঙ্ক্ষীরা কী পরিমাণ আপ্লুত হয়। এই অনুভূতিরই নান্দনিক শৈল্পিক প্রকাশ নজরুল এ কবিতায় করেছেন:

"দিনের পরে দিন গিয়েছে, হয়নি আমার ছুটি,
বুকের ভিতর মৌন-কাঁদন পড়ত বৃথাই লুটি।
আজ পেয়েছি মুক্ত হাওয়া,
লাগল চোখে তোমার চাওয়া,
তাই তো প্রাণে বাঁধ টুটেছে রুদ্ধ কবিতার।।

তোমার তরে বুকের তলায়
অনেক দিনের অনেক কথা জমা,
কানের কাছে মুখটি থুয়ে
গোপন সে সব কইব প্রিয়তমা।
এবার শুধু কথায়-গানে রাত্রি হবে ভোর,
শুকতারাতে কাঁপবে তোমার নয়ন-পাতার লোর।"

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৩৬)

৩১.

মানুষ যখন অন্যকে (মানুষ /অন্যপ্রাণ) ভালোবাসে তখন সে আগে নিজেকে ভালোবাসে। নিজের কাছে, নিজের মধ্যে যে যত বেশি মনোরম থাকে সে অপরকে তত বেশি স্নিগ্ধতার সাথে গ্রহণ করতে পারে। আমাদের যে ব্যাকুল ভালোবাসা অন্যকে ঘিরে প্রকাশিত হয় তা আগে আমাদের মধ্যেই তৈরি হয়। আমাদের অন্তর্নিহিত সত্তার পূর্ণতার জন্য আমরা বাইরে সদাই কাউকে খুঁজে ফিরি। আমাদের মানসলোকে তৈরি প্রতিমার সাথে, আমাদের মনের প্রোথিত ধারণার সাথে যে মিলে যায় তাকে আশ্রয় করে প্রকাশিত হয় আমাদের আবেগ। বাইরে থেকে আমাদের যা দেখা যায় তা হলো আমাদেরই চেতনার আকাশে, মনের প্রান্তরে, হৃদয়ের ভূমিতে আমরা যা বপন করি, লালন করি, পরিচর্যা করি তা। সে

জন্যই আপনার চেয়ে আপন জনকে আমাদের আপনাতেই খুঁজে ফেরা। সে জনের চরণের ধ্বনি শোনা আমাদেরই তিয়াসী বাসনায়। আমাদের মনেরই তৃষ্ণার্ত আকাশে সে চাতকের পিয়াসা অনুভব করি, মনের পিয়াল তমালে তার স্নেহ-মেঘ-শ্যাম অনুভব করি। আমাদের প্রিয়/প্রিয়া সে আমাদেরই মনের ছবি। যতখানি স্নেহসুধা কেউ অপরকে দেয় ততখানি সে আগে নিজেকে দেয়। যে দয়া মানুষ অপরকে করে সে দয়া আগে তার ভেতরে তৈরি হয়, লালিত হয়; তারপরেই তা অন্যে পায়, তাই প্রিয়াকে পরানো মালা কবি নিজের গলায়ই দেখতে পান:

"আমারই রচিত কাননে বসিয়া
পরানু পিয়ারে মালিকা রচিয়া,
সে মালা সহসা দেখিনু জাগিয়া,
আপনারি গলে দোলে হায়।।"

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৩৭)

৩২.

'মনের মানুষ', 'অ-নামিকা', 'মানস সুন্দরী', ' বাড়ির পাশের পড়শি' ইত্যাদি রূপকে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, লালন প্রমুখেরা যাকে খুঁজে ফিরেছেন সেই 'সুন্দর সন্ন্যাসী'ই নজরুলকে করেছে 'পথের ভিখারিনী'। জগৎপ্লাবিত স্রষ্টাপ্রেমে যখন উদাসী মন মজে যায় তখন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই নারী ভাবেই ভাবিত হয়। তাই এখানে কবি 'ভিখারিণী' আর সে 'নাথ'। সেই প্রেম মহাযোগীকে, সেই নাথকে দেখতে হয় অনন্ত বিশ্বলোকের মাঝে। একলা ঘরের ক্ষীণ দীপালোকে, ক্ষুদ্র গণ্ডির মাঝে, স্বার্থের সীমার মাঝে, সংকীর্ণ দৃষ্টির মাঝে সেই মহান জন হীন হয়ে পড়েন। বাইরের আলোকে বিপুল বিশ্বপ্রাণ মাঝে তার অবারিত বিস্ময় নিয়ে সে বিরাজমান থাকে। অন্তরলোকের এ দুয়ার খোলে, এ দৃষ্টি উন্মোচিত হয় একমাত্র দুঃখের পরশে, বেদনার আঘাতে। নজরুল বেদনার আঘাতে বিশ্ব দেখেছিলেন তাই তার বুকে বাজে সেই সুন্দর সন্ন্যাসীর অশুভ রূপ। এই সুন্দর সন্ন্যাসী অধরা থেকে যায় নিয়তই। 'তারে ধরি ধরি মনে করি ধরতে গেলে ধরা দেয় না' তাই তার প্রেম লাগি নিখিল বিশ্ব বিবাগী পরবাসী:

"তব প্রেমরাঙা ভাঙা জোছনা
হেরো শিশির-অশ্রু-লোচনা,

ঐ চলিয়াছে কাঁদি বরষার নদী গৈরিকরাঙা-বসনা।
ওগো প্রেম-মহাযোগী, তব প্রেম লাগি নিখিল বিবাগি পরবাসী!
ওগো সুন্দর সন্ন্যাসী।"

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৩৭)

৩৩.

পাশের কারো প্রতি হালকা অনুরাগ সঞ্চারিত হলে সহসা হয়তো তার তীব্রতা অনুভব করা যায় না। বাতাসের মধ্যে বসবাস করে আমরা যেমন বাতাসের অস্তিত্ব বুঝি না তেমনি সর্বক্ষণের সঙ্গীকেও হয়তো আমরা আলাদা তাৎপর্যে অনুভব করি না, করি তার অনুপস্থিতিতে। তেমনই এক আবেগের প্রকাশ এ কবিতায়। কবি দেওঘরে অবস্থানকালীন একটি চপল-চঞ্চল মেয়ের প্রতি তাঁর যে অনুভব তা তিনি এ কবিতায় প্রকাশ করেছেন। কেউ কখনো কথা না বললেও নিবিড় নীরবতায় মনের মাঝে গোপন মরম-বীণা বেজে যেত। প্রতিবেশি সেই মেয়েটি যখন দ্বারের কাছ দিয়ে যেত:

"আমার দ্বারের কাছটিতে তার ফুটত লালী গালের টোলে,
টলত চরণ, চাউনি বিবশ, কাঁপত নয়ন-পাতার কোলে –
কুঁড়ি যেমন প্রথম খোলো গো!"

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৩৮)

৩৪.

'অভিসার' শব্দটি শুনলেই আমাদের মনে ভেসে ওঠে রাধাভিসারের চিত্র। কৃষ্ণের প্রেমে মত্ত রাধা কিভাবে দিন এবং রাত্রির বিভিন্ন ভাগে লোকচক্ষুর আড়ালে প্রিয় সান্নিধ্যের জন্য যেতেন বা যাবার চেষ্টা করতেন তা আমরা 'পদাবলী'র বিভিন্ন পদে, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' এবং অন্যান্য জায়গাতেও দেখেছি। 'চর্যাপদে'ও এসেছে দিনের বেলায় যে বউ কাকের ভয় পায় সে কিভাবে রাত্রিতে কামরূ যায়। অভিসার আর প্রেম অবিচ্ছেদ্য অংশ। মনে যখন প্রেম সাড়া ফেলে যায় তখন মানুষ নানা ছলে প্রেমাস্পদের সান্নিধ্য পেতে চায়। গবেষকের মন্তব্য:

"'দুপুর-অভিসার' কবিতাটিতে প্রেমের চাপল্য ও অস্থিরতা সূক্ষ্মরেখায় অঙ্কিত। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিভিন্ন সময়ে রাধার অভিসারকে নিয়ে কবিতা আছে। দুপুর-অভিসারের পরিকল্পনায় নজরুল বৈষ্ণবসাহিত্যের অভিসারমূলক কবিতার দ্বারা প্রণোদিত হয়েছিলেন বলে মনে হয়। তবে এখানে প্রাকৃত প্রেম মানবিক দুর্বলতায় চপল ও রসরসিকতায় চটুল। প্রকৃতির সঙ্গে প্রেমের এই আন্তরিকতা ভারতীয় ঐতিহ্যলব্ধ।" (সুশীলকুমার, ১৯৯৭, ১৫৪)

এ কবিতাতে নজরুল দেখাচ্ছেন এক কিশোরীকে যে সাঁঝ ভেবে দুপুর বেলাতেই জল আনার ছলে কলস কাঁখে না নিয়েই ঘাটে চলছে। একা একা প্রিয়-পরশে আকুল কিশোরীকে কবি 'হাবা ছুঁড়ি' বলেছেন। নজরুল তাঁর প্রেমে নায়িকা বা প্রেমিকা বা মেয়েদের কখনো আক্রমণ করেছেন, কখনো সহমর্মিতা দিয়ে দেখেছেন। বৈষ্ণবীয় ঢংয়ে নারী ভাবে তিনি নিজেই ভাবিত হয়েছেন কখনো। কবিতার 'অফুট জবা চাঁপা-কুঁড়ি'সম এ বালিকার রাঙা রূপে দিগ্বলয় রঙ ছড়িয়ে যায়। প্রকৃতির বিভিন্ন অনুষঙ্গের মাঝে এ প্রেমকে কবি ছড়িয়ে দিয়েছেন। দুপুর বেলায় ব্যাকুল বালিকা অভিসারে গেলেও কাঙ্ক্ষিত মিলনের পথে যে বাঁধা তা তিনি দেখিয়েছেন:

"পলাশ অশোক শিমূল-ডালে
বুলাস কি লো হিঙুল গালে তোর?
আ – আ মলো যা! তাইতে হা দ্যাখ,
শ্যাম চুমু খায় সব সে কুসুম লালে
পাগলি মেয়ে! রাগলি নাকি? ছি ছি দুপুর-কালে
বল কেমনে দিবি সরস অধর-পরশ সই তাকে?"

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৩৯)

৩৫

প্রিয়দর্শন বা প্রিয় সান্নিধ্য পাবার আশায় ছলনার আশ্রয় নেয়া মানব সহজাত প্রবৃত্তি। কত ছলনায় প্রিয়কে একটু দেখা যায়, একটু প্রিয় পরশ পাওয়া যায় তার অন্ত রাখে না কেউ। বিনা-কাজের কাজের ছলে, কতশত অজুহাতে অভিলাষ সিদ্ধ করে প্রেমিমন। কবির মায়ায় আচ্ছন্ন এক 'ছল-কুমারী'র এমনই অবস্থা। তারই বা কী করবার আছে বারংবার

আসা-যাওয়া করা ছাড়া। শিথিল বেণীর দুষ্টু কাটা যে কবির দুয়ারেই হারায়। এছাড়া পরোক্ষভাবে কথা শোনানো বা নিজের মনের বার্তা পৌঁছে দেয়া তা সে মন্দ অভিপ্রায়ে হোক বা ভালো অভিপ্রায়ে হোক, সর্বক্ষেত্রে যেমন চলে; প্রেমেও চলে:

"একে ওকে ডাকার ভানে
আনমনা মোর মনটি টানে,
কী যে কথা সেই তা জানে
ছল-কুমারী নানান ছলে আমারে সে জানায়।"

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৪০)

৩৬.

'ছল-কুমারী'র উচ্ছল ঠোঁট, লাজ-রাঙা অঙ্গ, রেশমি চুড়ির শিঞ্জিনী মনে পিয়াস জাগিয়েছিল পরদেশী কবির। এ ছল-কুমারী কন্যার শূন্য হিয়াতে সঞ্চারিত হয়েছিল কবির বেদনা। এ কন্যার মন-রাঙানো শরীর-সৌন্দর্যের বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। নজরুলের নায়িকারা সবাই পৃথিবীর রক্তমাংসের মানুষ। রেশমি চুড়ির শিঞ্জিনী, কাখ-চুমা কলসী-ঠোঁট, অঙ্গে নিলাজ পুলক, এ যেন সর্বকালের গাঁয়ের পথের বিচরিত কন্যার ছবি। দুঃখ সর্বব্যাপী, বেদনাই সর্ববিস্তারী; আনন্দ নয়। তাই পথবালা এই উর্বশীর মনে পরদেশী কবির ব্যথা হয়েছিল সঞ্চারিত, সে ব্যথার কথাই তিনি বলেছেন 'পাপড়ি খোলা' শিরোনামের কবিতায়:

"শূন্য তাহার কন্যা-হিয়া
ভরল বধূর বেদন নিয়া,
জাগিয়ে গেল পরদেশিয়া
বিধুর বধূর মধুর ব্যথা।"

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৪১)

৩৭.

বেদনাহত, ভারাক্রান্ত প্রিয়া মলিন বদনে প্রিয় আশে যখন প্রতীক্ষমাণ তখন প্রকৃতির বিভিন্ন অনুষঙ্গ তার কাছে কেমন বলে প্রতীয়মান হয়:

"স্বর শুনে কার চমকে ওঠ? আ-হা!
ওলো ও যে বিহগ-বেহাগ নির্ঝরিণীর কল-কল।

ও নয় লো তার পায়ের ভাষা, আ-হা,
শীতের শেষের ঝরা-পাতার বিদায় ধ্বনি ও,"

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৪২)

সুপারি গাছের চিকন পাতায় বাদল-চাঁদের মেঘলা মায়াকে চির-চেনার চপল হাসির আলো-ছায়া বলে বোধ হয়। এই সুপারি গাছ নিয়েই 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি' নামে দীর্ঘ কবিতা তিনি লিখেছেন। কবিতাটির বয়ান ভঙ্গি ব্যতিক্রম, এ ভঙ্গিতে পাঠকের মানসপটে এক বিরহকাতর উদাসিনী বালিকার ছবি অঙ্কিত হয় আর সে বালিকার শব্দহীন বিভিন্ন অভিব্যক্তির সাথে যেন কথোপকথনে রত কবিতার সখি কণ্ঠস্বরটি। 'পথিক-পূজারিণী' এই বালিকাকে সান্ত্বনার পরশ বুলাচ্ছেন কবিতাকণ্ঠের ব্যক্তিটি। বেদনাবিধুর প্রেমিক মনের কাছে প্রকৃতির বিভিন্ন অনুষঙ্গ (মেঘ, বিহগ-বেহাগ, নির্ঝরিণী, শীতের ঝরাপাতা, গুবাক তরুর চিকন পাতা, বাদল-চাঁদের মেঘলা মায়া, সবুজ দেশ) একাকার হয়ে যায়।

৩৮.

অনেক ব্যথার ভ্রমণ শেষে, অনেক হেলা-অবহেলার পরে যে মনের মানুষ পায়, ব্যথার ব্যথী পায়, পরানের দোসর পায় তার অনুভূতি 'মনের মানুষ' কবিতার মতোই হয়। সুন্দরের পূজারী বা জীবনের সুসময়ের দুধের মাছি সর্বত্রই মেলে, কিন্তু ভালো-মন্দ সকল মিলায়ে, অসীম ক্ষমায় আর নিগূঢ় সোহাগে ক'জন টেনে নেয়!? যেজন নেয় সেজন বিশেষ তাৎপর্য বহন করে জীবন-স্মৃতির মাঝখানের উচ্চাসনে আসীন থাকে। বিরহী, বেদনাহত, সংবেদনশীল মনের নজরুল তো ব্যথা কম পাননি; এই ব্যথা দেবার কোলাহলে

সবাই যখন 'হেলায় ঠেলে পায়ে', 'সকল সুধাটুকুন পিয়ে' নিঃস্ব করে দেয় তখন কেউ যখন এসে বুকে তুলে নেয়, সকল ব্যথা ভুলিয়ে দেয়, তখনকার অনুভবকে কবি এমনই ভাষা দিয়েছেন:

"আমার যত কলঙ্কে সে
হেসে বরণ করলে এসে
আহা বুক-জুড়ানো এমন ভালো কেউ কি বেসেছিল?
ওগো জানত কে যে মনের মানুষ সবার শেষে ছিল।"

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৪৩)

৩৯.

'প্রিয়ার রূপ' কবিতায় প্রিয়ার দেহজ রূপ-বর্ণনা পাওয়া যায়। খানিকটা 'দোদুল দুল' কবিতার মতো এ কবিতার প্রকাশভঙ্গি। প্রিয়ার রূপের বিস্তৃত বর্ণনায় নজরুল অবশ্যই শরণাপন্ন হয়েছেন প্রকৃতির রূপের। সৃষ্টিকর্তা মানুষ ব্যতীত প্রকৃতির আর সকল সৃষ্টির মধ্যেই অবারিত রঙের ছড়াছড়ি দেখিয়েছেন। ফুল-পাখি-প্রজাপতিদের কী দৃষ্টিনন্দন রূপ! কী মনোহর রঙ! মানুষ তাই সর্বদাই প্রকৃতির রঙে নিজেকে সাজাতে চেয়েছে, প্রকৃতির সৌন্দর্যের সাথে মিলিয়ে নিতে চেয়েছে মানবসৌন্দর্যকে। নজরুলের ভাষায়:

"আনার লাল লাল
দানার তার গাল,
তিলের দাগ তায় ভোমর;
কপোল-কোল ছায়
চপল টোল, তায়
নীলের রাগ ভায় চুমোর।।"

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৪৪)

৪০.

বৃষ্টির দিনের ব্যাকুল মনের প্রকাশ কবি 'বাদল-দিনে' কবিতায় করেছেন। ডর-ডর দেহ, ঢল-ঢল আঁখি, ছম-ছম গা, ব্যথা-ভরা আঁখি দর-দর বাদরের সাথে একাত্ম। এ যেন

বিদ্যাপতির পদাবলীর অনুরণন। 'ব্যাকুল বন-রাজি হাসিছে ক্ষণে ক্ষণে,/ সজনি! মন আজি গুমরে মনে মনে।' প্রায় সকল গীতি কবিই বর্ষা বন্দনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'আজি ঝর ঝর মুখর বাদর দিনে...', বিদ্যাপতির 'হে সখি, হামারি দুখের নাহি ওর...' উল্লেখযোগ্য। বাদল-দিনের সাথে মানবমনের বিরহের একটা ওতপ্রোত সম্পর্ক বিদ্যমান। বৃষ্টির রিমিঝিমি শীতল ধারা মনকে উদাস করে, মনে প্রিয় সান্নিধ্যের তৃষ্ণা জাগিয়ে তোলে। বিদ্যাপতিতে 'কান্ত পাহুন' নজরুলে 'বিদেশে প্রিয়তম'। আর সেই বিদেশী প্রিয়তম বিহনে ঘোরতর বর্ষার দিনে প্রিয়মনের বেদনায় প্রকৃতি একাত্ম হয়েছে:

"জলদ-দামা বাজে জলদে তালে তালে
কাজরি-নাচা নাচে ময়ূর ডালে ডালে।
শ্যামল মুখ স্মরি
সখিয়া বুক মোরি
উঠিছে ব্যথা ভরি
আঁখিয়া ভরভর।
বিজুরি হানে ছুরি চমকি রহি রহি
বিধুরা একা ঝুরি বেদনা কারে কহি।
সুরভি কেয়া-ফুলে
এ হৃদি বেয়াকুলে,
কাঁদিছে দুলে দুলে
বনানী মর-মর।"
(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৪৫-৪৬)

৪১.

বাঁশির সুরে প্রিয়াকে আহ্বান করা বাংলা সাহিত্যের এবং বাঙালি জীবনের প্রাচীনতম অনুষঙ্গ। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম কাহিনিতে কৃষ্ণের একমাত্র হাতিয়ার ছিলো বাঁশি। এ প্রসঙ্গ নিয়ে অনেক গান-কবিতা লিখিত হয়েছে বাংলা সাহিত্যে। জসীমউদ্দিনের আবহমান

গ্রামীণ গাঁথায় তিনিও তাঁর রাখাল বালকদের হাতে তুলে দিয়েছেন বাঁশি। বাঁশির সুর তো প্রাণেরই অনুরণন। প্রাণের কথা, ব্যথা, আকুলতা সুর হয়ে সঞ্চারিত হয় শ্রোতার মাঝে। নদী-পারে নীপে নীপে শিহরণ জাগানো বাঁশিতে ঘর ছেড়েছিল রাধা। কালে কালে সকল রাধামনই বিচলিত হয়েছে এ বাঁশির সুরে। নজরুলের সমকালে জসীমউদ্দিন লিখেছেন, 'প্রাণ সখিরে, ঐ শোন কদম্বতলে বংশী বাজায় কে?...' সখার বাঁশি সখির মনে ভাবের সঞ্চার করে, শিহরণ জাগায়। কিন্তু, জগৎপ্রেমিকের বিশ্ববাঁশির সুর যখন আহ্বান করে তখন নর-নারী নির্বিশেষে সকলের মাঝেই 'নারী-হিয়া' জাগ্রত হয়। অব্যক্তে ব্যক্ত করা বাঁশির সুরডাকে মন তার সদাই যাই যাই করে। না যেতে পারার/ না-যাবার আফসোসও থেকে যায়:

"মম নারী-হিয়া মাঝে
কেন এত ব্যথা বাজে?
কেন ফিরে এনু লাজে
নাহি দিয়ে যা ছিল?
যাচা-প্রাণ নিয়ে আমি কেমনে সে বাঁচি লো?
কেঁদে কেঁদে আজি লো কার বাঁশি বাজিল?"

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৪৭)

৪২.

বিশুদ্ধ প্রকৃতির পটের কবিতা 'অ-কেজোর গান'। কবি মন-মৌমাছি আজ মেতে উঠেছে ঘাসের ফুলে মটর-শুটির ক্ষেতে। প্রেমমধু আহরণে প্রেমিককে অনেক সময়ই ভ্রমরের সাথে তুলনা করা হয়। এ কবিতাতেও কবিমন রোদ-সোহাগী পউষের সকালে কুঁড়িতে কুঁড়িতে ঘুরে বেড়ান ফুলের মধু খেতে। 'মরা নদীর কূলে' দিয়ে নজরুল হয়তো তাঁরই অবসাদগ্রস্ত, নিস্তরঙ্গ মনের কথা বলেছেন। আমন ধানের বিদায় নেওয়া রাতে তিনি কাশবনে শ্বাস ফেলে যাওয়া প্রেয়সীর পরশ পেতে চলেছেন। বাবলা ফুলের নাকছাবি তার, গায়ে নীল অপরাজিতার শাড়ি, পথ চলতে হলুদ আঁচল জড়িয়ে যায় অড়হরের ফুলে:

"আজ কাশ-বনে কে শ্বাস ফেলে যায় মরা নদীর কূলে,

ও তার হলদে আঁচল চ'লতে জড়ায় অড়হরের ফুলে!
বাবলা ফুলের নাকছবি তার,
গায় শাড়ি নীল অপরাজিতার,
চলেছি সেই অজানিতার
উদাস পরশ পেতে।।
আমায় ডেকেছে সে চোখ-ইশারায় পথে যেতে যেতে।।
ঐ ঘাসের ফুলে মটরশুটির ক্ষেতে
আমার এ-মন-মৌমাছি ভাই উঠেছে তাই মেতে।।"

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৪৮)

৪৩.

'স্তব্ধ বাদল' কবিতায় প্রকৃতির মধ্যে বেদনার সঞ্চার দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন লিখেছিলেন 'আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,/ চুনি উঠল রাঙা হয়ে।/ আমি চোখ মেললুম আকাশে,/ জ্বলে উঠল আলো/ পুবে পশ্চিমে।/ গোলাপের দিকে চেয়ে/ বললুম "সুন্দর',/ সুন্দর হল সে।' — এমনই ভাবে ব্যক্তির চেতনা, বেদনা সঞ্চারিত হয় দিকে দিকে; পৃথিবী হয়ে ওঠে তারই চেতনারই রঙে রঙিন অথবা মলিন। কারো চোখের জলের বেদনায় ভেসে দিগন্তে ছড়িয়েছে নীল আবছায়া। তার বেদনাই ভরেছে দিকে। সেই ব্যথিত ব্যক্তিসত্তাকে নজরুল রূপ দিয়েছেন:

"ঐ তমাল তালের বুকের কাছে
ব্যথিত কে দাঁড়িয়ে আছে,
দাঁড়িয়ে আছে!
ভেজা পাতায় ওই কাঁপে তার

যার শীতল হাতের পুলক-ছোঁয়ায়
কদম-কলি শিউরে ওঠে,
জুই-কুঁড়ি সব নেতিয়ে পড়ে
কেয়া-বধূর ঘোমটা টুটে।"

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৪৮)

৪৪.

'চাঁদ-মুকুর' আরেকটি প্রকৃতি-অবলম্বী কবিতা। প্রিয়ার রূপ আর সে রূপের প্রেমের বিরহাতুর ব্যথা এ কবিতায় প্রকাশিত। প্রিয়া-প্রেমের যে ব্যাকুলতা সে ব্যাকুলতা প্রকাশ করতে নজরুল বরাবরই তৃষ্ণার্ত চকোরীর রূপক এনেছেন। রাত জেগে জেগে চাঁদের আলোর লাগি আকুল চকোর যেন আকুল কবিপ্রাণের রূপ, আর এই আকুলতার মাঝেই প্রকাশ পেয়েছে আবহমান মানবহৃদয়ের আকুলতা:

"চাঁদ হেরিতেছে চাঁদমুখ তার সরসীর আরশিতে।
ছুটে তরঙ্গ বাসনাভঙ্গ সে অঙ্গ পরশিতে।

হেরিছে রজনি রজনি জাগিয়া
চকোর উতলা চাঁদের লাগিয়া,
কাঁহা পিউ কাঁহা ডাকিছে পাপিয়া
কুমুদীরে কাঁদাইতে।"

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৪৯)

৪৫.

নামহারা নদীর কিনারের বনের পানে বেতস-বেণুর বনে যে বীণা বাজায় কবিকে তাঁর চির চেনা লাগে। এখানেও যেন কৃষ্ণের বাঁশির তানে রাধামনের উচাটন ভাব লক্ষ করা যায়। সেই সুরে বিরহী মন যেমন ব্যাকুল হয়, সেই ব্যাকুলতা ছড়িয়ে পড়ে আকাশে, বাতাসে, লতায় পাতায়; ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র:

"ফাগুন-মাঠে শিস দিয়ে যায় উদাসী তার সুর,
শিউরে ওঠে আমের মুকুল ব্যথায় ভারাতুর।
সে সুর কাঁপে উতল হাওয়ায়,
কিশলয়ের কচি চাওয়ায়,
সে চায় ইশারায় অস্তাচলের প্রাসাদ-মিনারে।
আমি কাঁদি, এই তো আমার চিরচেনা রে।"

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৫০)

৪৬.

'পাহাড়ী গান' কবিতাটি প্রেমের কবিতা না হলেও প্রকৃতির অনুষঙ্গে ভরপুর। নজরুলের বল্গাহীন রোমান্টিকতা একমাত্র অবাধ, অসীম প্রকৃতির রূপকেই প্রকাশ করা সম্ভব। তাই এ কবিতায় নজরুলের টগবগে তারুণ্য সকল কালের জাজ্জ্বল্যমান তারুণ্যের প্রতিনিধি হয়ে স্রষ্টার গড়া শক্তিমান প্রকৃতির আবহে প্রকাশিত। 'ঝনঝার মতো উদ্দাম'তা বুকে নিয়ে, 'ঝর্নার মতো চঞ্চল'তা সাথে করে 'আকাশের মতো বাধাহীন' পথে চলে তাঁর মানস-পৃথিবী নির্মাণের যাত্রা। এ যাত্রায় তিনি 'বিধাতার মতো নির্ভয়' এবং 'প্রকৃতির মতো সচ্ছল'। 'বিদ্রোহী' কবিতার 'আমি' এই পথ পরিক্রমায় হয়ে উঠেছে 'মোরা'। ব্যক্তির আপন অন্তরের আগুন বেপরোয়াভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হলেও তা দিয়ে পুরাতন জঞ্জাল সরানো কঠিন বা যায় না বললেই চলে, এক্ষেত্রে দরকার সম্মিলিত আক্রমণ, দরকার 'আমি' থেকে 'আমরা' হওয়া। নজরুলও হয়েছিলেন তাই, নিজের বুকের আগুন সঞ্চারিত করে দেবার চেষ্টা করে গিয়েছেন আমৃত্যু (যদিও সে সুযোগও স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল)। যতদিন পেরেছিলেন নজরুল এই কবিতার ছন্দ-কথার মতোই যেন কলকলিয়ে বেড়িয়েছিলেন, বৃষ্টির জল বনফল খেয়েছিলেন:

"মোরা হাসি-গান সম উচ্ছল।
মোরা বৃষ্টির জল বনফল খাই, শয্যা শ্যামল বন-তল,
মোরা প্রাণ-দরিয়ার কল-কল্,
মোরা মুক্ত-ধারার ঝরা-জল
চল-চঞ্চল কল-কল-কল্ ছল-ছল-ছল্ ছল-ছল-ছল্।।

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৫১)

৪৭.

'অমর-কানন' কবিতায় বাংলার শ্যামল বরণ প্রকৃতি এসেছে স্নেহসুধাময় প্রশান্ত রূপ নিয়ে। প্রকৃতি পূজা বা প্রকৃতি বন্দনা ভারতীয় ধর্মবিশ্বাসে পূর্ব থেকেই ছিলো। তিনি 'বন'কে শুধু 'বন' বলতে নারাজ। এটা তাঁর কাছে তপোবন, অমর-কানন। আছে শালী নদীর পাশের শালবনে বওয়া দখিনা বাতাস আর মহুয়ার মধু পান করে উচাটন মন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা...', নজরুলে 'দুধহাসি হাসে হেথা কচি দুব-ঘাস/ উপরে মায়ের মতো চাহিয়া আকাশ' — এই আশ্রয়দাতা প্রকৃতি মানুষকে বেঁধেছে মায়ায় ডোরে, মিলিয়ে মিশিয়ে রেখেছে সবাইকে

এক বন্ধনে। এসেছে ভগবান কৃষ্ণের প্রসঙ্গ; বৃন্দাবন, যমুনা নদী, রাখাল, কদম গাছ আর রাধা-কৃষ্ণ যেন একই সুঁতোয় গাঁথা:

"হেথা খেত-ভরা ধান নিয়ে আসে অঘ্রান,
হেথা প্রাণে ফোটে ফুল, হেথা ফুলে ফোটে প্রাণ,
ওরে রাখাল সাজিয়া হেথা আসে ভগবান,
মোরা নারায়ণ-সাথে খেলা খেলি অনুখন।"

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৫২)

৪৮.

'পূবের হাওয়া' কবিতায় নজরুল তাঁর যে তীব্র যৌবনাবেগের উদ্দামতা তার প্রকাশ করেছেন।

'আমি ঝড় পশ্চিমের প্রলয়-পথিক /অসহ যৌবন-দাহে লেলিহান-শিখ/ দারুণ দাবাগ্নি-সম নৃত্য-ছায়ানটে/ মাতিয়া ছুটিতেছিনু, চলার দাপটে
ব্রহ্মাণ্ড ভণ্ডুল করি।' এ যৌবনা-দাহে দগ্ধ হয়ে তিনি ছুটে বেরিয়েছেন। তাঁর অশান্ত মনকে দীর্ঘসময় শান্ত করেনি কেউ, কিছু। এই প্রেম এবং অনুভবের অগ্নি বুকে নিয়ে তিনি রচনা করে গিয়েছেন একের পর এক কবিতা, গান। ফলে তাঁর কবিতা এবং গানে এই দাহের প্রকাশ স্পষ্ট।

৪৯.

জেলে বসে প্রিয়া বিরহের রক্তাক্ত বেদনা নিয়ে কবি লিখেছিলেন 'আলতা-স্মৃতি' কবিতা। প্রিয়া বধূবেশে যেদিন পায়ে আলতা পরে অন্যকে বরণ করে নিয়েছে সে আলতা যেন কবির বুকের রক্ত। নারীকে আক্রমণ করেছেন তিনি এখানে, নারীর মনে নিত্য নূতন জনকে পাবার পিয়াস জাগে বলে প্রিয়া তাঁকে ছেড়ে অন্যকে বরণ করে নিয়েছে। জেলে থাকা অবস্থায় প্রিয়জন অন্য কারো হয়ে গেলে সে বেদনা অসহনীয়ই হয়, নিষ্ঠুর মনে হয় প্রেম-প্রীতির বন্ধনকে। 'আলতা-স্মৃতি' এ কাব্যের এক হৃদয়-পেষা কবিতা। কবিতার

স্তবকে স্তবকে রক্তাক্ত হৃদয়ের রক্তক্ষরণ দৃশ্যমান। প্রিয় মানুষ, যার প্রতি প্রবল অনুরাগ, হৃদয়ের গভীরতম সমর্পণ সে যদি আমার হৃদয় দলে আর কারো গলে মালা দিতে যায় তাহলে এমন ক্ষতবিক্ষত পঙক্তিই সে হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়। হয়তো এ কবিতায় ফুটে উঠেছে নার্গিসের বিরহ-বেদনা বা আর কারো, ব্যক্তি মূখ্য নয় এখানে; মূখ্য হয়ে উঠেছে হৃদয়-দলা এক নিষ্ঠুর প্রিয়তমার ছবি:

"মর্মমূলে হানলে আমার অবিশ্বাসের তীক্ষ্ম ছুরি,
সে-খুন সখায় অর্ঘ্য দিলে যুগল চরণ-পদ্মে পুরি।
আমার প্রাণের রক্তকমল
নিঙড়ে হল লাল পদতল,
সেই শতদল দিয়ে তোমার নতুন রাজায় বরেছিলে –
আলতা যেদিন পরেছিলে।।"

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৬০)

এ কবিতা সম্পর্কে নজরুল-গবেষক রফিকুল ইসলাম বলেছেন:

"'আলতা-স্মৃতি' বিচ্ছেদের, বিরহের, স্মৃতির রক্তাক্ত অর্ঘ্য। যেদিন প্রিয়তমা তাঁর রাঙা পায়ে প্রথম অনুরাগের রঙে আলতা পরেছিল, সেদিন সে রাঙা চরণের স্মৃতি প্রেমিকের বক্ষে স্থায়ী ছাপ রেখে গিয়েছিল। আবার যখন প্রিয়তমার সে রাঙা চরণ অপরের পূজার সামগ্রী হল তখন প্রেমিকের ক্ষত-বিক্ষত বক্ষে সে ছাপ রক্তাক্ত হয়ে উঠল,... ঐ রক্তাক্ত স্মৃতির হাত থেকে প্রেমিকের রেহাই নেই, ঐ রক্তাক্ত স্মৃতি সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কবির চেতনায় উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়েছে।" (রফিকুল, ২০১৮: ৫৫৩)

৫০.

'রৌদ্র-দগ্ধের গান' কবিতাটি তিনি রেলগাড়িতে বসে রচনা করেছিলেন। কবিতাটি মিলন-কামনায় পরিপূর্ণ এবং তিনি এ মিলন চান রাতের অন্ধকারে। এখানে একাধিকবার রাধা-মিলনের প্রসঙ্গ এসেছে। কবি দিনের আলোকে ঢেকে দিয়ে রাতের আঁধারের আরাধনা করছেন। তাঁর জ্যোতির্গেহে তিনি 'তিমির-প্রদীপ' জ্বালার কথা বলছেন। কারণ সেই আঁধার ঘরেই তাঁর প্রিয়ার সোহাগ জেগে আছে। মানুষ স্মৃতি-কাতর এবং স্মৃতিকে লালন-

পূজন করতে তার স্বভাবতই আগ্রহ। তাই যেখানে তার প্রেম রয়েছে সেখানের আবাহনই তিনি করবেন:

"দিনের আলো কাঁদে আমার রাতের তিমির লাগি
সেথায় আঁধার-বাসর-ঘরে তোমার সোহাগ আছে জাগি।
ম্লান করে দেয় আলোর দহন-জ্বালা
তোমার হাতের চাঁদ-প্রদীপের থালা,
শুকিয়ে ওঠে তোমার তারা-ফুলের গগন-ডালা।
ওগো অসিত আমার নিশীথ-নিতল শীতল কালোই ভালো।
তিমির প্রদীপ জ্বালো॥"

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৬১)

এ কাব্যগ্রন্থের ৫০ টি কবিতার প্রায় প্রতিটিতেই বিরহী প্রেমিক নজরুল এবং বিরহের পরে তাঁর সদ্যোজাত প্রেমের ছোঁয়া আছে। স্নেহ-বুভুক্ষু মন নিয়ে তিনি যেমন খুঁজেছেন স্নেহের পরশ তেমনি লিখেছেন এ-ক্ষুধা থেকেই বাৎসল্য রসের কবিতা। প্রেমের বহুবর্ণিল রূপ আর সেই রূপের প্রকাশে প্রকৃতির ব্যবহারে এ কাব্যের কবিতাগুলো অনন্য। এখানে কবি নজরুল এবং ব্যক্তি নজরুলকে যুগপৎভাবে ধরা যায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
সিন্ধু-হিন্দোল

প্রকৃতির সাথে মানব-মনের যে নিবিড় সম্পর্ক তা 'সিন্ধু-হিন্দোল' কাব্যের কবিতাগুলোতে স্পষ্ট। এখানে প্রেমের গভীরতা, চিরন্তনতা, এবং বিচ্ছেদের তীব্র রূপের প্রকাশ আছে। 'দোলন-চাঁপা' এবং 'ছায়ানট'- এ যে চঞ্চল নজরুলকে দেখা গিয়েছে এ কাব্যের কবিতাগুলোতে তিনি যেন অনেক বেশি ধীর, অনেক বেশি স্তব্ধ এবং তাঁর ভেতরে যেন বিরহের অতলস্পর্শী ধারা প্রবাহিত। সিন্ধুর হিন্দোলের মতোই যেন তাঁর হৃদয়ের হিন্দোল একের পর এক আছড়ে পড়েছে এ কাব্যের কবিতার পরতে পরতে। কাব্যের কবিতাগুলো সংখ্যার দিক থেকে কম হলেও তাৎপর্যের দিক দিয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

বরাবরের মতোই প্রেমের বহুমাত্রিক দিকের মধ্যে গভীরতম বিরহের ছাপের কবিতাই বেশি, মিলন-মধুরতার রাগিণীও বেজেছে কিছু কবিতায় তবে সংখ্যায় অল্প। বিরহের কবিতাগুলো প্রকৃতির সাথে একান্তভাবে সংলগ্ন। গবেষক আনিসুজ্জামান নজরুলের প্রেম-প্রকৃতির কবিতা নিয়ে বলেছেন:

> "এইসব কবিতা ব্যক্তিগত অনুভূতির নিবিড় প্রকাশে মূল্যবান। তাঁর বিদ্রোহমূলক কবিতায় যে বলিষ্ঠ পৌরুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি, সেই পৌরুষ এখানেও প্রকাশ পেয়েছে। এতে তাই বাস্তব সৌন্দর্যকে স্বীকার করে নেবার মধ্যে একটা আনন্দানুভূতির পরিচয় আছে: কোনো স্থূল-রসজ্ঞতা এই স্ফূর্তিকে আড়াল করেনি। একে একরকম দেহাত্মবাদ বলতে পারি। 'দোলন-চাঁপা'তেই তার দৃষ্টিভঙ্গির গোড়াপত্তন হয়েছিল, তবে 'সিন্ধু-হিন্দোল' এ এসে তার নিঃশংক প্রকাশ ঘটেছে।" (সংকলিত, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, ১৯৯১: ১৬৯)

১.

'সিন্ধু' কবিতার তিন তরঙ্গে কবি সিন্ধুকে তিন রূপে অবলোকন করেছেন। এ কবিতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতা আমাদের স্মরণে আসে কিন্তু অনুভবের

জায়গাটা নজরুল এবং রবীন্দ্রনাথে ভিন্ন। এখানে সিন্ধুর রূপ আসলে কবির নিজের অভ্যন্তরেরই রূপ। বহির্প্রকৃতির অবস্থা যেমন মানবমনের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তেমনি মনের অবস্থা দিয়েও মানুষ বহির্জগতকে দেখে। ভেতরে ভেতরে মানুষ যখন প্রেমময়-মনোরম থাকে তখন সে বাইরের সবকিছুর মধ্যেই একধরনের মুগ্ধতা অনুভব করে। অন্তর্প্রকৃতি যখন অশান্ত, ক্ষুব্ধ, আহত থাকে বাহিরটাকেও সেভাবেই দেখে। এই তিন তরঙ্গের কবিতায় সমুদ্রকে নজরুল নিজের একান্ত অনুভূতির সাথে, নিজের মনের প্রকৃতির সাথে মিলিয়েছেন। প্রথম তরঙ্গে সিন্ধু বিরহী, তার বেদনা উথলে ওঠে কানায় কানায় কী কথা যেন সে বলতে চায়। উপরে আকাশ, নিচে বেলাভূমি তার মনের কথা শুনতে উন্মুখ। ঢেউয়ের পরে ঢেউয়ের গর্জনে অনন্ত ক্রন্দনের কী হেতু তার? নজরুল খুঁজে ফিরেছেন এসবের উত্তর, সিন্ধুও কি তাঁর মতো কাউকে হারিয়েছে বলে এমন গর্জন চলে তাঁর বুকে? সে চাঁদের আকর্ষণে তার সাগর-প্রাণে জাগায় জোয়ার সে চাঁদপ্রিয়ার জন্যেই কি তার এমন বিরহ-ব্যথা? চাঁদের কলঙ্ক কি তারই ক্ষুধাতুর চুম্বনের দাগ? চাঁদের চিরকাল দূরে থাকাই কি তার এমন গর্জনের কারণ? —

"ঐ চাঁদ ঐ সে কি প্রেয়সী তোমার?
টানিয়া সে মেঘের আড়াল
সুদূরিকা সুদূরেই থাকে চিরকাল?
চাঁদের কলঙ্ক ঐ,ও কি তব ক্ষুধাতুর চুম্বনের দাগ?
দূরে থাকে কলঙ্কিনী, ও কি রাগ? ও কি অনুরাগ?
জানো না কি, তাই
তরঙ্গে আছাড়ি মারো আক্রোশে বৃথাই?.."

(রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৭৪)

কবিতাটি সম্পর্কে আলোচক বলেছেন:

"মানবের প্রেম-স্বভাবের সঙ্গে সিন্ধু-স্বভাবের সাদৃশ্য কল্পনাটি যথাযথ হওয়ায় কবিতাটি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। সিন্ধুর আলোড়ন, উদ্দামতা, ও উদ্বেলতার মধ্যে কবি দেখেছেন প্রেমিক পুরুষের হৃদয়াবেগের প্রতিফলন। প্রেমের বিরহ-বেদনা-প্রতীক্ষা-উৎকণ্ঠাকে সিন্ধুর স্বভাবের সঙ্গে কবি সুন্দরভাবে মিলিয়ে দিয়েছেন।" (আতাউর, ১৯৯৭: ৭০)

প্রেম আসার আগে বা প্রেম বোঝার আগে উত্তাল হৃদয় / সমুদ্র শান্ত থাকে। পুরুষরূপী সিন্ধুও ছিলো বেহুশ, ছিলো প্রশান্ত। এ মহাবিশ্বে আপনাকে ছাড়া আর জানতো না কিছু। বুকে ছিলো না ঢেউ, বিশাল আরশির মতো ছিলো স্বচ্ছ, স্থির। চাঁদের আকর্ষণে নড়বড়ে হয়ে উঠেছিল সে। এ যেন 'তপস্বিনী'র ধ্যান ভাঙানো 'তরঙ্গিনী' চাঁদ। যে তপস্বীর ছিলো না ধারণা কোনো নিজের ভেতরের ঘুমন্ত যৌবন সম্পর্কে। পুরাণের তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ যেমন করে সুপ্ত যৌবনের প্রকাশে পেয়েছিল জীবনের অন্যমাত্রার স্বাদ, যা ছিলো সম্পূর্ণ অনুন্মোচিত তার কাছে তেমনই ঘটেছে সিন্ধুর, ঘটে প্রতিটা প্রাণেরই ক্ষেত্রে:

"তপস্বী! ধেয়ানী!
তারপর চাঁদ এলো–কবে, নাহি জানি
তুমি যেন উঠিলে শিহরি।
হে মৌনী, কহিলে কথা, — 'মরি মরি,
সুন্দর সুন্দর!'
'সুন্দর সুন্দর' গাহি জাগিয়া উঠিল চরাচর!
সেই সে আদিম শব্দ, সেই আদি কথা,
সেই বুঝি নির্জনের সৃজনের ব্যথা।
সেই বুঝি বুঝিলে রাজন্
একা সে সুন্দর হয় হইলে দু'জন!.."

(রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৭৪)

'একা সে সুন্দর হয় হইলে দু'জন' — দুজন হলো বটে, কিন্তু কিছু সময় পর এলো অনন্ত বিচ্ছেদ। মিলনের স্বাদ পাবার আগ পর্যন্ত একাকীত্বকে যন্ত্রণার মনে হয় না, প্রিয় সান্নিধ্যের সুখ অনুভূত হবার পরেই প্রিয়বিচ্ছেদে অপার বেদনা আসে। ভার হয় আপনাকে নিয়ে একা থাকা। সর্বদাই যেন ফাঁকা ফাঁকা অনুভব। এ প্রসঙ্গে রফিকুল ইসলাম বলেন:

> "একাকিত্বের বেদনা, নৈঃসঙ্গের বোঝা স্পষ্ট হয় সঙ্গলাভের পর বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে, তার আগে ঐ বোধ থাকে না। আপনাকে নিয়ে একা থাকা যে কত যন্ত্রণাময় সে অনুভূতি এবং সে আবেগের সৃষ্টি হয় সাথীহারা হলে, তখন পেয়ে হারানোর ব্যথা এবং আবার পাবার

ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে। একাকিত্বের ও নৈঃসঙ্গের ঐ বেদনা সৃষ্টির জন্যে তাই মিলনের আনন্দ প্রয়োজন, মিলন না হলে বিচ্ছেদ বেদনার সৃষ্টি হয় না।" (রফিকুল, ২০১৮: ৫৬৯)

অনুভব নিয়ে রচিত হয়েছে অনেক কাব্য-কথা-গান। 'সারদামঙ্গল' কাব্যের বিহারীলালের সেই বিখ্যাত লাইনগুলো এ ক্ষেত্রে স্মর্তব্য — 'সর্বদাই হু হু করে মন, বিশ্ব যেন মরুর মতন। চারিদিকে ঝালাপালা, উঃ কী অনন্ত জ্বালা, অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গপতন।' জীবনের এ নতুন অধ্যায়ে প্রবেশের পর দেখবার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়ে যায়। নতুন নতুন বিস্ময় নিয়ে উন্মোচিত হয় চারপাশের সৌন্দর্য। নিজের মধ্যে জেগে ওঠে অনাবিষ্কৃত জগৎ। এ অনুভবে দুলে, কেঁপে, মেতে ওঠে সব; শোণিতে জাগে শিহরণ, প্রাণ হয় উদ্বেলিত। বিকশিত যৌবনে তৈরি হয় নতুন প্রাণ সৃষ্টির সম্ভাবনা। বিস্ময়ে বের হয়ে আসা নব নব নক্ষত্রের সে কামনার শতদল। ধরার বুক চিরে আসা তৃণ-ফুল-ফল যেন নবযৌবনের নব-সৃষ্টিধারা। হৃদয়ের সকল রুদ্ধ দ্বার যেন যায় খুলে, সকল দুয়ার দিয়ে প্রবেশ করে আলো, বায়ু, প্রাণ। অজানা বিস্ময়ের দুয়ার খুলে যায়, চারিদিকে নতুন গান, নতুন প্রাণ, নতুন কোলাহল। প্রেমের পরশে জীবনে জাগে এমনই উদ্দীপনা, জীবন হয় পূর্ণ-প্রসারিত-প্রস্ফুটিত। সে পরশই পেয়েছে সিন্ধু, পেয়েছেন কবি, প্রকাশ করেছেন কবিতায়:

"এ কি মাতামাতি ওগো এ কি উতরোল!
এত বুক ছিল হেথা, ছিল এত কোল!
শাখা ও শাখীতে যেন কত জানা-শোনা,
হাওয়া এসে দোলা দেয়, সেও যেন ছিল জানা
কত সে আপনা!
জলে জলে ঢলাঢলি চলমান বেগে,
ফুলে-হুলে চুমোচুমি — চরাচরে বেলা ওঠে জেগে!
আনন্দ-বিহ্বল
সব আজ কথা কহে, গাহে গান, করে কোলাহল!"

(রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৭৫)

কিন্তু, এ বিস্ময়ের ঘোর সহসাই কেটে যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসে বলেছেন যে প্রেম বাঁচে মাত্র তিনমাস। প্রেম অসহ্য প্রাণঘাতী যন্ত্রণার ব্যাপার।

প্রেম চিরকাল টিকলে মানুষকে আর টিকতে হত না। কারণ, প্রেমের যে বেগ, যে তীব্রতা নিয়ে তুমুলতা নিয়ে প্রেম ঢেউ তোলে তাতে করে বেশিদিন এমন প্রেম থাকলে জীবন অস্থিতিশীল হয়ে যেত। তাই উত্তাল প্রেমের অব্যবহিত পরেই থাকে গভীর বিরহ। আর বিরহ না আসলেও উত্তাল প্রেমে স্থিতি আসে, জীবনের আটপৌরে অনুভবের সাথে সমন্বয় করে নেয়। প্রেম যতখানি প্রেমে বাঁচে তার চেয়েও বেশি বিরহে বাঁচে। বিচ্ছেদ-বেদনা-অপ্রাপ্তিতে প্রেম আরও জীবন্ত হয়ে ওঠে। কবিতার এ পর্যায়ে সিন্ধু বা কবির সিন্ধু-হৃদয়ে পড়ল 'প্রিয়-বিরহের সুগভীর ছায়া', নীল হলো সমুদ্রের শান্ত-স্বচ্ছ কায়া। বিরহ-ব্যথায় সিন্ধুর ছিঁড়ে যায় স্নায়ু-শিরা, ছিড়ে যায় কবির, ছিড়ে যায় অনন্ত-বিরহী মানুষের। এ বিরহ সর্বজনীন, চিরন্তন, বিশ্ব-চরাচরব্যাপী। প্রতি প্রাণেই গুমড়ে গুমড়ে মরে কোনো না কোনো ব্যাথা, কুঁড়ে কুঁড়ে খায় কত অব্যক্ত কথা। কবির ব্যাথা কবি সিন্ধুতে অবলোকন করলেন, সে ব্যথা সঞ্চারিয়া নিয়ে গেলেন গ্রীষ্মে, বর্ষায়, শীতে; নিয়ে গেলেন নিখিল বিশ্বের বিরহীতে। বিরহী নজরুল তাঁর বিরহ-বেদনাকে দেখলেন সর্বে ব্যাপ্ত:

"তুমি কাঁদো, আমি কাঁদি, কাঁদে সাথে কাল!
কাঁদে গ্রীষ্ম, কাঁদে বর্ষা, বসন্ত ও শীত,
নিশিদিন শুনি বন্ধু, ঐ এক ক্রন্দনের গীত!
নিখিল বিরহী কাঁদে সিন্ধু তব সাথে,
তুমি কাঁদো, আমি কাঁদি, কাঁদে প্রিয়া রাতে!
সেই অশ্রু — সেই লোনা জল
তব চক্ষে — হে বিরহী বন্ধু মোর — করে টলমল!

এক জ্বালা এক ব্যথা নিয়া
তুমি কাঁদো, আমি কাঁদি, কাঁদে মোর প্রিয়া!"

(রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৭৬)

২.

প্রথম তরঙ্গে সারা বিশ্বকে সাথে নিয়ে কাঁদা নজরুল দ্বিতীয় তরঙ্গে এসে তাঁর প্রেমের যে মূল বৈশিষ্ট্য 'প্রেম করে না দুর্বল ওরে করে মহীয়ান' তা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। বেদনা তাঁকে বিদ্রোহী করে, বিদ্রোহী করেছে তাঁর বন্ধু সিন্ধুকে। কান্না ছেড়ে নিষ্ফল আক্রোশে সিন্ধু গ্রাস করে চলেছে ধরণীকে তিলে তিলে। তরঙ্গের উদ্দাম লীলায় ধরাকে দুলাচ্ছে, গর্জনে গর্জনে খুঁজে ফিরছে সেই প্রিয়াকে যে যে নিশীথে নীরবে এসে গর্বভরে উপেক্ষা করেছিল তার সকল নিবেদন। উপেক্ষিত কবিহৃদয় সমুদ্রের বুকেও উপেক্ষার বেদনা দেখেছিলেন:

"বলো বন্ধু, বুকে তব কেন এত বেগ, এত জ্বালা?
কে দিল না প্রতিদান? কে ছিঁড়িল মালা?
কে সে গরবিনী বালা? কার এত রূপ এত প্রাণ,
হে সাগর, করিল তোমার অপমান!"

(রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৭৭)

যে গর্বিতা নারী করে গেলো উপেক্ষা, করে গেলো অপমান, সেই রাজকুমারীকে যে রেখেছে নিজের করে তাকে রণে পরাজিত করে তুলে আনতে সিন্ধু সাজিয়েছে সকল আয়োজন। যুদ্ধ বহর সাজিয়ে সিন্ধু চলেছে তার বিদ্রোহের ঝাণ্ডা দুলিয়ে। ঝড় তার সেনাপতি, আদেশ নিয়ে অগ্রে অগ্রে চলে মেঘের বেলুন, যুদ্ধমাইন তার নিমজ্জিত চোরা পর্বত, সাবমেরিন হাঙর-কুমির, নৌ-সেনা রূপে আছে মাছের ঝাঁক। এই রণে প্রিয়াকে জিতে আনলে তাকে বরণ করে নিতে মুক্তার মালা, প্রবালের রক্তহার নিয়ে অপেক্ষমাণ ঝিনুক-বধূ। বধূকে বরণ করে নিয়ে যাবেন নব নব দ্বীপের প্রমোদ-কাননে। এই যে সিন্ধুর এতো যুদ্ধ আয়োজন এ যেন নজরুলের বুকেরই যুদ্ধের দামামা, যা বেজে চলে সকল বিরহ, ব্যথা, বঞ্চনার বিরুদ্ধে। এই যে প্রিয়াকে জিনে আনার স্পৃহা, উদ্দীপনা যে সাগরবুকে তার বুকে চলা নৌকা-জাহাজ যেন তার কপোত-কপোতী, উড়ে চলা নাম-না-জানা কত পাখি যেন তার উড়ন্ত স্বপ্ন। এমন উদ্যম, স্পৃহা, ঝরঝরে অনুভূতিতে ভাটা আসে, উদ্যম হারায় মানুষ, ডুবে যায় নিজের গভীরে, তারপর আবার জেগে ওঠে নব-উদ্দীপনা নিয়ে:

"নিরুদ্দেশ! শুনে কোন আড়ালীর ডাক
ভাটিয়ালি পথে চলো একাকী নির্বাক?

অন্তরের তলা হতে শোনো কি আহ্বান?
কোন্ অন্তরিকা কাঁদে অন্তরালে থাকি যেন,
চাহে তব প্রাণ!
বাহিরে না পেয়ে তারে ফেরো তুমি অন্তরের পানে
লজ্জায়-ব্যথায়-অপমানে!
তারপর, বিরাট পুরুষ! বোঝো নিজ ভুল,
জোয়ারে উচ্ছ্বসি ওঠো, ভেঙে চলো কূল
দিকে দিকে প্লাবনের বাজায়ে বিষাণ,
বলো, 'প্রেম করে না দুর্বল ওরে করে মহীয়ান্।"
(রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৭৮-৭৯)

এ বলিষ্ঠতার পরে সুরার পেয়ালা পান করে সকল জ্বালা ভুলেছেন কবি ও সিন্ধু। অন্তরের নিষ্পেষিত ক্রন্দন ফেনা হয়ে উঠুক মুখে, সে জ্বালা কণ্ঠে ধারণ করে হোক নীলকন্ঠ শিব। সকল ব্যথা সয়ে নিয়ে হোক নব উদ্যমে পথচলা, বিরহ-বঞ্চনা হজম করে বাজুক নব আনন্দ-বীণা। এমনই শক্তিমত্তার কবি নজরুল। তিনি ধ্বংসের বুকে হাসান সৃষ্টির নব পূর্ণিমা। এই বিদ্রোহী-বিক্ষুব্ধ সিন্ধু তাঁরই আত্মার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি। বিশাল সমুদ্রের সামনে গিয়ে কবি নিজের অশান্ত আত্মাকে দেখলেন তার মাঝে। নিজেকে লীন করলেন সাগরে আর সাগরকে আনলেন তাঁর মাঝে। নীরবে কত ভাব-ভাষা করলেন বিনিময়। পেলেন আত্মার দোসর, দুঃখপথের সাথীকে:

"এসো বন্ধু, মুখোমুখি বসি,
অথবা টানিয়া লহ তরঙ্গের আলিঙ্গন দিয়া, দুঁহু পশি
ঢেউ নাই যেথা-শুধু নিতল সুনীল!-
তিমির কহিয়া দাও-সে যেন খোলে না খিল
থাকে দ্বারে বসি',
সেইখানে ক'ব কথা। যেন রবি-শশী
নাহি পশে সেথা।
তুমি র'বে-আমি র'ব-আর র'বে ব্যথা!
সেথা শুধু ডুবে র'বে কথা নাহি কহি',-
যদি কই,-

নাই সেথা দু'টি কথা বই,
আমিও বিরহী, বন্ধু, তুমিও বিরহী!"

(রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৭৯)

৩.

তৃতীয় তরঙ্গে এসে কবি উপলব্ধি করেছেন সিন্ধুর বিশালতা, স্থিতি ও অবদানকে। বুকে বিশাল জলরাশি নিয়ে পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকেই সে বিদ্যমান। নিত্য শত-সহস্র নদী-উপনদী তারে করে জলদান তবুও বুভুক্ষু সে। পুরো পৃথিবীর ৩ ভাগ নিয়ে বাকি এক ভাগও সে গ্রাস করবার প্রচেষ্টায়। ১৯২৬ সালে লেখা এ কবিতা, প্রায় ১০০ বছর হতে চলল। এই শতবর্ষে সমুদ্রের আয়তন আরো বেড়েছে। জলবায়ু বিশারদদের আশঙ্কা, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারলে জলরাশির উচ্চতা বাড়বে এবং নিম্নাঞ্চল ধীরে ধীরে সমুদ্রবক্ষে নিমজ্জিত হবে। নদী-উপনদীর জলদান, শস্য-শ্যামল বসুমতীর ফুল-ফলের অঞ্জলি নিয়ে সে থাকে আপনাতে আপনি বিভোর। জগতের দুঃখ বেদনা দেখে উদাসীনের মতো। ত্রিকালদর্শী হয়ে আপন মনে থাকে আপনার ধ্যানে:

"তুমি আছ নিয়া নিজ দুরন্ত কল্লোল
আপনাতে আপনি বিভোল!
পাশে না শ্রবণে তব ধরণীতে শত দুঃখ-গীত;
দেখিতেছ বর্তমান, দেখেছ অতীত,
দেখিবে সুদূরে ভবিষ্যৎ-
মৃত্যুঞ্জয়ী দ্রষ্টা, ঋষি, উদাসীনবৎ!
ওঠে ভাঙে তব বুকে তরঙ্গের মতো
জন্ম-মৃত্যু দুঃখ-সুখ, ভূমানন্দে হেরিছ সতত!"

(রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৮০)

এই উদাসীন, ত্রিকালদর্শী ঋষি নিজের মধ্যে টেনে নেয় কন্যাসম ধরিত্রীর কালিমা যত, বাষ্পাকারে বিশুদ্ধ জলধারা দেয় মেঘের মাঝে। ঝরণা, নদী, বর্ষার প্লাবন ধুয়ে নিয়ে সকল কালিমা বয়ে চলে সমুদ্র অভিমুখে। জগতের সকল গ্লানি নিজের বুকে ধারণ করে অম্লান

করে রাখে। মেঘের খেয়ার জলসিঞ্চন পেয়ে তার দুলালী ধরা হেসে খেলে ওঠে নব নব ফুল ফসলে। এমনিভাবে চলে তার অক্ষয় কৌতুক লীলা ধরণীরে নিয়ে। গবেষকের বিশ্লেষণ:

> "নজরুল ইসলাম 'সিন্ধু-হিন্দোল' কাব্যে প্রেমের রাজ্যে বিরহের লাবণ্যকেই অন্তিমে আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু কখনও কখনও মিলনের আকাঙ্ক্ষায় আবেগসিক্ত হয়েছে তাঁর কবি-হৃদয় এবং সে-আবেগের প্রকাশ ঘটেছে মিলনাত্মক চিত্রকল্পে। কবি সিন্ধুনদের দৃষ্টি সাগরের তটভূমিকে কল্পনা করেছেন নারীরূপী ধরণীর কটিদেশরূপে, আর তীরপ্লাবী উচ্ছল জলরাশি যেন সমুদ্রের অঞ্জলিবন্ধন। সমুদ্র তার প্রিয়াকে বাহুডোরে আঁকড়ে ধরেছে, সমুদ্রের জল-বাহু যেন ইন্দ্রনীলকান্তমণি মেখলা, যে-মেখলা নৃত্যরত পৃথিবীর নিতম্বদোলার তালে দুলছে অনুপম ছন্দে–" (বিশ্বজিৎ ঘোষ, ২০০৫: ৪৭)

নজরুলের ভাষায়:

"হে বিরাট, নাহি তব ক্ষয়,
নিত্য নব নব দানে ক্ষয়েরে ক'রেছ তুমি জয়!
হে সুন্দর! জলবাহু দিয়া
ধরণীর কটিতট আছো আঁকড়িয়া
ইন্দ্রানীলকান্তমণি মেখলার সম,
মেদিনীর নিতম্ব সাথে দোল' অনুপম!"

(রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৮১)

এই অনন্ত যৌবনা সিন্ধুকে যাচে কত মৎস্যকুমারী, কত জলদেবী; কিন্তু সে যেন কার স্বপ্নে বিভোর, মত্ত নিশিদিন। এ তো সিন্ধু নয়, এ যে নজরুল নিজে। 'বিদ্রোহী কবিও যন্ত্রণা-বিদ্ধ। তাই সিন্ধুর সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার সেতু সহজেই নিবিড়ভাবে গড়ে উঠেছে।' কতজন প্রেম যাচে তাঁর কাছে, কতজন স্নেহ সুধা করে নিবেদন; কিন্তু তাঁর মন পরে রয় অন্য কোথাও, হৃদয়ে থাকে অন্য কোনো জন। সাগরের হৃদয়-পুর লুণ্ঠন করে নিয়েছে

সুরাসুর, তার প্রিয়া চাঁদ আছে সুখে অন্য কোথাও গিয়ে, সে পরে আছে ব্যথা-কান্না হাহাকারের রিক্ততা নিয়ে:

"তার সব আছে আজ সুখে স্বর্গে গিয়া!
করেছে লুণ্ঠন
তোমার অমৃত-সুধা-তোমার জীবন!
সব গেছে, আছে শুধু ক্রন্দন-কল্লোল,
আছে জ্বালা, আছে স্মৃতি, ব্যথা-উতরোল
উর্ধ্বে শূন্য, নিম্নে শূন্য,-শূন্য চারিধার,
মধ্যে কাঁদে বারিধার, সীমাহীন রিক্ত হাহাকার!"

(রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৮১)

সিন্ধুর সমান্তরালে নিজের মনোবেদনা প্রকাশ করলেও তিন স্তরের এ কবিতার শেষে এসে নজরুল আলাদা করে নিলেন নিজেকে। সমুদ্র দুর্লঙ্ঘনীয় হলেও তার তো পার আছে, কূল আছে; কিন্তু কবির বিরহ-সাগরের কোনো কূল নেই। এ বিরহ ভার নিয়ে তিনি বিদায় নিবেন। প্রিয়া যদি কভু আসে করতে সন্ধান, সাগরের কাছে তিনি দিয়ে গেলেন প্রিয়ার জন্য অন্তিম বার্তা:

"হে দুস্তর, আছে তব পার, আছে কূল,
এ অনন্ত বিরহের নাহি পার–নাহি কূল–শুধু স্বপ্ন, ভুল।
মাগিব বিদায় যবে, নাহি র'ব আর,
তব কল্লোলের মাঝে বাজে যেন ক্রন্দন আমার!
বৃথাই খুঁজিবে যবে প্রিয়
উত্তরিও বন্ধু ওগো সিন্ধু মোর, তুমি গরজিয়া!
তুমি শূন্য, আমি শূন্য, শূন্য চারিধার,
মধ্যে কাঁদে বারিধার—সীমাহীন রিক্ত হাহাকার।"

(রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৮২)

৪.

পরবর্তী কবিতা ‘গোপন-প্রিয়া’ সম্পর্কে গবেষকের অভিমত:

> "'গোপন-প্রিয়া'র মধ্যেও প্রিয়াবিরহের সুর বেজে উঠেছে। দূরের প্রিয়াকে কবি পান নি বলেই তাঁর ভালবাসা আজও অম্লান হয়ে আছে। মিলনে প্রেমের সঙ্কোচন, বিরহে সম্প্রসারণ। কবি বিরহে মুহ্যমান নন, কেননা তাঁর কাব্যে প্রিয়ার মূর্তি ধরা পড়েছে। তাঁর গান, কাব্য প্রভৃতি সবই প্রিয়ার প্রেমে একাকার। কোন কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা না করেই তিনি শুধু প্রেম দান করে যাবেন আজীবন।" (সুশীলকুমার, ১৯৯৭: ১৭৩)

মানুষ তার কল্পনাতে সবকিছুর একটা আদর্শ রূপ নির্মাণ করে। আদর্শ পৃথিবী, আদর্শ রাষ্ট্র, আদর্শ সমাজ, আদর্শ মানুষ ইত্যাদি। একজন মানুষ তার মনের সমস্ত শুভটুকু, সুন্দরটুকু, মনোরমটুকু দিয়েই সে জগৎ নির্মাণ করে। এ জগৎটার কখনোই পরিপূর্ণ রূপে বাস্তবে দেখা মেলে না বা সারা জীবনের চেষ্টা, শ্রম, মেধা-মনন দিয়েও সে জগৎ পূর্ণরূপে নির্মাণ সম্ভব হয় না। তেমনি মানুষের ক্ষেত্রেও সত্য। প্রত্যেক মানুষের কল্পনাতে একজন আদর্শ মানুষের ছবি থাকে; আদর্শ পিতা, আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক, আদর্শ শিক্ষক, আদর্শ স্বামী/স্ত্রী, আদর্শ প্রেমিক/প্রেমিকা ইত্যাদি। রূপে, গুণে, কথায়, আচরণে সে হয় অনন্য। কিন্তু, বাস্তবে তো এমন সকল গুণের সম্মিলনের মানুষ মেলে না। তাই সেই কল্পনার মানুষদের নিয়ে রচিত হয়েছে গান, কবিতা, উপন্যাস, নাটক ; নির্মিত হয়েছে চলচ্চিত্র। যে যে মাধ্যমে মানুষ তার মনোজগতকে প্রকাশ করতে পারে সে সে মাধ্যমেই সে ফুটিয়ে তুলেছে তার সে কল্প-মানব/মানবীকে। নজরুলও প্রকাশ করেছেন:

> "গাইব আমি, দূরের থেকে শুনবে তুমি গান।
> থামবে আমি-গান গাওয়াবে তোমার অভিমান!
> শিল্পী আমি, আমি কবি,
> তুমি আমার-আঁকা ছবি,
> আমার লেখা কাব্য তুমি, আমার রচা গান।
> চাইব নাকো, পরান ভরে করে যাব দান।"
>
> (রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৮৪)

এই আদর্শ মানুষ বা মনের মানুষকে পাওয়া যায় না বলেই তাকে নিয়ে এতো প্রগাঢ় ব্যাকুলতা, এতো গান, কবিতা। নজরুলের ভাষায়--'পাইনি বলে আজো তোমায় বাসছি ভালো, রানি!' এই না-পাওয়া প্রিয়াই 'অ-নামিকা', 'গোপন-প্রিয়া'। বহু দূরত্বে রয়ে যাওয়া এ প্রিয়া আর প্রিয়র 'মধ্যে কাঁদে বাঁধার পাথার'। নাম না জানা, পরিচিত না হওয়া, এ মানসপ্রিয়ার সাথে ক্ষণিকের দেখা ছিলো তাঁর। গানের পাখি হয়ে দু'দিনের জন্য এসেছিলেন, গান ফুরালেই চলে যাবেন। তখন গানের পাখি থাকবে না, থাকবে পাখির স্বর। নজরুল যাদের গান শেখাতেন তাদের কারো কারো প্রতি তাঁর অনুরাগের সঞ্চার হয়েছিল। এ কথা হয়তো তাদেরই কারো প্রতি নিবেদিত। এমন সমাজ-সংসার নিষিদ্ধ প্রেমের দোলা হৃদয়ে লাগলেও তাকে গোপনেই লালন করতে হয়। প্রেমের ফুল/পালক একবার তুলে নিলেও পরক্ষণেই খুলে ফেলতে হয়:

"তোমার পায়ে বাজল কখন আমার পারের ঢেউ,
অজানিতা! কেউ জানে না, জানবে নাকো' কেউ।
উড়তে গিয়ে পাখা হতে
একটি পালক পড়লে পথে,
ভুলে প্রিয় তুলে যেন খোঁপায় গুঁজে নেও!
ভয় কি সখি? আপনি তুমি ফেলবে খুলে এ-ও!"

(রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৮৩)

বাইরে পাওয়া হয় না বলে অন্তর্জাগতিক ভাবনা তো থেমে থাকে না। মনোজাগতিক স্রোত বা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নিয়ে যে সকল সাহিত্য (যেমন, চাঁদের অমাবস্যা) রচিত হয়েছে সেখানে আমরা দেখেছি বাহ্যত মানুষের এক রকম চলন-বলন দেখলেও তার ভেতরের জগতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর কিছু চলতে থাকে। যে প্রিয়া/ প্রিয়কে হয়নি পাওয়া বাইরে তাকে নিবিড় করে পাওয়া হয় অন্তরে। 'বনের কেতকী', 'আমার চাতকী'-- প্রিয়াকে নজরুল পাননি বলেই 'এ ক্রন্দন-রোল'। তাকে পেলে দরিয়ার সব ঢেউ-দোলা শান্ত হয়ে যেত। না-পাওয়াতেই বুকের কোলটি জুড়ে আছে, হৃদয়ের গভীরে মিশে আছে, অদৃশ্যে লেগে আছে:

"বন্ধু, তুমি হাতের-কাছের সাথের-সাথী নও,
দূরে যত রও এ-হিয়ায় তত নিকট হও।

থাকবে তুমি ছায়ার সাথে
মায়ার মত চাঁদনী রাতে!
যত গোপন তত মধুর-নাই বা কথা কও!
শয়ন-সাথে রও না তুমি নয়ন-পাতে রও!"

(রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৮৩)

বাহ্যত সে কোথায় আছে তা জানবার কোনো অভিলাষ কবির নাই। তিনি যে খুব গোপনে তাকে ভালোবাসেন তাতেই তাঁর আনন্দ। তাঁর একলা সময়ে তাকে নিয়ে তিনি দুখের সুরায় মত্ত হয়ে থাকবেন। কল্পনার রঙ দিয়ে তাঁকে এঁকে নেবেন।বাস্তবের প্রিয়াকে তো কল্পনায় আঁকা যায় না, সে হয়ে ওঠে অমিতের 'ঘড়ায় তোলা জল', কিন্তু কল্পনার প্রিয়া তো লাবণ্য-দিঘি। সেখানে ইচ্ছের রংধনুতে কল্পনার সাত রঙ মিশিয়ে যেমন খুশি তেমন ছবি আঁকা যায়। স্বভাববিরহী নজরুলের এ ইচ্ছে জগৎ অনেক গভীর, তল কে বা পায় অতল জলধির। না-পাওয়া সে প্রিয়াকে তিনি কাব্যে-গানে বেঁধে রাখবেন, আর তিনি রয়ে যাবেন প্রিয়ার ভুলে থাকবার প্রচেষ্টার মধ্যে:

"মনে আমায় করবে নাকো -সেই তো মনে স্থান!
যেদিন আমায় ভুলতে গিয়ে
করবে মনে, সেদিন প্রিয়ে
ভোলার মাঝে উঠব বেঁচে, সেই তো আমার প্রাণ!"

(রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৮৪)

৫.

প্রেমবিষয়ক নজরুলের প্রথম সারির কবিতাগুলোর মধ্যে অন্যতম 'অ-নামিকা' কবিতাটি। নজরুল-বিশ্লেষকের অভিমত:

"'অনামিকা' নজরুলের একটি শ্রেষ্ঠ রচনা। 'অনামিকা' অধরা বন্দনার গান। নজরুল এক সংজ্ঞাতীত, জ্ঞানাতীত হৃদয়াকুতির অতৃপ্তি ও বেদনা প্রকাশ করেছেন এ কবিতায়। প্রেম, সৌন্দর্য ও প্রকৃতির লীলা-রহস্য মানব মনে যে বিস্ময়-বেদনা সৃষ্টি করে তার যথার্থ

স্বরূপ চিরকাল রয়ে গেছে অজানা। মানব-মনের অভিসার চিরকালই কুয়াশাচ্ছন্ন জগতে পথ সন্ধান করে।" (আতাউর, ১৯৯৭: ৭১)

এ কবিতায় নজরুল সৃষ্টির আদি থেকে আবহমান প্রেমের একটা বিশ্বজনীন রূপ তুলে ধরেছেন। এনেছেন সেই স্বরূপকে যে স্বরূপে প্রেম খেলা করে আসছে, করে এবং করবে অনন্ত মানব-হৃদয়ের মাঝে। এ কবিতায় তাঁর যে প্রেমানুভব, সেটাই সর্বজনীন, সর্বস্থানের, সর্বমানবের প্রেমানুভব। পুরো বিশ্বের মানুষের যাতনা-বঞ্চনা যেমন নজরুলের বিদ্রোহী কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, পুরো বিশ্বমানবের প্রেম-বাসনার সুরও তাঁর প্রেমের কবিতায় ঝংকার তোলে। সেই যে কালে কালে বন্দনা করা স্বপ্নের রঙে রাঙানো অনাগত প্রিয়া যাকে না পাবার আকণ্ঠ তৃষ্ণা তাঁর আদি কাল থেকে এখন অবধি সেই প্রিয়াকে তিনি 'স্বপ্ন-সহচরী', 'অনাগত-প্রিয়া', 'মানস-রঙ্গিনী', 'অনন্ত-যৌবনা বালা', 'বাসনা-সঙ্গিনী', 'গোপন-চারিণী', 'চির-প্রেয়সী', 'অসীমা', 'অরূপা', 'সুদূরিকা', 'মরীচীকা' কত নামে ডেকেছেন। সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে সে বাসনার অন্তরালে আছে, আছে সীমারেখার পারে স্বপনচারী হয়ে। সে প্রিয়া রতি হয়ে প্রেমে আসে, সতী হয়ে ঘরে আসে না; প্রিয়া হয়ে প্রেমে আসে, বধূ হয়ে অধরে আসে না। সেই সূদুরের প্রিয়াকে জন্ম-জন্মান্তরে, লোক-লোকান্তরে, রূপে-অরূপে খুঁজে ফেরা:

"তুমি নহ নিভে-যাওয়া আলো, নহ শিখা।
তুমি মরীচিকা,
তুমি জ্যোতি।-
জন্ম-জন্মান্তর ধরি লোকে-লোকান্তরে তোমা’ করেছি আরতি,
বারে বারে একই জন্মে শতবার করি!
যেখানে দেখেছি রূপ,-করেছি বন্দনা প্রিয়া তোমারেই স্মরি!
রূপে রূপে, অপরূপা, খুঁজেছি তোমায়!
পবনের যবনিকা যত তুলি তত বেড়ে যায়!"

(রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৮৬)

জীবনানন্দ দাশ যেমন হাজার বছর ধরে পথ হেটেছেন পৃথিবীর পথে ক্লান্ত-বিধ্বস্ত আত্মা নিয়ে একটু শান্তির আশায়, তেমনি বিশ্ব বাসনার প্রতিনিধি হয়ে নজরুলও অধরাকে

দেহের তীরে পাবার আশায় ছুটেছেন গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে, এ যৌবন-বাসনা নিবারণের জন্য জন্ম লাভ করে লোক থেকে লোকান্তরে। নজরুলের চির অতৃপ্ত আত্মায় বাজে বিশ্বের চির অতৃপ্ত আত্মার বীণা। সকল সুন্দরের মাঝে তিনি দেখেছেন সে সুন্দরতমের প্রতিচ্ছবি, সকল প্রেম পরশের মাঝে দেখেছেন সে 'নিখিল-প্রিয়া'র উপস্থিতি। বিশ্ব কামনার সাথে কামবাসনা জেগেছে তাঁরও মনে:

"যা-কিছু সুন্দর হেরি করেছি চুম্বন,
যা-কিছু চুম্বন দিয়া করেছি সুন্দর
সে সবার মাঝে যেন তব হরষণ
অনুভব করিয়াছি!--ছুঁয়েছি অধর
তিলোত্তমা, তিলে তিলে!
তোমারে যে করেছি চুম্বন
প্রতি তরুণীর ঠোঁটে
প্রকাশ গোপন।
যে কেহ প্রিয়ারে তার চুম্বিয়াছে ঘুম-ভাঙা রাতে,
রাত্রি-জাগা তন্দ্রা-লাগা ঘুম-পাওয়া প্রাতে,
সকলের সাথে আমি চুমিয়াছি তোমা
সকলের ঠোঁটে যেন, হে নিখিল-প্রিয়া প্রিয়তমা!

তরু, লতা, পশু, পাখী, সকলের কামনার সাথে
আমার কামনা জাগে,-আমি রমি বিশ্ব-কামনাতে!"

(রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৮৬)

প্রতিটি মানুষ যেমন স্রষ্টার প্রতিনিধি, সৃষ্টির প্রথম মানব-মানবী আদম-ইভের সম্প্রসারিত ধারা, তেমনি প্রতিটি মানুষের ভেতরের কামনা-বাসনাও সৃষ্টির আদিম কামনা-বাসনা। এ বিশ্বকামনায় কবি কাম এবং তাঁর প্রিয়া রতি। এই অধরা প্রিয়াকে পাবার বাসনায় বৃথাই তাঁর খুঁজে ফেরা চারিদিকে, বৃথাই অন্যদেরকে ভালোবাসা। যে ভালোবাসা পেয়েছেন তিনি তাতে আসেনি পরিপূর্ণ তৃপ্তি। এ যেন বৈষ্ণব কবিতা 'জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল' এর অনুরনন। তিনি যখনই কাউকে ভালোবেসেন, বুকে ধরেছেন

মনে হয়েছে এর চেয়ে ভালো কেউ বাসিছে গোপনে। পাওয়া বুকের গহীনে না-পাওয়া হয়ে একাকী কেঁদে ফিরেছে সে প্রিয়ার সতিনী হয়ে:

"বারে বারে পাইলাম-বারে বারে মন যেন কহে-
নহে, এ সে নহে!
কুহেলিকা! কোথা তুমি? দেখা পাব কবে?
জন্মেছিলে জন্মিয়াছ কিম্বা জন্ম লবে?
কথা কও, কও কথা প্রিয়া,
হে আমার যুগে-যুগে না-পাওয়ার তৃষ্ণা-জাগানিয়া!
কহিবে না কথা তুমি! আজ মনে হয়,
প্রেম সত্য চিরন্তন, প্রেমের পাত্র সে বুঝি চিরন্তন নয়।"

(রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৮৭)

সৃষ্টির ধারা ধারা বজায় থাকে কামনার বীজে। কামনার উদ্রগ্র বাসনায় নর-নারী মিলিত হয় বলেই সৃষ্টি হয় নব নব জীবন ধারা। কামনার বীজে জন্ম বলে কামনার কল্পতরু মাঝেই তার বেড়ে যাওয়া। এ কল্পতরু দিকে দিকে তার শাখা বিস্তার করে ছড়িয়ে আছে বিশ্ব চরাচর মাঝে। এ অতৃপ্ত বাসনা যেন শুষে নেবে আকাশের যত বায়ু প্রাণ। কবি বুঝলেন এই কামনা সত্য কিন্তু, কামনার পাত্র সত্য নয়। বুঝলেন প্রেম মদ যে পাত্রেই ঢেলে পান করা হোক তাতেই নেশা হয়। প্রেম লালিত হয় নিজের মধ্যে, প্রেমের মধুরতাও থাকে নিজেরই মধ্যে। আমাদের মনের মনোরম কুঠুরির মধ্যেই সে নীরবে নিহিত থাকে। বাইরে তাকে খোঁজা বৃথা। শুধুমাত্র বাইরে থেকে একটা ইন্ধন আসে, যে ইন্ধনে প্রেম জাগ্রত হয়, বিকশিত হয়। প্রেমকে মদের রূপকে এনেছেন নজরুল, ইন্ধন-সহযোগী হলো ভৃঙ্গার, গ্লাস, পেয়ালা, পাত্র প্রভৃতি। কিছু একটাতে ঢেলে খেলেই যেমন মদে নেশা হয় তেমনি যেকোনো প্রিয়াতেই সে প্রেম প্রকাশ লাভ করে। মনে দয়া থাকলে যেমন দয়া করবার মতো উপলক্ষ্য পেলেই তা প্রকাশিত হয়, প্রেমও তদ্রুপ, মনে ভালোবাসা থাকলে তা প্রকাশিত হবে যে কারো কাছে, যে কোনো ভাবে:

"চির-সহচরি!
এতদিনে পরিচয় পেনু, মরি মরি!
আমারি প্রেমের মাঝে রয়েছ গোপন,

বৃথা আমি খুঁজে মরি জন্মে জন্মে করিনু রোদন।
প্রতি রূপে, অপরূপা, ডাক তুমি,
চিনেছি তোমায়,
যাহারে বাসিব ভালো-সেই তুমি,
ধরা দেবে তায়!
প্রেম এক, প্রেমিকা সে বহু,
বহু পাত্রে ঢেলে পি'ব সেই প্রেম-
সে শরাব লোহু।
তোমারে করিব পান, অ-নামিকা, শত কামনায়,
ভৃঙ্গারে, গোলাসে কভু, কভু পেয়ালায়!"

(রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৮৮)

৬.

জীবনে চলবার পথে অগণিত মানুষের সাথে আমাদের দেখা হয়, আলাপ হয়, পরিচয় হয়। সবাই তো আমাদের হৃদয়ে জায়গা করে নেয় না, স্মরণেও থাকে না। কেউ কেউ হৃদয়ের গভীরে আঁচড় কেটে যায়, হয়ে থাকে পথের স্মৃতি। চোখের দেখা পেরিয়ে তারা পৌঁছে যায় হৃদয়ের মণিকোঠায়। ক্ষণিক সাক্ষাতে হৃদয় জিতে নেয় তারা। তাদের কথা, হাসি, আনন্দ, চিন্তা, ব্যবহার দিয়ে তারা আচ্ছন্ন করে মানুষের মন। এমন মানুষেরা যখন বিদায় নেয় তখন ব্যথিত হয় সে, ব্যথিত হয় যাদের কাছ থেকে বিদায় নেয় তারাও। ব্যথা যারা বোঝে তারা ব্যথিতের হৃদয়ে জাগ্রত থাকে সর্বদা। রাজাসনে বসে তারা হয় না রাজা, হৃদয়াসনে বসে হয় হৃদয়ের রাজা। এমন মানুষকে নিয়েই নজরুল লিখেছেন:

"রাজাসনে বসি হওনিকো রাজা
রাজা হলে বসি হৃদয়ে,
তাই আমাদের চেয়ে তুমি বেশি
ব্যথা পেলে তব বিদায়ে।"

(রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৮৯)

৭.

কথিত আছে, প্রতিটি মানুষ যাকে দেখে এক মুহূর্তের জন্য হলেও তার প্রেমে পরে। পথে-প্রান্তরে ক্ষণিক সাক্ষাতে কত জনের প্রতিই তো অনুরাগের সঞ্চার হয়। আবার মিলিয়েও যায় সহজেই। সহজাত সৎ সাহসী প্রেমের কবি নজরুল তাঁর কবিতায় এই ক্ষণিক প্রেমকেও স্বীকৃতি দিয়েছেন। শরৎ শেষের যে অনুরাগ হেমন্তে এসে মিলিয়ে যায় সে অনুরাগও তো জীবনেরই অংশ, হোক তা ক্ষুদ্র। পথ চলতে পথের বাঁকে যে প্রণয়-রেখা জাগে তাকে হয়তো পথের বাঁকেই ফেলে যেতে হয়, কিন্তু লেখা থাকে আঁখির পাতায়:

"হয়তো মোদের শেষ দেখা এই
এমনি করে পথের বাঁকেই,
রইল স্মৃতি চারটি আঁখেই
চেনার বেদন নিবিড় লেখা।।"

(রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৮৯)

৮.

কবির উন্মনা উদাসীন মন যখন বিবাগী হয়েছে হারা-প্রিয়ার খোঁজে মত্ত, তখন তাঁর সাথে বাইরের প্রকৃতিও বিবাগী রূপে হাজির হয়। গাছের সবুজ পাতারা তাঁর মনের বেদনায় ঝরে পরে। বিশ্বাসী কবি নজরুল আশা হারান না। তিনি জানেন তাঁর জীবন-স্বামি আসবে এবং তাঁর নয়ন-ধারা মুছিয়ে দেবে:

"ঘর-দুয়ার আজ বাউল যেন শীতল উদাস মাঠের মতো,
ঝরছে গাছে সবুজ পাতা আমার মনের – বনের যত।

যেথাই থাক, জানি আমি, –
হে মোর সুদূর জীবন-স্বামি!–
সন্ধে হলে আসবে নামি
মুছিয়ে দেবে নয়ন-ধারা॥"

(রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৯০)

৯.

'অতল পথের যাত্রী' কবিতায় নিজের অভিষ্ঠ পথের সন্ধান করে চলছেন এবং জানা থেকে অজানায় ছুটে চলেছেন। দূর প্রান্তর গিরি ছাড়িয়ে পথে পথে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন জীবনের অতল সিন্ধুর স্বরূপ উন্মোচনের জন্য। কিন্তু, পেরেছেন আর কই; নিজে আঘাতের পর আঘাত পেয়েছেন, আহত হয়েছেন, ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন। নিজের জ্ঞানের সীমা দিয়ে জানা জগতের লড়াই করাটা দেখেছে সবাই তাঁর, কিন্তু হৃদয়ের গভীরতম বেদনা কেউ দেখেনি কেউ। এ কথা তিনি বিভিন্ন কবিতাতেই বলেছেন, গানে বলেছেন। এ কবিতায় বলছেন:

"উঠিছে পড়িছে ভাঙিছে জানার ঢেউ,
হেরিতেছে ঢেউ– সাগর হেরে না কেউ!
কূলে কূলে ফিরি, ঢেউয়ে ঢেউয়ে কাঁদি আমি,
অতল গভীরে টেনে লও মোরে স্বামি!
দেখিবে না ঢেউ, দেখিব সিন্ধুতল
যথা নাই ঢেউ – শুধু সে অতল জল।"

(রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৯১)

১০.

পরবর্তী কবিতা 'দারিদ্র্য'তে প্রেমের অনুষঙ্গ নেই বটে, কিন্তু প্রবাদতুল্য পঙক্তির উদগাতা এ কবিতার ভাব প্রকাশে প্রকৃতি এসেছে বরাবরের মতোই। 'শূন্য মরুভূমি', 'অগ্নি বরিষণ', 'শেফালির মতো শুভ্র', 'আশ্বিনের প্রভাত', 'শিশির-সজল টলমল ধরণী', 'ম্লানমুখী শেফালিকা', 'ভোমোরার পাখা', 'ধুতুরা-গেলাস ভরিয়া করেছি পান' প্রভৃতি শব্দবন্ধের প্রকৃতি-অনুষঙ্গ তিনি তাঁর দারিদ্র্য-দর্শনের প্রকাশে ব্যবহার করেছেন।

১১.

'বাসন্তী' কবিতায় কবিতায় কবি ফাল্গুনের আগমনকে কৃষ্ণের আগমনের সাথে তুলনা করেছেন। শীত যেতে না যেতেই কুয়াশার দোলায় চড়ে, মকরের কেতন ওড়ে শিমুল-

পলাশ-ডালিমের বনে ফাল্গুনী ফুল এসে হাজির। মন প্রস্তুত না, বন প্রস্তুত না; এরই মধ্যে ফাগুনের আগমনী। কবি এই অপ্রস্তুতিকে কী অসাধারণ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন:

"ওলো এ ব্যস্ত – বাগীশ
মাধবের নকল – নবীশ
মধুরাত নাই হ'তে– ইস্
মাধবীর কুঞ্জে হাজির!
বলি ও মদন – মোহন!
না যেতে শীতের কাঁপন
এলে যে, থালায় এখন
ভরিনি কুমকুম আবীর।।"

(রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৯৫)

কিন্তু কৃষ্ণরূপী ফাগুন আসলে রাধারূপী অশোক-শিমুলেরা আর না এসে কই থাকবে! আমাদের মিছেই উৎকণ্ঠা-উদ্বেগ, 'এলে শ্যাম আসবেনই রাই'। পৌষের পাতাঝরা রিক্ত শাখায় যখন শ্যামরূপী ফাল্গুন বাঁশী বাজায় তখন ডালে ডালে ফুলের আগমন ঘটে। প্রেম-প্রকৃতি, রাধা-কৃষ্ণের রূপকে ফাগুন-ফুল কবি এ কবিতায় সংমিশ্রিত করে দিয়েছেন। প্রকৃতির এই প্রণয়-লগ্নে আমাদেরও তাই সামিল হবার আহবান তিনি করেছেন:

"সাতাসে – মাঘ – বাতাসে
যদি ভাই ফাগুন আসে
আঙনে রঙন হাসে
আমাদের সেই তো হোরি!
শ্রীমতীর লাল কপোলে
দোলে লো পলাশ দোলে
পায়ে তার পদ্ম ড'লে
দে লো বন আলা করি।।"

(রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৯৬)

১২.

'বাসন্তী' কবিতাতে কবির অপ্রস্তুতিতে যে ফাল্গুন এসেছে সেই ফাল্গুনে কবির হৃদয়জ্বালা প্রকাশিত হয়েছে 'ফাল্গুনী' কবিতায়। প্রিয়াবঞ্চিত একাকী কবিমন প্রকৃতির এহেন প্রেমায়োজনে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। সখিকে উদ্দেশ্য করে বলা 'বড় সে জ্বালা', 'কেমনে নিবাই বুকের আগুন', 'কাটা ঘায়ে নুন', 'মোরে বেঁধে হুল', 'হিয়া মরে গুমরি', 'বেঁধে কলিজাতে শিক', প্রভৃতি শব্দবন্ধ কবির বিরহকাতর রক্তাক্ত মনেরই প্রতিচ্ছবি। প্রেমাবেগ মানুষকে একই সাথে তিক্ত ও মধুর অনুভূতি দেয়। বিরহে যেমন কাতর হয় মানুষ মিলনে তেমনি আনন্দে উদ্ভাসিত হয়। এই দুই বিপরীতমুখী অনুভূতি এবং প্রেমের নেশাধরা মত্ততাকে নজরুল প্রকাশ করেছেন:

"সখি মিষ্টি ও ঝাল মেশা এল এ কি বায়!
এ যে বুক যত জ্বালা করে মুখ তত চায়!
এ যে শরাবের মতো নেশা
এ পোড়া মলয় মেশা,
ডাকে তাহে কুলনাশা
কালামুখো পিক।
যেন কাবাব করিতে বেঁধে কলিজাতে শিক্!"

(রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৯৮)

১৩.

'মঙ্গলাচরণ' চিরায়ত বাংলার সনাতন ধর্মাবলম্বীদের (কিছু আচার দীর্ঘদিন এমনকি এখনো ধর্ম নির্বিশেষে সকল বাঙালিই পালন করে) বধূ-বরণ সম্পর্কিত কবিতা। প্রেম আছে, ব্যথিত হৃদয় আছে, প্রেমের আবেশ প্রকৃতির মধ্যে সঞ্চারিত আছে। এই বৈবাহিক সম্পর্কের সূত্রকে নজরুল গেঁথে দিয়ে জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্কের সাথে। শীতের কুয়াশা রাতে যখন আমের বউল বাউল হয়েছে বা পলাশ ফুলের পেয়ালা ভরে উঠেছে মধুতে তখন কোয়েলা তার সাথীকে খুঁজছে। আর মানবমন খুঁজছে তার 'সৃজন-দিনের বধূ'কে। শাঁখ বাজিয়ে, উলু ধ্বনি দিয়ে সেই হারা সতীকে বরণ করে নেয়া হচ্ছে। এই জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ককে তিনি তাঁর আরো কবিতা-গানেও প্রকাশ করেছেন। বিখ্যাত গান

'মোরা আর জনমে হংস-মিথুন ছিলাম'-এর মধ্যেও একই ধ্বনি ধ্বনিত। এই পুরাতন প্রেম বারবার হারিয়ে বারবার নূতন রূপে ফিরে ফিরে আসে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রেম দর্শনের মূল বিন্দুই ছিল এটা, তিনি তাঁর অনেক কবিতা-গানে এই ভাবনার প্রকাশ করেছেন। 'তুই ফেলে এসেছিস কারে'র মধ্যে যে নাড়ী-ছেঁড়া অপূর্ণতা তা স্রষ্টার সাথে সম্পর্কের বিন্যাসে বা জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্কে বন্ধনের আদলেও আস্বাদন করা যায়। রবীন্দ্রনাথের 'অনন্ত প্রেম' কবিতায় এই বক্তব্যই আছে– "তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি/ শত রূপে শত বার,/ জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার,/ চিরকাল ধরে মুগ্ধ হৃদয়/ গাঁথিয়াছে গীতহার,/ কত রূপ ধরে পরেছ গলায়,/ নিয়েছ সে উপহার/ জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।" এই কবিতায় নজরুলের ভাষ্যে তা নিম্নরূপে ধরা দিয়েছে:

"উঠিছে লক্ষ্মী ওই
তোমার ক্ষুধার ক্ষীরোদ-সাগর মন্থনে সুধাময়ী।
হারাবার ছলে চির-পুরাতনে নূতন করিয়া লভি,
প্রদোষে ডুবিয়া প্রভাতে উদিছে নিত্য একই রবি।

তাই সুন্দর সৃষ্টি
একই বরবধূ জনমে জনমে লভে নব শুভদৃষ্টি।
আদিম দিনের বধূ তব ওই আবার এসেছে ঘুরে
কত গিরিদরি নদী পার হয়ে তব অন্তর-পুরে।"

(রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৯৯)

১৪.

‘বধূ-বরণ’ কবিতা সম্পর্কে গবেষক বলছেন:

"বধূ-বরণ' কবিতাটিতে কবি নারীত্বের নবজাগরণ চেয়েছেন। বিবাহের রঙিন স্বপ্নে জীবন রঙিন হয়ে ওঠে। এরকম রঙিনতার মধ্যে নবজীবনের উদ্বোধন হোক, এই কবির একান্ত

কামনা। বিবাহিত প্রেমের যে রূপ তিনি চিত্রিত করেছেন তার নারীর স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদার বাণী উচ্চারিত।" (সুশীলকুমার, ১৯৯৭: ১৭৭)

এ কবিতায় বাঙালি বধূর চিরন্তন রূপ-সজ্জা এবং তার কাছ থেকে সমাজের যে প্রত্যাশা তা কবির শব্দে প্রকাশিত হয়েছে। নজরুল নারীকে তার সকল আভরণ ছিঁড়ে যেমন বের হয়ে যেতে বলেছেন আবার সকল কান্না লুকিয়ে হাসি আর আলো দিয়ে স্বামীর গৃহ ভরে রাখতেও বলেছেন। তিনিও তাঁর সমকালীন সময় এবং সমাজকে অস্বীকার করতে পারেননি তা এ কবিতায় স্পষ্ট। 'এ ঘরের হাসি নিয়ে যাও চোখে,/সে গৃহ- দ্বীপ জ্বেলো এ আলোকে,/ চোখের সলিল থাকুক এ-লোকে-/ আজি এ মিলন মোহানায়/ ও- ঘরের হাসি বাশিঁর বেহাগ/ কাঁদুক এ ঘরে সাহানায়।।' এসকল শব্দবন্ধের মতো করেই সকলে বাঙালি নারীকে পরামর্শ দিয়ে এসেছে কান্না লুকিয়ে শ্বশুরালয় আলোকিত করে রাখার জন্য। মহাভারতে আমরা গান্ধারীকে দেখি অন্ধ স্বামীর ধৃতরাষ্ট্রের সাথে সমব্যথী হয়ে নিজের চোখে কাপড় বেঁধে নিজেকেও অন্ধ করে রাখতে। কিন্তু কবি এখানে স্বামী অন্ধ হলে নারীর সত্য আচরণের আলো দিয়ে সে ঘর আলোকিত করে রাখতে বলছেন। বিয়ের লাল রক্তিম সাজেই যেন হয় নারীর নব জাগরণ:

"বিবাহের রঙ্গে রাঙ্গা আজ সব,
রাঙ্গা মন, রাঙ্গা আভরণ,
বলো নারী- "এই রক্ত- আলোকে
আজ মম নব জাগরণ!"
পাপে নয় পতি পুণ্যে সুমতি
থাকে যেন, হ'য়ো পতির সারথি।
পতি যদি হয় অন্ধ, হে সতী,
বেঁধো না নয়নে আবরণ
অন্ধ পতিরে আঁখি দেয় যেন
তোমার সত্য আচরণ।।"

(রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, ২০১৫: ১০০)

১৫.

'অভিযান' কবিতাটি কাব্যের মূল ধারার থেকে ভিন্ন ধাঁচের কবিতা। কবি এখানে নতুন পথের পথিককে আবাহন করেছেন অভিযান চালিয়ে নব উত্থান আনায়নের।

১৬.

আকাশ আর পৃথিবীর রাখিবন্ধনের আদ্যোপান্ত নিয়ে লেখা 'রাখীবন্ধন' কবিতাটি অনবদ্য প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা। একজন মানুষের কল্পনা কতখানি প্রখর হলে প্রকৃতির এমন সব অনুষঙ্গকে মানুষের আদলে রূপ দেয়া যায়। আকাশ-ধরণীর এই সই পাতানোয় সওগাত নিয়ে আসে মেঘের তরণী। যেমন 'মেঘদূত' এ অলকাপুরীতে যক্ষের প্রেমে-বিরহের বার্তা নিয়ে এসেছিল মেঘ। অলকার পানে বলাকা ছোটে ঠোঁটে কলমির কুঁড়ি নিয়ে পৃথিবীর পক্ষ থেকে ভেট নিয়ে। নানান আয়োজন করে হয় আসমানী আর মৃন্ময়ীর সখিবন্ধন। এ আয়োজনে আরো:

"আকাশ এনেছে কুয়াশা-উড়ুনি, আশমানি-নীল কাঁচুলি,
তারকার টিপ, বিজুলির হার, দ্বিতীয়া-চাঁদের হাঁসুলি।

ঝরা-বৃষ্টির ঝর ঝর আর পাপিয়া শ্যামার কূজনে
বাজে নহবত আকাশ ভুবনে – সই পাতিয়েছে দুজনে!"

(রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, ২০১৫: ১০২)

সকল আয়োজন শেষে যখন বন্ধনে বাঁধা পড়ে দুজন তখন 'হাসিয়া উঠিল আলোকে আকাশ নত হয়ে এলো পুলকে/লতা-পাতা-ফুলে বাঁধিয়া আকাশে ধরা কয়, "সই, ভূলোকে/বাঁধা পলে আজ", চেপে ধরে বুকে লজ্জায় ওঠে কাঁপিয়া,/চুমিল আকাশ নত হয়ে মুখে ধরণির বুকে ঝাঁপিয়া।' মনে হয় যেন কোন মানব-মানবীই পড়েছে বাঁধা একে অন্যের বন্ধনে। আবহমান বাংলার প্রকৃতির রূপে আকাশ-ধরণীর এ মিতালী যেন মানুষের সাথেই মানুষের মিতালী।

১৭.

'মাধবী-প্রলাপ'-এ যেমন নজরুল পুষ্প-বৃক্ষ-পক্ষীর মাঝে আদিরসের সঞ্চার করেছেন তেমনি 'চাঁদনিরাতে' কবিতায় নভোমণ্ডলের বিভিন্ন উপাদানের মাঝে প্রেম ছড়িয়ে দিয়েছেন। প্রেমিক নজরুল তাঁর প্রেমিকমন নিয়ে যেদিকে তাকিয়েছেন সেদিকেই প্রেম দেখেছেন। তাঁর ভাষায়:

"সাতাশ তারার ফুল-তোড়া হাতে আকাশ নিশুতি রাতে
গোপনে আসিয়া তারা-পালঙ্কে শুইল প্রিয়ার সাথে!
উহু উহু করি কাঁচা ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে নীলা হুরী,
লুকিয়ে দেখে তা "চোখ গেল" বলে চেঁচায় পাপিয়া ছুঁড়ি!
"মঙ্গল" তারা মঙ্গল-দীপ জ্বালিয়া প্রহর জাগে,
ঝিকিমিকি করে মাঝে মাঝে- বুঝি বধূর নিশাস লাগে!"

(রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, ২০১৫: ১০৩)

১৮.

প্রকৃতির রূপকে মানব-মানবীর প্রেম প্রকাশের একটি উৎকৃষ্ট রূপক কবিতা 'মাধবী-প্রলাপ'। বসন্ত ঋতুর আগমনে প্রকৃতি-রাজ্যে যে লীলা চলে তার শাব্দিক রূপায়ণ নজরুল এ কবিতায় করেছেন। এ কবিতায় আছে ইন্দ্রিঘন প্রেম, আছে যৌবনের উদ্দাম প্রকাশ। এ কবিতায় 'তার নিধুবন-উন্মন/ ঠোঁটে কাঁপে চুম্বন,/ বুকে পীন যৌবন/ উঠিছে ফুঁড়ি,/মুখে কাম-কন্ঠক ব্রণ মহুয়া-কুঁড়ি!' তে স্পষ্টত এক যৌবনবতী নারীর দৈহিক সৌন্দর্যের রূপই ফুটে ওঠে। 'অ-নামিকা' এবং 'মাধবী-প্রলাপ' কবিতা প্রকাশিত হবার পর তিনি নানাদিক থেকে সমালোচনার শিকার হয়েছিলেন। সজনীকান্ত দাস 'শনিবারের চিঠি'তে তীব্র সমালোচনা করেন এবং রবীন্দ্রনাথকে এসকল কবিতার অশ্লীলতার কথা স্মরণ করিয়ে দেন, রবীন্দ্রনাথ বিষয়টি তখন এড়িয়ে গিয়েছেন। 'কালি-কলম' সহ অন্যান্য পত্রিকাতেও তীব্র সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি নজরুল। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্তব্য করেছিলেন:

"যদি বলি এ কবিতায় ব্যঞ্জনা নেই, তা হলে আমার কবি বন্ধু হয়তো বলবেন, কেন রস তো প্রচুর পরিমাণে আছে, ব্যঞ্জনা নাই বা থাকল! কিন্তু তো সেই যা কাব্যের রেখাবন্ধনে ধরা দেয় না, বাক্যের ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে তার আভাস দেয়। আর ব্যঞ্জনার বাইরে তো রস

নেই। প্রশ্ন উঠবে, কেন পীন যৌবন, কামকণ্টক ব্রণ ইত্যাদি এমন সব রসের কথা বলা হয়েছে, তবুও কিনা বলছ যে রস নেই? মানুষের দেহবর্ণনায় কি রস নেই? যে কবিতাটি কিছু আগে উদ্‌ধৃত করে দিয়েছি, সেটি হচ্ছে আমার বন্ধু নজরুল ইসলামের। কবিতাটিতে একটা মাংস লোলুপতা ফুটে বের হচ্ছে। নারী শুধু মাংসপিণ্ড ভেবে তার বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু কবি তো ফোটগ্রাফার নন, শিল্পী।" (উদ্ধৃত, সুশীলকুমার, ১৯৯৭: ১৭৫)

কবির কল্পনাশক্তি কত প্রবল হলে তিনি মানবের কামনাকে বসন্তপ্রকৃতির মধ্যে সঞ্চার করে দিতে পারেন। যে কামনায় কবি নিজে দুলেছিলেন, দোলে চিরন্তন শ্বাশত মানব-মানবী, সেই কামনাই তিনি সঞ্চারিত করে দিয়েছেন ফুল-পাখি-প্রকৃতিতে:

"করে বসন্ত বনভূমি সুরত কেলি,
পাশে কাম-যাতনায় কাঁপে মালতী বেলি!
ঝুরে আলু-থালু কামিনী
জেগে সারা যামিনী,
মল্লিকা ভামিনী
অভিমানে ভার,
কলি না ছুঁতেই ফেটে পড়ে কাঁটালি চাঁপার!"

(রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, ২০১৫: ১০৪)

১৯.

কাব্যের শেষ কবিতা 'দ্বারে বাজে ঝঞ্ঝার জিঞ্জীর' কবিতাটিও কাব্যের মূলসুরের কবিতা-বহির্ভুত।

এ কাব্যের আলোচনার ইতি টানা যায় গবেষক আজহারউদ্দীন খানের একটা মূল্যায়ন দিয়ে:

"মানব-জীবনের সকল দিক দিয়ে নিজেকে ব্যক্ত করার যে একটি আকুলতা "দোলন-চাঁপা", "ছায়ানটে" একান্ত করে টানছিল তারই চরম প্রকাশ "সিন্ধু-হিন্দোলে" র মধ্যে মূর্ত

> হয়েছে। এখানে মন আর শুধু বাইরের কোলাহলে মত্ত নয়, বিচিত্রদৃশ্যের রসলীলার ছবি আঁকার কাজে ব্যস্ত, জীবনের সঙ্গে কবির আরও আত্মস্থ হওয়ার দুরূহ সাধনায় সে নিজেকে বিলিয়ে দিতে চায়। আত্মসমাহিত চিত্ত থেকে এ বইয়ে যে কবিতাগুলি পাতা জুড়ে বসেছে সেগুলির অধিকাংশই এক একটি হীরের টুকরো। যৌবনের বিচিত্র স্বপ্ন, প্রেম, নারীর সৌন্দর্য-রহস্য, জীবনের গভীর তাৎপর্য কিছুই কবিচিত্তের স্পর্শ হতে বাদ পড়েনি। তাই "সিন্ধু-হিন্দোল" বিস্ময়কর বই, কল্পনার অনায়াস লীলায়, সুললিত ছন্দের খেলায়, বিচিত্র বর্ণবহুল চিত্রের অজস্রতায় অপরূপ এই কাব্যখানি বাংলা-সাহিত্যের বিশেষ সম্পদ। আমার মতে "সিন্ধু-হিন্দোল" নজরুল-কাব্যসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য। যাঁরা বলেন, নজরুলের কাব্যধারায় ক্রম-অগ্রসরি গতির আবেগ নেই, সব কাব্য এক টেম্পোতে রচিত ও একই সুর-ঝংকারে ঝংকৃত তাঁদের "সিন্ধু-হিন্দোল" বইখানা পড়তে বলি। এর পাতায় পাতায় পংক্তিতে পংক্তিতে সমুন্নতির (sublimity) সঙ্গে রস-তন্ময়তা, ভাবের প্রাচুর্যের সঙ্গে দীপ্ত ঔদ্ধত্যের পরিচয় পেয়ে তাঁদের মন চমকে উঠবে।" (আজহার, ১৯৯৭: ২৯২)

পরিশেষে বলা যায়, 'সিন্ধু-হিন্দোল' যেন নজরুলের সিন্ধুরূপ অন্তঃলোকেরই হিন্দোল। কাব্যের কবিতাগুলোতে সাগরের ঢেউয়ের মতোই সদা প্রবহমান নজরুল-মনের বিভিন্ন রূপ ধরা পড়েছে। মনের এই বিচিত্র অনুভবকে প্রকাশ করতে তিনি অন্য আর সব কাব্যের মতো এখানেও প্রকৃতির বিভিন্ন অনুষঙ্গের আশ্রয় নিয়েছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চক্রবাক

১৯২৭-১৯২৯ সময়ফ্রেমে লেখা এ কাব্যের কবিতাগুলো তে নজরুলের প্রেম-প্রকৃতি-সৌন্দর্য চেতনা এবং স্থিত বিরহবোধের সমান্তরাল বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। কাব্যের নাম 'চক্রবাক' অর্থ হাঁসজাতীয় এক প্রকার পুরুষ পাখি। এই 'চক্রবাক' পাখি কবি এবং ব্যক্তি নজরুলের প্রতীকী রূপ হিসেবেই এসেছে। উৎসর্গ কবিতায় তিনি বলেছেন 'উড়ে এসেছিনু ভগ্নপক্ষ চক্রবাক/ তব শুভ্র বালুচরে, আবার নির্বাক/ উড়িয়া গিয়াছি কবে, আজো তার স্মৃতি/ হয়তো জাগিবে মনে শুনি মোর গীতি!/ শায়ক বিঁধিয়া বুকে উড়িয়া বেড়াই/ চর হতে আন্-চরে, সেই গান গাই!' এখান থেকেই বোঝা যায় এ কাব্যে এক ভগ্ন-হৃদয়ের কবিকে আমরা পাব। প্রেম বিষয়ক অন্যান্য কবিতার মতোই বিরহবেদনায় স্নাত এ কবিতাগুলোর অধিকাংশতে প্রকৃতির বিভিন্ন অনুষঙ্গের মধ্যে কোথাও তিনি মানসপ্রিয়াকে দেখেছেন, কোথাও নিজের বেদনাকে, প্রেমানুভবকে প্রকৃতি-অনুষঙ্গের ছাঁচে ফেলে প্রকাশ করেছেন, কোথাও প্রকৃতির স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের মাঝে মানবীয় আবেগ আরোপ করে নিজের হৃদয়াবেগকে তুলে ধরেছেন, তুলনা করেছেন।

১.

চক্রবাকরূপী প্রেমিক কবি তাঁর চক্রবাকীকে সম্বোধন করে শিরোনামহীন যে কবিতা লিখেছেন তা পড়লেই মানসপটে ভেসে ওঠে হারানো সঙ্গীর খোঁজে অপেক্ষমাণ এক বিরহী প্রেমিকের চিত্র। একা নদীতীরে পরিভ্রমণ করে যে সাথীকে তিনি খুঁজে ফেরেন নিকট অতীতেই তার সাথে গভীর প্রণয় ছিল, চঞ্চুতে (ঠোঁটে) এখনো তার চঞ্চুর চুমা আঁকা। 'রোদ লাগে' বলে ডানার তলে নানা ছলে যে পাখি মিশে মিশে থাকত তার কাছে কবির কাতর জিজ্ঞাসা, 'কাহার পিছনে ছায়াটির মতো ফিরিয়াছ পাছে পাছে,-'। এই পাখি সম্পর্কে ভারত উপমহাদেশীয় ধারাণা-সংস্কৃতিতে যা আছে তা সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন–

> "এরা হংসশ্রেণিভুক্ত — ইংরেজিতে Brahmany duck or Muddy goose. চক্রবাক দম্পতি (চখা-চখী) ইংল্যান্ডের turtle dove -এর মতো, ভারতে দাম্পত্য প্রেমের নিদর্শন। প্রবাদ, তারা সারাদিন একত্রে থাকে, কিন্তু কোনও এক মুনির অভিশাপে নৈশবিচ্ছেদ ভোগ করে, নদীর দুই তীরে পরস্পরকে আহ্বান করে রাত কাটায়। দিনের বেলায় একত্রে তাদের অনেকে দেখেছেন, কিন্তু তাদের নৈশবিচ্ছেদের প্রবাদ কতদূর সত্য, বলা যায় না।" (উদ্ধৃত, আতাউর, ১৯৯৭: ৯২)

'একা নদীতীরে গহন তিমিরে' চক্রবাকরূপী বিরহকাতর কবি যখন হারানো প্রিয়াকে খুঁজে ফেরেন তখন প্রিয়া সাড়া না দিলেও 'সাড়া দেয় বন', 'তটিনীর জল আঁখি ছলছল ফিরে চায় বাঁকে বাঁকে', ' সান্ত্বনা দেয় গিরি', ' অসীম আকাশ আসে মোর পাশ তারার দীপালি জ্বালি'। এভাবে বন, নদী, পাহাড়, আকাশের দীপালি যাঁকে সঙ্গ দেয় তাঁর চেয়ে বড় 'যোগী' বা রোমান্টিক কে হতে পারেন! মানবসঙ্গের সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে বেরিয়ে মুক্ত, অসীম প্রকৃতির সান্নিধ্যে যে নিজেকে এমনভাবে মেলে দিতে পারে তার হৃদয়ের সংবেদনশীলতার ব্যাপ্তি ও গভীরতা কতখানি হতে পারে!

শুরুর দিকের কবিতার সাথে এই পর্যায়ের কবিতায় নজরুলের প্রকাশভঙ্গিতে এসেছে বেশ পরিবর্তন। কবি যখন বিরহানলে দগ্ধ তখন যে সকল পুরনারী তাঁকে রূপ, ধন, যৌবনে বাঁধতে চেয়েছিল তাদের তিনি তীব্রভাবে আঘাত করেছেন কবিতার শব্দে। এ পর্যায়ের কবিতায় তাঁর প্রকাশ আরো কোমল ও নমনীয়। ঠোঁট-ভরা মধু নিয়ে কুলবধূ এসে তাঁকে 'সুখ-শেজ' পেতে আহ্বান করে 'তুমিও শূন্য আমিও শূন্য, এস মোরা হব সাথী!' এই আহ্বানে কবির মন সাড়া দেয়নি। মনে হয় যেন যার সাথে তাঁর পরানে পরান বাঁধা সেই চক্রবাকীকে ছাড়া তাঁর সত্তা হয়ে উঠেছে অর্ধাংশ। নিজেকে পূর্ণ করার জন্য সেই চক্রবাকী অভিমুখেই তার যাত্রা। 'কোথা কোন কূলে রহিলে গো ভুলে আমার চক্রবাকী!' — এই মন্ত্র আউড়ে তিনি আজীবন খুঁজে ফিরেছেন তাঁর দোসরকে।

নজরুল বৃহত্তর অর্থে বিরহী হলেও বিরহে তিনি ভেঙে পড়েন না, তাঁর প্রেমাবেগের মর্যাদা তিনি সমুন্নতই রাখেন সর্বদা। তিনি যখন বিরহের নিশি যাপন করেন তার প্রিয়া তখন

হয়তো বিভোর ' নবীন সাথীর প্রেম নব অনুরাগে'। কিন্তু, তাঁর বলিষ্ঠ-বিশুদ্ধ-একাগ্র প্রেমের বিশ্বাস:

"যখন প্রভাতে থাকিব না আমি এই সে নদীর ধারে,
ক্লান্ত পাখায় উড়ে যাব দূর বিস্মরণীর পারে,
খুঁজিতে আমায় এই কিনারায় আসিবে তখন তুমি-
খুঁজিবে সাগর-মরু-প্রান্তর গিরিদরী বনভূমি।
তাহারি আশায় রেখে যাই প্রিয়, ঝরা পালকের স্মৃতি-
এই বালুচরে ব্যথিতের স্বরে আমার বিরহ-গীতি!

যদি পথ ভুলে আস এই কূলে কোনো দিন রাতে রানি,
প্রিয় ওগো প্রিয়, নিও তুলে নিও ঝরা এ পালকখানি।"

(রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড, ২০১৫: ৬)

চক্রবাকরূপী কবি যেন বিরহে খানিকটা স্থবির ও শান্ত হয়ে গিয়েছে। প্রথম দিককার বিরহ-সাগরের যে কল্লোলিত ঢেউ তা এখানে অনুপস্থিত। এখানে আছে গভীরতা নিয়ে ধীরভাবে বয়ে যাওয়া। কবিতার এই দিকটা নিয়ে আলোচক আতাউর রহমান বলেছেন:

"একটি বিরহ-ব্যথিত প্রাণের গভীর বেদনার অনুরণন 'ওগো ও চক্রবাকী' কবিতা। কবিতাটিতে বেদনার গভীরতা আছে কিন্তু ক্ষুব্ধমনের জ্বালা নেই। ওয়ার্ডসওয়ার্থ যাকে বলেছেন, 'Emotion recollected in tranquillity' – এ তাই। ব্যর্থ প্রণয়ের করুণ সুর ধ্বনিত হচ্ছে। নজরুলের প্রথম জীবনের প্রেমের কবিতাগুলিতে যে উদ্দামতা ও অস্থিরতা দেখা যায়, তা শান্ত হয়েছে এসেছে। স্থির প্রশান্তিতে কবিতাটি স্নিগ্ধ ও সুন্দর। জীবনের কঠিন বেদনা ও প্রবঞ্চিত জীবনের শূন্যতায় প্রেমিক হৃদয় ভেঙে পড়েনি।" (আতাউর, ১৯৯৭: ৯৩)

২.

সংবেদনশীল মনের কবির অনুভব থেকে এ চিন্তা বাদ যায় না যে, যখন তিনি বিরহাক্রান্ত তখন কবিপ্রিয়া যে সর্বদাই অন্য কারো প্রেমে বিভোর থাকে তা নয়, কখনো দুজনেই সমভাবে বিরহী থাকে। এখানে প্রিয়া আর অন্যঘরে সুখ-শয্যা নির্মাণে রত নয়। সামাজিক,

পারিবারিক, আদর্শিক, ধর্মীয় বহুবিধ কারণে মানুষ মনের মানুষ থেকে দূরে চলে যায়, না চাইতে ঘর বাধে অন্য কারো সাথে। কৈশোরের আবেগী প্রেম এ বিচ্ছেদ মানতে পারে না, দোষারোপ করে বিপরীত জনকে; আঁখির জলের আহাজারিতে বিদীর্ণ করে চারপাশ, নিজেকে আঘাত করে, অন্যকেও আক্রমণ করে। কিন্তু একটা বয়স আর অভিজ্ঞতার পরে মানুষ শান্ত হয়ে যায়। ছোট পুকুরে একটা ঢেলা ছুড়ে মারলে যেমন আন্দোলিত হয় বিশাল গভীর সমুদ্রে তেমন হয় না। বেদনার ক্ষেত্রেও তাই সত্যি। কথিত আছে 'অল্প শোকে কাতর আর অধিক শোকে পাথর'। কথাটি যথার্থ। 'তোমারে পড়িছে মনে' কবিতায় এপাশে যখন 'সিক্ত-পক্ষ কবি' প্রিয়াবিরহে কাতর তখন কবিকল্পনায় প্রিয়াও 'ম্লান লুলিত অঞ্চলে' দূরে চেয়ে একা বসে আছে, তার শিয়রের বাতি বারবার নিভে যায় আর বারবার সে আঁখি-জল মোছে। এবং যখন 'তোমার গগনে ঝরে ধারা অবিরল' তখন 'আমার নয়নে হেথা জল নাই, বুকে ব্যথা করে টলমল।' এমন সমব্যথী হয়ে কোথা কোন বাতায়নে 'বিরহ-বিধুর' প্রিয়া বসে আছে, দিশেহারা শ্রাবণের অশান্ত পবনের মতো কবির 'উচাটন মন' তার পানে ছুটে ছুটে যায়। কিন্তু এ-পারে কবি আর ও-পারে প্রিয়া কোনো কূল নাই। এই অনতিক্রম্য দূরত্বের 'স্মরণ-পারের' প্রিয়াকে কবির মনে পড়ছে প্রকৃতির অনুষঙ্গে — 'আজি নীপ-বালিকার ভীরু-শিহরণে,/ যূথিকার অশ্রু-সিক্ত ছলছল মুখে/ কেতকী-বধূর অবগুণ্ঠিত ও বুকে-/ তোমারে পড়িছে মনে।' মনের প্রিয়া বুঝি মনেই থাকে বাস্তবে ধরা দেয় না কবির। সে-প্রিয়াকে শুধু মনেই পড়ে, সে শুধু স্মৃতিতেই থাকে। মানব জীবনের জন্য এটাই সত্য যে প্রেমে ছিল, প্রেরণায় ছিল এমন প্রিয়রা বা প্রিয়ারা জীবনের সব অধ্যায়ে পাশে থাকে না অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। ভালোবেসে, ভালোবাসা তৈরি করে, ঋণী করে চলে যায় দূরে বহুদূরে। পাশে থাকে তারা যাদের হয়তো সর্বান্তকরণে চাইনি আমরা:

"আমি হেথা রচি গান নব নীপ-মালা–
স্মরণ-পারের প্রিয়া, একান্তে নিরালা
অকারণে! —জানি আমি জানি
তোমারে পাবো না আমি। এই গান এই মালাখানি
রহিবে তাদেরি কণ্ঠে - যাহাদেরে কভু
চাহি নাই,কুসুমে কাঁটার মতো জড়ায়ে রহিল যারা তবু।"

(রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড, ২০১৫: ৭)

৩.

'বাদল-রাতের পাখি' বলে কবি নিজেকেই নিজে সম্বোধন করছেন। এ কাব্যের কবিতাগুলোতে তিনি কখনো সিক্ত-ডানার পাখি, কখনো ভগ্নপক্ষ চক্রবাক, কখনো বাদল-রাতের পাখি। এ সকল প্রতীকের মধ্য দিয়েই বোঝা যায় কবির কাতরতা। স্মরণ-পাড়ে যে প্রিয়া বা প্রিয় থাকে সে সবসময়ই যে সমব্যথী হয় তা তো নয়। কবি নিজেকে নিজেই স্বান্ত্বনা দিচ্ছেন — 'বন্ধু, বরষা-রাতি/ কেঁদেছে যে সাথে সে ছিল কেবল বর্ষা-রাতেরি সাথী!' এমনও তো হয় সম্পর্কে; একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, নির্দিষ্ট কারণে মানুষ সাথে থাকে। সেই কারণ বা সেই সময় ফুরিয়ে গেলে আর যায় না তাকে পাওয়া। কত নিষ্ঠুর বস্তুবাদী হিসাবে যাতাকলে পিষ্ট হয় কোমল হৃদয়ের বিশুদ্ধ প্রেম। যখন সে বুঝে ওঠে এই নিষ্ঠুরতা তখন মাথা কুটে কাঁদা ছাড়া আর কী বা বাকি থাকে তার। ময়লা পরিষ্কারের সময় পরিষ্কারকের দরকার হয় বটে, ধোবার সময় পানির সাথে পরিষ্কারককেও ধুয়ে ফেলেই পরিচ্ছন্ন করা হয়। মানবজীবনেও এটাই সত্য হয়তো। কেউ কেউ জীবনের দুঃখময় অধ্যায় পার হলে পিছনে ফেলে যায় দুঃখদিনের সাথীকেও। বর্ষা-রাতে যাকে সাথী করা হয় ফাল্গুনী-রাতে সে অযাচিত, বেমানান হয়ে ওঠে কারো কারো ক্ষেত্রে। মনকে বুঝাতে হয়, ফিরিয়ে আনতে হয় ; মানুষ ফিরিয়ে দেয় যাকে তাকে বিশ্বপ্রকৃতি কোলে তুলে নেয়, সঙ্গ দেয়। কবির ভাষায়– 'শাওনে যাহারে পেলে না, তারে কি ভাদরে পাইবে দেখা?' এ প্রশ্নের উত্তর জানে সে, কিন্তু মনকে বোঝায় কী দিয়ে? তার সে কাঁদন দেখে 'ভাঙিয়া পড়েছে আকাশের মেঘ গহিন শাওন-রাতে'। কবি নিজেই যে প্রকৃতি হয়ে তাঁর বেদনাকে ভাষা দিচ্ছেন এ পর্যায়ের কবিতা গুলোতে এই প্রবণতা সম্পর্কে প্রাবন্ধিক বলেছেন:

> "প্রকৃতির মধ্যে আত্মভাবের বিস্তার এবং একই সঙ্গে প্রকৃতির উপাদান-সান্নিধ্যে অন্তর-ভাবনার উন্মোচন রোম্যান্টিক কবির সহজাত বৈশিষ্ট্য। *চক্রবাক* কাব্যে নজরুলের এই রোম্যান্টিক সত্তার প্রকাশ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ইতঃপূর্বের কাব্যসমূহেও আমরা নজরুলের প্রকৃতিচেতনার পরিচয় পেয়েছি, কিন্তু *চক্রবাক*-এ এসে লক্ষ্য করছি, এখানে প্রকৃতি নজরুলের প্রজ্ঞাশাসিত এবং অভিজ্ঞতালব্ধ মানসতার স্পর্শে এসে হয়ে উঠেছে সংহত, সংযত এবং শূন্যতা তথা বেদনার প্রতীকী-ধারক।" (বিশ্বজিৎ, ২০২১: ৫৬)

বেদনার দিনের অবসানের সাথে অপসৃত হয় বেদনা দিনের সাথীও। দৃশ্যপট বদলে যায়; আনন্দ দিনে সবার জলভরা আঁখি হাসি-উজ্জ্বল হয়, বিধুরা বধূ খোঁপায় শালুকের কুঁড়ি গোঁজে, 'কমল-দিঘিতে কমল-মুখীরা অধরে হিঙুল মাখে', নয়নে তেরছা জাদুর চাহনি, ভাবে তনু ঢলঢল, — এমন আনন্দ-দিনে বরষা-রাতের বন্ধুকে তো সচরাচর চিনে নেয় না কেউ, চমকে ওঠে না তার গান শুনে। এহেন পরিস্থিতিতে মন তো বুঝতে চাইবে না, বারবার ফিরে পেতে চাইবে পুরনো সাথীকে। বিরহ-ব্যবস্থাপনায় অবুঝ মনকে নিঠুর বাস্তবতাকে মেনে নিতে আমাদের বুঝাতে হয়, নজরুলও বুঝিয়েছেন:

"ভিন-দেশি পাখি! আজিও স্বপন ভাঙিল না হায় তব,
তাহার আকাশে আজ মেঘ নাই-উঠিয়াছে চাঁদ নব!
ভরেছে শূন্য উপবন তার আজি নব নব ফুলে,
সে কি ফিরে চায় বাজিতেছে হায় বাঁশি যার নদীকূলে?
বাদল-রাতের পাখি!
উড়ে চল -যথা আজো ঝরে জল, নাহিকো ফুলের ফাঁকি!"

(রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড, ২০১৫: ৯)

৪.

মানবজীবনে একপাক্ষিক প্রেম আসে, এসেছিল নজরুলের জীবনেও। এবং 'স্তব্ধ রাতে' যখন মনে পড়ে সকল কথা, সকল ব্যথারা তাদের স্বরূপ ধরে সামনে এসে দাঁড়ায়, রাতের কোলাহল থেমে যায় তখন মনের গভীরতর গূঢ় বেদনা গুমরে ওঠে, অতন্দ্র নয়ন-পাতায় নেমে আসে সাথী আঁখি-জল। এ কবিতায় নিজেকে নজরুল 'সুখবাদী', 'ভীরু', 'অভিমানী' বলে সম্বোধন করছেন। স্তব্ধ রাতের আকাশে যখন শিশির ঝরে, বনে ঝরে ফুল তখন বুকের ব্যথারে কবি আঁখিজল হয়ে নেমে আসতে বলছেন। এ যেন নিজের ব্যথার সাথে নিজে বোঝাপড়া করে নেয়া। কালের পর কাল নিজের অন্তহীন শূন্যতাকে কবি কুয়াশার চাদরে ঢেকে রেখেছেন। ব্যর্থ প্রেমে একের পর এক গানের বাণীর নিবেদন করে গিয়েছেন। এমন একপাক্ষিক প্রেম ঘরে টানে না, অবহেলায় দূরে ঠেলে ভিখারি করে দেয়। নিজেকে নিজে জিজ্ঞেস করছেন 'সুরের সুরায় মেতে কতটুকু কমিল রে মর্মদাহ তোর?' না কমলেও কি কিছু করার ছিলো তাঁর? থাকে কারো? থাকে না। নীরব এসব

নিবেদন যার জন্য সে জানে না কখনো, সে থাকে অন্য ধ্যানে। এপাশে একজনের যখন জল-ভরা আঁখি তখন ওপাশে আরেকজনের থাকে ঘুম-ভরা চোখের পাতা। নজরুল যে গান-কবিতা-আড্ডায় মত্ত হয়ে থাকতেন সেটা তাহলে কোনো গভীরতর অন্তর্বেদনা লুকানোর জন্য? অভিমানী কবি ভিক্ষাপাত্র নিয়ে সকলের দ্বারে গিয়েছেন, শুধু প্রাণপণে চেয়েছেন যাকে তার দ্বারেই যাননি। কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন:

"ওগো উদাসিনী,
তব সাথে নাহি চলে হাটে বিকিকিনি।
কারো প্রেম ঘরে টানে, কেহ অবহেলে
ভিখারি করিয়া দেয় বহু দূরে ঠেলে!
জানিতে আসিনি আমি, নিমেষের ভুলে
কখনো বসেছ কি না সেই নদী-কূলে,
যার ভাটি-টানে–
ভেসে যায় তরী মোর দূর শূন্য-পানে।
চাহি না তো কোনো কিছু, তবু কেন রয়ে রয়ে ব্যথা করে বুক,
সুখ ফিরি করে ফিরি, তবু নাহি সহা যায়
আজি আর এ-দুখের সুখ।...

আপনারে ছলিয়াছি, তোমারে ছলিলি কোনোদিন,
আমি যাই, তোমারে আমার ব্যথা দিয়ে গেনু ঋণ।"

(রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড, ২০১৫: ১১)

৫.

প্রকৃতির আড়ালে, প্রকৃতির রূপকে প্রেম প্রকাশের ধারায় নজরুলের অনবদ্য কবিতা 'বাতায়ন-পাশে গুবাক-তরুর সারি'। ১৯২৯ সালের ২৪শে জানুয়ারি চট্টগ্রামে নাহার-বাহারদের বাড়িতে এটি রচিত। আক্ষরিক অর্থে প্রিয়াসম সুপারি গাছদের কাছ থেকে

বিদায় নিচ্ছেন কবি; কিন্তু, সুপারি কাছের আড়ালে যে মানবসাথী বিরাজমান তাকে অনুভব করা যায় কবিতার অন্তরে। এ প্রসঙ্গে গবেষক বলেছেন:

> "এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে, কোনো নারী তাঁর কল্পনা এবং আবেগকে উস্কে* দিয়েছিলেন, কিন্তু সরাসরি সেই প্রেমের কথা বলা সম্ভব ছিলো না।...। অতীতে নার্গিস, প্রমীলা, ফজিলাতুন্নেছা, প্রতিভা সোম, উমা মৈত্র প্রমুখ যেমন কবির কবিত্বকে জাগিয়ে তুলেছিলেন, তেমনি শামসুন নাহারও নজরুলের কবিত্বকে উস্কে দিয়েছিলেন কিনা কে জানে! এর আগে ১৯২৬ সালের আগস্ট মাসে শামসুন নাহারকে কবি আবেগে উচ্ছ্বসিত যে সু-দীর্ঘ চিঠিটি লিখেছিলেন, সেটির কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়া স্বাভাবিক।" (গোলাম মুরশিদ, ২০২১: ৩৩১)

মুসাফির এ কবিকে অস্ত-আকাশের চাঁদ অলিন্দে শীর্ণ কপোল রেখে বিদায়ের বার্তা বলে যায়। এ বিদায়বার্তায় হঠাৎ রাতজাগা কবি বাতায়ন পাশে নিশীথ রাতের বন্ধু সুপারী গাছের পরশ পান। সুপারিপাতা যেন প্রিয়ার সুশীতল করতল, শাখার পল্লবমর্মর যেন প্রিয়াকণ্ঠের সকাতর আবেদন, সুপারি গাছের দীর্ঘতা প্রিয়ার দীঘল দেহ, ঝির্ ঝির্ মির্ মির্ শব্দ প্রিয়ার কুণ্ঠিত বাণী, শাখায় ঝোলে তার শাড়ির আঁচল, আর পাখার হাওয়া আঙুল-পরশের নিবিড় আদর ছাওয়া। স্বপনে গোপনে এসে যে-প্রিয়া তপ্ত ললাট চুম্বন করে গিয়েছে আজ বিদায়বেলায় তাকে জানতে, তার কাছে নিজেকে জানাতে সাধ জাগে। কিন্তু, সময় বড় অল্প! তাই জানাজানির অবসর মেলেনি, নিতে হয়েছে নিজের মতো করে নির্মাণ করে:

> "হয়তো তোমারে দেখিয়াছি, তুমি যাহা নও তাই করে,
> ক্ষতি কি তোমার, যদি গো আমার তাতেই হৃদয় ভরে?
> সুন্দর যদি করে গো তোমারে আমার আঁখির জল,
> হারা-মোমতাজে লয়ে কারো প্রেম রচে যদি তাজ-ম'ল,
> -বলো তাহে কার ক্ষতি?
> তোমারে লইয়া সাজাব না ঘর, সৃজিব অমরাবতী!.. "
>
> (রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড, ২০১৫: ১২)

এই গুবাকরূপী প্রিয়ার শাখায় কখনো কোনো পাখি বসেনি, নিশীথে বাতায়ন খুলে কেউ জাগেনি তাকে চেয়ে, তার পাতায় প্রথম প্রণয়-লেখা কবিই লিখেছেন। এই বালিকা প্রণয়িনীর প্রথম প্রেম-পরশ তিনি পেয়েছেন এটাই তাঁর সান্ত্বনা। কিন্তু, তিনি জানেন প্রেয়সীরূপী গুবাকসারির তাঁকে মনে পরলেও হাহাকার ছাড়া তার কী বা আর করবার আছে, কারণ বালিকা যেমন সমাজ-পরিবারের শাসনে বাঁধা, মাটিতে বাঁধা গুবাক তরুও। ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণে মানুষের জীবন বড়ো শোচনীয় ছিলো, পরাধীন ছিলো; আর নারী তো পরাধীনদের মধ্যে পরাধীনতম। নারীর এই শৃঙ্খলকে নজরুল শিল্পরূপ দিয়েছেন:

"মলিন মাটির বন্ধনে বাঁধা হায় অসহায় তরু,
পদতলে ধূলি, ঊর্ধ্বে তোমার শূন্য গগন-মরু।
দিবসে পুড়িছ রৌদ্রের দাহে, নিশীথে ভিজিছ হিমে,
কাঁদিবারও নাই শকতি, মৃত্যু-আফিমে পড়িছ ঝিমে!"

(রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড, ২০১৫: ১৩)

বনফুলের 'নিমগাছ' কবিতার সেই গৃহবধূর মতো (নিমগাছটার ইচ্ছে করতে লাগল লোকটার সঙ্গে চলে যায়। কিন্তু পারলে না।মাটির ভেতর শিকড় অনেক দূরে চলে গেছে। বাড়ির পিছনে আবর্জনার স্তূপের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইল সে।
ওদের বাড়ীর গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মী বউটার ঠিক এই দশা।) এ প্রিয়াও চাইলেই পারবে না সরতে, তাই কবির তার প্রতি যে কথন তা হলো কখনো স্মরণে আসলে ভুলে যেও, 'খুঁজো না তাহারে গগন-আঁধারে -মাটিতে পেলে না যাকে!'

৬.

সখীসম 'কর্ণফুলী' নদীর কাছে কবি এসেছেন তাঁর বেদনার অশ্রুগুলি উজার করে দিতে যেমন করে মানুষ তার প্রিয় বান্ধবের সাথে ভাগাভাগি করে মনঃপীড়া। কিন্তু উদাসী, নিত্য বহমান এ নদী আপন মনে বয়ে চলে তার পথে, তার কূলে নীড় রচনা করে কতজন গেল অকূলে ভেসে, কত চেনাজানা নিত্য বাস করা মানুষ তার দিশা পেল না, দু'দিনের অতিথি কবি কি তার দিশা পাবেন? এ আশংকা মনে রেখেই কবি হৃদয় নিংড়েছেন তার তীরে, চখা

হয়ে কেঁদে কেঁদে তার চখীকে খুঁজেছেন, জিজ্ঞাসা করেছেন নদীকে, 'তুমি কি আমার বুকের তলার প্রেয়সী অশ্রুমতী?'। নদীর জলকে কবি বলছেন 'পাহাড়ের হাড়-গলা আঁখি-জল'; যে পাহাড়কে বজ্র বিঁধতে পারেনি, ঝড় উড়াতে পারেনি, ভূমিকম্প টলাতে পারেনি, সেই পাহাড়ের চোখের জল অবিরাম ধারায় বয়ে চলেছে তাহলে কত অভিমান জমা ছিল তার বুকে! পাহাড়কে নর অর্থাৎ নিজের রূপকে এনে নদীকে নারীরূপে কবি বলেছেন:

"তুই নারী, তুই বুঝিবি না নদী পাষাণ-নরের ক্লেশ,
নারী কাঁদে-তার সে আঁখিজলের আছে একদিন শেষ।
পাষাণ ফাটিয়া যদি কোনোদিন জলের উৎস বহে,
সে জলের ধারা শাশ্বত হয়ে রহে রে চির-বিরহে!
নারীর অশ্রু নয়নের শুধু; পুরুষের আঁখি-জল
বাহিরায় গলে অন্তর হতে অন্তরতম তল!"

(রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড, ২০১৫: ১৫)

সমাজে প্রচলিত যে কথা আমরা শুনে শুনে আসছি যে পুরুষের চোখের জল সহজে আসে না যতটা মেয়েদের আসে, নজরুলও শুনেছিলেন নিশ্চয়ই বা নিজের জীবনভিজ্ঞতা দিয়ে দেখেছেনও তাই, তার কী অনবদ্য প্রকাশ তিনি করলে কর্ণফুলী নদীর উৎপত্তি পাহাড় লুসাইকে কেন্দ্র করে। 'কর্ণফুলী' নদীর নামকরণেও কবি খুঁজে পেয়েছেন প্রিয়সন্ধানী এক তরুণীকে যার আনমনে পানিতে খুলে পরা কানফুল নিজ কর্ণে পড়ে নাম ধারণ করেছে 'কর্ণফুলী'। প্রিয়হারা বা প্রিয়খোঁজা যত পৌরাণিক চরিত্র আছে কবির মনে হয় নদীটির উৎসপাহাড়ে তারা আছে আর তাদের সেই বেদনাগলা অশ্রুই প্রবাহিত হয়ে চলেছে নদীরূপে। যক্ষ, মেঘদূত, ফরহাদ, মজনু, শকুন্তলা-মৃগ, মহাশ্বেতার সাথে যুগে যুগে প্রিয়াহারা সবার মাঝে মিশে কবির আবেগ হয়ে ওঠে ব্যক্তি থেকে সর্বজনীন। এ কবিতায় যার প্রতি কবির প্রেম প্রকাশ তার কাছে লাজভয় ফেলে বারবার ফিরে আসেন কবি, চট্টগ্রামেও ওটা কবির দ্বিতীয়বার আসা ছিল। পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরবে জেনেও যেমনে আগুনের পাশে ঘোরে তেমনি কবিও আসেন ঘুরেফিরে, আবহমান কাল ধরে মানুষও ঘুরছে। যে হৃদয় স্বেচ্ছায় প্রেমে বলি হতে আসে তাকে তো ফেরানো যায় না। স্বপ্নে নদীর বুকের ডাক শুনে জীবনের সব প্রয়োজন মিটিয়ে কবি এসেছেন সলিলে ডুবে

মরতে। কবিতার শেষাংশের এহেন আবেগী সমাপ্তি সম্পর্কে সমালোচক আতাউর রহমান বলেছেন:

> "শেষাংশে সংযম রক্ষিত হয়নি। নদীর জলে ডুবে মরবার সাধে অতিরিক্ত ভাবালুতা প্রকাশ পেয়েছে। নদীর শীতল জলে জীবনের জ্বালা মেটাবার কল্পনা অত্যন্ত তরল এবং গতানুগতিক।" (আতাউর, ১৯৯৭: ৯৫)

কিন্ত, জীবনভর অন্যের প্রয়োজন মিটিয়ে বেলাশেষে কবি দেখেন তাঁর নিজের মনই উপবাসী। এই বঞ্চনা-ব্যথা নিয়ে আবেগী কবি আত্মবিসর্জন দিতে চান। কিন্তু, তিনি এও জানেন যে আত্মবিসর্জন দিয়ে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে যায় সে শুধু নিজেই যায়, বাকি পৃথিবী তেমনি চলতে থাকে। কারো প্রস্থানে জগতের চিরন্তন প্রবাহ থামেনি কোনোদিন, কিঞ্চিৎ দোলা লাগে হয়তো:

> "হয়তো ঈষৎ উঠিবে দুলিয়া, তারপর উদাসিনী,
> বহিয়া চলিবে তব পথে তুমি বাজাইয়া কিঙ্কিণী!
> শুধু লীলাভরে তেমনি হয়তো ভাঙিয়া চলিবে কূল,
> তুমি রবে, শুধু রবে নাকো আর এ গানের বুলবুল!
>
> তুষার-হৃদয় অকরুণা ওগো, বুঝিয়াছি আমি আজি-
> দেউলিয়া হয়ে কেন তব তীরে কাঁদে 'সাম্পান'-মাঝি!"
>
> (রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড, ২০১৫: ১৭)

৭.

'সিন্ধু-হিন্দোল' কাব্যে 'সিন্ধু' কবিতায় কবি সাগরের বর্ষা-উন্মত্ত উত্তাল রূপের সাথে নিজের বিক্ষুব্ধ আবেগকে মিলিয়েছেন। শীতকালে যখন সাগর শান্ত সমাহিত রূপে থাকে তখন সেই সিন্ধুপারেই আবার কবি তাঁর বিরহ-উদ্বেলিত হৃদয় উন্মুক্ত করেছেন। সিন্ধু এখানে প্রিয়াও নয়, কবি নিজেও নয়; সিন্ধু বন্ধুসম, সিন্ধু আবেগের আধার। আছে উপেক্ষিত প্রেম, আছে একপাক্ষিক নিবেদনের অভিমান ও যন্ত্রণা। বর্ষার সিন্ধুর কাছে

ঝিনুক কুড়াতে এসে মণি হারিয়ে নোনা জল নিয়ে গিয়েছিলেন। তবুও কেন তাঁর পুনর্বার আসা? এসেছেন দেখতে সাগরের 'বিরহ-বিথার' রূপ, এসেছেন সেই কারণে, যে কারণে:

"যে চিতা জ্বলিয়া, —যায় নিভে চিরতরে,
পোড়া মানুষের মন সে মহাশ্মশানে
তবু ঘুরে মরে কেন, —- কেন যে কে জানে!
প্রভাতে ঢাকিয়া আসি কবরের তলে
তারি লাগি আধো-রাতে অভিসারে চলে
অবুঝ মানুষ, হায়! — ওগো উদাসীন,
সে বেদনা বুঝিবে না তুমি কোনোদিন!"

(রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড, ২০১৫: ১৮)

এমন অকারণ কারণেই মানুষ ফিরে ফিরে আসে পুরাতন জায়গায়। আর এটাই মানুষের প্রধানতম চালিকাশক্তি যারা হৃদয়ের সাধনা করেন তাদের। বস্তুগত কিছু পাবার আশা হয়তো থাকে না কিন্তু, নিজেকে পাওয়া যায়; নিজের যে অংশ রেখে যাওয়া হয়েছে সেথায় তার সাথে পুনর্মিলন হয়। ঠিক এ কারণেই মানুষ তার পুরাতন ভিটা ছেড়ে যেতে চায় না, প্রিয়জনের সমাধি-সংলগ্ন বাড়ি ছেড়ে যেতে চায় না। কারণ, সেখানেই আছে তার জীবন-যৌবনের সকল অধ্যায়, তাই এ জায়গার মাহাত্ম্য শুধু সে-ই বুঝতে পারে, অন্যে নয়। বস্তুগত প্রাপ্তি কবির কাছে তেমন আবেদন রাখে না, কারণ তিনি জানেন কিছু বাহ্যিক প্রাপ্তি থাকলেও 'মালার সাথে যদি না মেলে হৃদয়' সে মালা মূল্যহীন; সে প্রাপ্তির প্রতি প্রেমিক সর্বদাই উদাসীন। অভিমান মানুষ শান্ত করে দেয়, আবেগের গতি রুদ্ধ করে দেয়। সিন্ধুর প্রেমিকা চাঁদ দূরে দূরে বিচরিয়া বেড়ায় বলে অভিমানে সিন্ধুর বিষন্নতা মাখা মুখ, এলানো দেহ, বিশীর্ণ কপোল নিয়ে কূলে কূলে কাঁদা। সিন্ধুর 'কলঙ্কী বঁধু চাঁদ' যেমন বিষন্ন সিন্ধুকে রেখে পথে পথে ভ্রমণ করে বেড়ায় তেমনি কবিহৃদয়ও যাকে নিশিদিন চাইছে সেই প্রিয়াও তাঁকে অবহেলে ছুটছে অন্য পানে।

বুকের প্রিয়াকে রেখে যে পথের প্রিয়াকে খুঁজে বেড়ায় তার মনের প্রান্তর, সিন্ধুবন্ধুর মনের প্রান্তর সবতেই তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল; এখানে কূল খুঁজে পাওয়ার সাধ্য কার। অনায়াসে নজরুল এখানে পৃথিবীর গড়নের সাথে মানুষের মনের গড়নকে মিলিয়ে

দিলেন। প্রেমের কবিতার শরীরে কী অনায়াস দেহতাত্ত্বিক অধ্যাত্মবোধের প্রবেশ! কূল না মিললেও অতীত বর্ষায় যে লীলা-সাথী ছিলো শীতের রাতের নব অভিসারে একবারো কি পড়বে না মনে তার? আত্মবিশ্বাসী প্রেমিক নজরুল বিরহী হলেও দৃঢ়! যতই দূরে থাকুক তার প্রিয়া এ ব্যথাসুর তার হৃদয়েও বাজবে, ছুঁয়ে যাবে তারও মনের প্রাঙ্গন:

"... —- যদি কানাকানি
হয় তব কূলে কূলে আমার সে ডাক!
এ কূলে বিরহ-রাতে কাঁদে চক্রবাক,
ও-কূলে শোনে কি তাহা চক্রবাকী তার?
এ বিরহ একি শুধু বিরহ একার?
কুহেলি-গুণ্ঠন টানি শীতের নিশীথে
ঘুমাও একাকী যবে, নিঃশব্দ সংগীতে
ভরে ওঠে দশ দিক, সে নিশীথে জাগি
ব্যথিয়া ওঠে না বুক কভু কারো লাগি?"

(রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড, ২০১৫: ২০)

ব্যথিয়া ওঠেই। কিন্ত, বিরহী কবির কাছে যে বিরহই চিরন্তন –--'কেবলি অনন্ত জল অনন্ত বিচ্ছেদ/ হৃদয় কেবলি হানে হৃদয়ে নিষেধ;'। এ নিষেধে, এ বিরহে গৃহবাসী উদাসীন, নদী দিশেহারা, ফুল ফুটে ঝরে যায়। এতো বিরহের পাশেও মিলনের গানও তো পাখি গায়, ফুলও বরণমাল্য হয়, গৃহেও প্রেম রয়; হয়তো এর লাগি নয়তো ওর লাগি। কিন্তু, বসন্তে মালা সহজেই মেলে, যখন জল শুকায় ফুল ঝরে তখন কে আসে ফুল-জল নিয়ে প্রকৃত প্রিয় বিনে! ব্যথিত, বঞ্চিত, অবহেলিত যারা প্রেমে তাদের বিশ্বাস এবং কবিরও বিশ্বাস এমন দিনে তারা স্মরিত হবেন, প্রিয়পাশে প্রেম নিয়ে আসবেন; আজ বিদায়:

"যে-দিন ও-বুকে তব শুকাইবে জল,
নিদারুণ রৌদ্র-দাহে ধূ ধূ মরুতল
পুড়িবে একাকী তুমি মরুদ্যান হয়ে
আসিব সেদিন বন্ধু, মম প্রেম লয়ে!
আঁখির দিগন্তে মোর কুহেলি ঘনায়,
বিদায়ের বংশী বাজে, বন্ধু গো বিদায়!"

(রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড, ২০১৫: ২২)

৮.

'কর্ণফুলী' কবিতায় জীবনভরে অপরের প্রয়োজন মেটানো, 'শীতের সিন্ধু'তে বিদায় নেয়া বঞ্চিত কবিমন এবার স্রোত-বারিরূপী 'মুসাফির পথচারী'।এ কবিতা সম্পর্কে নজরুল-গবেষক বলেছেন:

> "পথচারী নদীর গতির মধ্যে নজরুল-কবিমানসের গতিশীলতা স্পন্দিত। নদীর ভাষণের অন্তরে কবিকণ্ঠের মর্মবাণী উচ্চারিত হয়েছে। কবিতাটির প্রবহমানতা লক্ষণীয়। এর প্রতিটি ছত্র কবির আবেগে উদ্বেলিত। মহাবেদনা-সমুদ্রের সঙ্গে মিশে যাওয়ার জন্যে কবিজীবনের প্রতীক নদী ছুটে চলেছে পৃথিবীর পঙ্কিল ব্যথাশ্রুকে বহন করে।"
> (সুশীলকুমার, ১৯৯৭: ১৮৬)

গিরি-পর্বতে জন্ম নিয়ে পলাতকা শিশুর মতো দুঃখ-সুখের দু'কূলের মাঝে অবিরাম তার বয়ে বয়ে চলা। ছুটে চলা নদী, পাখি, শশক, বহমান মেঘ, মৃগ-শিশু, উল্কার সাথে কবি নিজের নিরন্তর ছুটে চলাকে মিলিয়েছেন। এই ছুটে চলাতেও কবির আনন্দ নেই, নিগূঢ়-গোপন বেদনা নিয়ে তিনি বয়ে চলেন। তাঁর গানের (সবাই তৃষ্ণা মেটায় নদীর জলে, কী তৃষা জাগে সে নদীরও হিয়া তলে; বেদনার মহাসাগরের কাছে করো করো সন্ধান) মতোই তাঁর সুধা পান করে যায় আশপাশের মানুষ, তাঁর বেদনার সন্ধান কেউ রাখে না:

> "আমি ছুটে যাই জানি না কোথায়, ওরা মোর দুই তীরে
> রচে নীড়, ভাবে উহাদেরি তরে এসেছি পাহাড় চিরে।
> উহাদের বধূ কলস ভরিয়া নিয়ে যায় মোর বারি,
> আমার গহনে গাহন করিয়া বলে সন্তাপ-হারী!
> উহারা দেখিল কেবলি আমার সলিলের শীতলতা,
> দেখে নাই– জ্বলে কত চিতাগ্নি মোর কূলে কূলে কোথা!"
>
> (রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড, ২০১৫: ২৩)

নজরুল যেন স্বভাব বিরহী, দুঃখ যাপনেই তাঁর পূর্ণতা। সংসারের আটপৌরে আহ্বান তাঁকে স্থির করতে পারেনি কখনোই। নদীর মতো যাঁর বয়ে চলা তাঁর স্থিতি একমাত্র সাগরেই মেলে। বাঁকে বাঁকে কোথাও প্রশান্তি মেলে না তাঁর। পদ্মমুখীরা, পুরনারীরা তাঁকে স্নেহাহ্বান করলেও তিনি দূরে সরে যান; দু'তীর আঁকড়ে, তন্তুলতা জড়িয়ে, তাঁর ব্যথা নিয়ে তিনি চলে যান। অজানা আকর্ষণে অবিরাম তাঁর ধেয়ে চলা। সাগর ছেড়ে মেঘের শিশুদের মতো তিনি আকাশে পলায়ন করেন। এখানে কেউ বোঝেনি তাঁর অন্তরের ব্যথা, কেউ শোনেনি তাঁর মনের কথা। এখানে থাকবেনই বা তিনি কেন, এখানে তাঁর সম্মুখে তাঁর প্রেয়সী অন্য প্রিয়কে ডাকে। তাই আঁখিজলের দোসর খুঁজতে সংসারের মায়াডাক ছেড়ে 'পথচারী' বেশে তিনি সমুদ্রের নোনাজল পানেই ছুটে চলেন:

"সম্মুখ-টানে ধাই অবিরাম, নাই নাই অবসর,
ছুঁইতে হারাই–এই আছে নাই–এই ঘর এই পর!
ওরে চল্ চল্ ছল্ ছল্ ছল্ কি হবে ফিরায়ে আঁখি?
তোরি তীরে ডাকে চক্রবাকেরে তোরি সে চক্রবাকী।...
কোথা পাবি হেথা লোনা আঁখিজল, চল্ চল্ পথচারী!
করে প্রতীক্ষা তোর তরে লোনা সাত-সমুদ্র-বারি!"

(রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড, ২০১৫: ২৩-২৪)

৯.

সাত-সমুদ্র-বারি প্রতীক্ষা করে বলেই নদী যেমন কত পথ বেয়ে এসে অবলীলায় নিজেকে সাগরবুকে লীন করে দেয় কবি তেমন দেন না। নদীর সাগরমিলনের প্রকৃতির সমান্তরালে নিজের প্রিয়ামিলনের প্রকৃতির তুলনা করেছেন। সাগরদয়িতের পদতলে লুটে পড়ে 'বুকে বুক রেখে নিবিড় বাঁধনে পিষে গুঁড়ো হয়ে যায়' নদী। নজরুলের প্রেম কোনো কল্পজগতের প্রেম নয়, বাস্তব পৃথিবীর রক্তমাংসের নর-নারীর প্রেম। বুকে নিবিড় করে মুখ লুকানো, বাহুবন্ধনে বুকের পাঁজরে গ্রাস করা, বুকে বুক রেখে নিবিড় বাঁধনে পিষে গুঁড়ো হয়ে যাওয়া, আবেশে অধর তুলে ধরা অধর পানে, একটি চুমায় সব সাধ সব তৃষ্ণা মেটা, —- এ সবই জাগতিক প্রেমের শরীরী স্পর্শের প্রকাশ। নজরুল আবেগ প্রকাশে

কোনো আবডাল ব্যবহার করেননি, সেটা যেমন তাঁর বিদ্রোহ-বিপ্লবের কবিতার ক্ষেত্রে সত্য, তেমনি সত্য প্রেমের কবিতার ক্ষেত্রেও। আবডাল নেই বলে কোথাও অসংযম নেই, অশ্লীলতা নেই; আছে সহজাত আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত এবং সংযত প্রকাশ। এই দেহজ প্রেম সম্পর্কে আলোচকের মন্তব্য :

> "প্রেম দেহগত ও দেহনির্ভর– একথা অস্বীকার করার যো নেই। দেহের মধ্যেই এর অধিষ্ঠান, অথচ দেহকে অতিক্রম করে এর যাত্রা ঊর্ধ্বগ। প্রেমকে বলা যায় পঙ্কের মধ্যে পঙ্কজ। সুতরাং এর মধ্যে যেমন স্বর্গের সুষমা তেমনি নরকের পূতিগন্ধ আছে; যেমন মিলনের সুনিবিড় আনন্দ তেমনি বিরহের সুকঠোর জ্বালাও আছে।" (মোবাশ্বের আলী, ১৯৬৯: ৮৯)

নদী সাগরের বুকে একপাক্ষিক প্রেমেই মিশে যায়, সাগর না চাইলেও সাগরে মেশাই নদীর প্রকৃতি ও নিয়তি। সব ভুলে এই একপেশে নির্বিকার নিবেদনের জন্য নদীকে তিনি 'হাবা মেয়ে', 'হতভাগী', 'নিলাজি', 'ভিখারিনী মেয়ে' বলে সম্বোধন করেছেন। কারণ নজরুল তাঁর প্রেমকে যে অব্যক্তেই রেখেছিলেন বেশি। গানের বাণী ও সুরে ভাষা দিয়ে মর্মব্যথা জুড়াতে চেয়েছিলেন। তাই নদীর নিবেদনের সাথে নিজের নিবেদনকে তিনি বৈপরীত্যে মিলিয়েছেন অতঃপর তাঁর ব্যথিত মনের কথা ব্যক্ত করেছেন — 'তোরি মতো নদী আমি নিরবধি কাঁদি রে প্রিতম লাগি,/ জন্ম-শিখর বাহিয়া চলেছি তাহারি মিলন মাগি!' মিলনাকাঙ্ক্ষা থাকলেও কবি অভিমানী এবং আত্মমর্যাদাশীল প্রেমিক। প্রেমিকা না চাইলে তিনি অযাচিত তাঁকে নিবেদন করবেন না। বিশ্বমানবের প্রকৃতিও এমনি, মূল্যায়ন না পেলে, কদর না পেলে অনাহূত প্রেম নিয়ে বিশুদ্ধ প্রেমি যায় না কারো দ্বারে। কবি দূর থেকে ভালোবাসবেন, 'স্মৃতি-তাজ' গড়বেন, বুকের পাষাণ-ভার দিয়ে পাষাণ-দেউল গড়বেন, প্রেমের গোপন ধারা ফল্গুনদী হয়ে বালুচরে হারাবে, কিন্তু কাছে যাবেন না অবাঞ্ছিতরূপে:

> "–তোর মতো সব ভুলে
> লুটায়ে পড়ি না--চাহে না যে মোরে তারি রাঙা পদমূলে!...
> চাহি না তাহারে বুকে চাপা থাক আমার বুকের ব্যথা,
> যে বুক শূন্য নহে মোরে চাহি– হব নাকো ভার সেথা!
> সে যদি না ডাকে কি হবে ডুবিয়া ও-গভীর কালো নীরে,

সে হউক সুখী, আমি রচে যাই স্মৃতি-তাজ তার তীরে!
মোর বেদনার মুখে চাপিয়াছি নিতি যে পাষাণ-ভার
তা দিয়ে রচিব পাষাণ-দেউল সে পাষাণ-দেবতার!

কত স্রোতধারা হারাইয়াছে কূল তার জলে নিরবধি,
আমি হারালাম বালুচরে তার, গোপন-ফল্গুনদী!"

(রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড, ২০১৫: ২৫)

বিদ্রোহে যেমন নজরুলের শির উন্নত, প্রেমেও অবনত নয়; উপেক্ষায় তিনি ব্যথা পান কিন্তু আলুথালু বিরহী হয়ে যান না –হয়ে ওঠেন আরো বলিষ্ঠ, আরো প্রবল, আরো স্বতন্ত্র, আরো শক্তিশালী।

১০.

শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি, প্রেম-ভালোবাসা, যুদ্ধ-রাজনীতি-কূটনীতি সব জায়গাতেই উপমা, প্রতীক, রূপক, বা ছদ্মবেশের ব্যবহার প্রাচীনতম রীতি। এই আড়াল যিনি যত বেশি ব্যবহার করতে পেরেছেছেন তিনি ততো উৎকৃষ্ট শিল্পী। নজরুলের মূল্যায়ন করতে গিয়ে গবেষক বলেছেন:

> "একদা বাঙলা সাহিত্যের ভাগ্যাকাশে আর একটি জ্যোতিষ্ক নক্ষত্রের উদয় হয়েছিল। মধুসূদন। মাইকেল মধুসূদন ও কাজী নজরুল। কেউই হিন্দু নন। কিন্তু দুজনেই বাঙালী। নিখুঁত বাঙালী। ভাষার ঐশ্বর্যে বাঙালী। দারিদ্র্যে বাঙালী। ভাবের বিলাসিতায় বাঙালী। ধর্মে বাঙালী। আর বাঙালী, — সব হারানোর সাধনায়।" (সুশীলকুমার, ১৯৯৭, ৯৫)

কিন্তু, উৎকৃষ্ট কবি যার বা যাদের উদ্দেশ্যে তাদের সাহিত্যের অন্তর্নিহিত ভাষার প্রক্ষেপণ করেন সে বা তারা এসবের নিহিত তাৎপর্য না বুঝে যদি উপরিভাগের অর্থ গ্রহণ করে তবে মূল উদ্দেশ্যই তো ব্যাহত হয়। কবিরও এ সংকট আছে। তিনি কণ্ঠের গানের সাথে মূলত রেখে যাচ্ছেন অন্তর-তলের ব্যথা, মনের গভীর কথা। গানের কথার আড়ালে রয়ে যায়

হৃদয়ের আকুলতা। কিন্তু মানুষ শুধুই শিল্পের রস আস্বাদন করে, শিল্পের আড়ালের শিল্পীর হৃদয়কে বোঝে না। সাধারণের কাছে কবির এ প্রত্যাশা নয় যে তারা কবিকে বুঝবে; কিন্তু, যে চাঁদপ্রিয়ার লাগি সাগরহৃদয়ে জোয়ারের মতো ফুলে ফুলে ব্যথা জাগে সে তো বুঝবে হৃদয়ের আকুতি। সে না বোঝায় বুকের বাণী বুকে না পৌঁছে শুধু গানের কথা হয়ে গেলো 'কণ্ঠের ফাঁসি'। শুধুই এ গানের পরিচয় কবি চান না রাখতে, যেদিন হৃদয়ে পৌঁছাতে পারবেন সেদিনের অপেক্ষায় রইলেন তিনি:

"বন্ধু গো যেয়ো ভুলে—
প্রভাতে যে হবে বাসি, সন্ধ্যায় রেখো না সে ফুল তুলে!
উপবনে তব ফোটে যে গোলাপ—প্রভাতেই তুমি জাগি
জানি, তার কাছে যাও শুধু তার গন্ধ-সুষমা লাগি।
যে কাঁটা-লতায় ফুটেছে সে-ফুল রক্তে ফাটিয়া পড়ি,
সারা জনমের ক্রন্দন যার ফুটিয়াছে শাখা ভরি—
দেখো নাই তারে! – মিলন-মালার ফুল চাহিয়াছ তুমি,
তুমি খেলিয়াছ বাজাইয়া মোর বেদনার ঝুমঝুমি!

ভোলো মোর গান, কি হবে লইয়া এইটুকু পরিচয়,
আমি শুধু তব কণ্ঠের হার, হৃদয়ের কেহ নয়!
জানায়ো আমারে, যদি আসে দিন, এইটুকু শুধু যাচি–
কণ্ঠ পারায়ে হয়েছি তোমার হৃদয়ের কাছাকাছি! "

(রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড, ২০১৫: ২৬)

১১.

'চক্রবাক' কাব্যের দীর্ঘতম কবিতা 'তুমি মোরে ভুলিয়াছ'। পূর্বে এটি 'রহস্যময়ী' নামে ছিল, পরবর্তী 'তুমি মোরে ভুলিয়াছ' নামে এ কাব্যে সংকলিত। ঢাকায় ফজিলাতুন্নেছার সাথে কবির তিনদিনের পরিচয়, এ ক্ষণিক পরিচয়ই অক্ষয় হয়ে ছিল তাঁর জীবনে। কবি মুগ্ধ হয়েছিলেন তাঁর প্রতি, ক্ষণিক প্রণয় জন্মেছিল দুজনের মধ্যে কিন্তু সে প্রণয়কে কবি লালন করলেও অপরপক্ষ লালন করেনি। প্রত্যাখানের বেদনা শব্দের আখরে কবিতা হয়ে

ঝরেছে, ক্ষণিক প্রেমের গভীর বেদনা পেয়েছে দীর্ঘকালীন রূপ। পুরো কবিতা পড়বার পর মনে হয় 'রহস্যময়ী' নামই যথার্থ ছিল। পুরো কবিতা জুড়ে কবি খুঁজে ফিরেছেন প্রিয়ার সেই ক্ষণের স্বরূপের ব্যাখা। পাননি তা। সেদিন দেউল জোড়া দীপালি আলোকে ছিল অঙ্গনভরা ফোটা ফুল, সে ফুলে বর-মালা গেঁথে খোঁপায় ফুল পরে বারবার যে উতলা হয়েছিল সে কি কবির জন্য ছিল না? মানুষ ক্ষণিক প্রেমে পড়ে, মুগ্ধতা তৈরি হয়, ঘোর হয়তো বা কেটে যায় কিছু পরে, সামলে নিয়ে নিজেকে সামনে এগিয়ে যায়। কিন্তু, সেই ক্ষণিকও তো জীবনের অংশ। স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি যাই মিলুক মুহূর্ত তো মিথ্যে হয়ে যায় না। একপক্ষ তা ভুলে যায় আর অপরপক্ষ হয়তো লালন করে সযত্নে। নজরুল লালন করেছিলেন। এ ক্ষণিক প্রেমকে তিনি অক্ষয় করে রেখে গিয়েছেন। তবে অভিমানী কবির সন্দেহ যে জাগ্রত প্রেম তিনি দেখেছিলেন তা যদি তাঁর জন্য নাই হয় তা কি অন্য কারো জন্য ছিলো তাহলে? :

"হয়তো তোমার
পড়ে মনে, কবে যেন কোন লোকে কার
বধূ ছিলে; তারি কথা শুধু মনে পড়ে!...
তার লাগি থাকো বসি নব বেশ পরি
শাশ্বত প্রতীক্ষামানা অনন্ত সুন্দরী!
হায়, সেথা আমি কেন বাঁধিলাম তরী,
কেন গাহিলাম গান আপনা পাসরি?"

(রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড, ২০১৫: ২৭)

কিন্তু তা তো নয়, সে প্রেয়সীর মুখ তবে কেন রাঙা হয়েছিল, পদ্মের কেশর যেমন দখিনা বাতাসে থরথর কাঁপে তেমনি কবির স্পর্শে তার সারাদেহ শিউরে উঠেছিল। অজানা আবেশে শিহরিত প্রেয়সী বলে উঠেছিল —'অজানা বন্ধু, তুমি কি গো সেই,/ জ্বালি দীপ গাঁথি মালা যার আশাতেই/ কূলে বসে একাকিনী যুগ যুগ ধরি?/ নেমে এসো বন্ধু মোর ঘাটে বাঁধো তরী!' এই স্পষ্ট বা অস্পষ্ট আহ্বানে কবির বিহ্বল হয়েছিলেন। ঘোরলাগা বিস্ময়ে তাঁর মনে হয়েছিল এই কি তাঁর 'কাব্যের অমরাবতী'? 'কবিতা-লক্ষ্মী'?
এই কি যুগে যুগে খুঁজে ফেরা ফরহাদের শিরি? মজনুর লাইলী? উত্তর মেলেনি, অনেক সময়ই মেলে না উত্তর। মানুষের অনেক আচরণেরই ব্যখ্যা পাওয়া যায় না। সাময়িক

ভালোলাগা বা মুগ্ধতা কিছুক্ষেত্রে কাজ করলেও তা দীর্ঘ সময়ে আর আবেদন ধরে রাখতে পারে না। এমনই নানা ঘেরাটোপে ধোঁয়াটে রয়ে গেছে তার স্বরূপ, কবি পারেননি উদঘাটন করতে:

"কেবলি রহস্য হায়, রহস্য কেবল,
পার নাই সীমা নাই অগাধ অতল!
এ যেন স্বপনে-দেখা কবেকার মুখ,
এ যেন কেবলি সুখ কেবলি এ দুখ!
ইহারে দেখিতে হয়--ছোঁয়া নাহি যায়,
এ যেন মন্দার-পুষ্প দেব-অলকায়!"

(রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড, ২০১৫: ২৯)

এ রহস্যময়ীর বুকে ভাষা নাই চোখে জল নাই, কেবলই নির্বাক ইঙ্গিত। 'ভাষাহীন আবেদন দেহ-ভরা কথা' নিয়ে মাটির মমতা আঁকড়ে থাকতে চায়। এই অব্যক্ত আহ্বানেই কাছে আসা, প্রেমস্পর্শে পূর্ণ হওয়া। মানুষ এমন ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কত ভালোলাগার ক্ষণিক তৃপ্তি দিয়ে আবার যেন নিরুদ্দেশে মিলিয়ে যায়। ক্ষণিক প্রেমে বিশ্বাসী যে জন সে তো ভুলে যেতে পারে, কিন্তু যে জন সেই ক্ষণিক মুহূর্তকে অমর করে রাখে তার তো ভোলা হয় না। হৃদয়-ধর্মে মানুষ আলাদা আলাদা। হৃদয়ের প্রকৃতি এক হলেও মানুষকে আলাদা করে দেয় তার সামাজিক, আর্থিক অবস্থান। তখন ক্ষেত্রবিশেষে চাইলেও সে নিজেকে আর ভাঙতে পারে না। তখন চিরজীবন না-মিলবার বেদনাকে মৃণাল কাঁটার মতো লুকিয়ে রাখতে হয় বাকি সময়; নজরুলও রেখেছিলেন:

"আসিয়া বসিলে কাছে তৃপ্ত মুক্তানন,
মনে হলো—- আমি দিঘি, তুমি পদ্মবন!
পূর্ণ হইলাম আজি, হয় হোক ভুল,
যত কাঁটা তত ফুল, কোথা এর তুল?
তোমারে ঘিরিয়া রবো আমি কালো জল,
তরঙ্গের ঊর্ধ্বে রবে তুমি শতদল,
পূজারির পুষ্পাঞ্জলি সম। নিশিদিন
কাঁদিব ললাট হানি তীরে তৃপ্তিহীন!
তোমার মৃণাল-কাঁটা আমার পরানে

লুকায়ে রাখিব, কেহ নাহি জানে।"

(রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড, ২০১৫: ৩০)

এ মৃণাল-কাঁটা কবির পরানেই লুকায়ে রাখতে হয়েছিল, কারণ সে ছিল 'ভোরের ঊষসী' দিনের আলোর তাপ সয়নি তার; সে ছিলো নিশীথের, দিবা এলে দূরে গিয়েছিল সরি। সে ছিল শাঙনের মেঘ কদম্ব-যূথী তার সাথী, কবি হেমন্তের সান্ধ্য-কুহেলিতে শ্বেত-করবীর সখি। দুজন দু'দিকের বলে যখন বিদায় নেবার সময় হয় তখন আমবাগানে মুহুমুহু কুহুকুহু কোকিল ডেকে ওঠে, মূলত এই ধ্বনি তো ধ্বনিত হয় বিদায়ী প্রেমিদের মনে। কিন্তু, কবির রহস্যময়ী প্রিয়ার কাছে এ ডাকের কোনো আবেদন নেই, তাৎপর্য নেই। অকারণ এসব ডাক শুনে শুনে তার কান ঝালাপালা। তিনি যেমন পাখিদের এসব অকারণ ডাকাডাকি বুঝতে পারেন না, তেমনি বুঝতে পারেন না কবিকেও; 'বুঝিতে নারিনু আমি পাখি ও তোমায়'।

এই প্রত্যাখ্যান, অস্বীকারের বেদনা কবিমনে প্রচণ্ডভাবে বেজেছিল। নিদারুণ আঘাতে আহত কবির ব্যথাভরা প্রকাশ:

"কে তুমি নারী, এ কী তব খেলা?
অকারণে কেন মোর ডুবাইলে ভেলা,
এ অশ্রু-পাথারে একা দিলে ভাসাইয়া?
দু'হাতে আন্দোলি জল কূলে দাঁড়াইয়া,
অকরুণা, হাসো আর দাও করতালি!"

(রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড, ২০১৫: ৩১)

এ যেন অন্যের ব্যথা দেখে আনন্দিত হওয়া নিঠুরিয়ার প্রতিরূপ এঁকেছেন কবি। এমন নিষ্ঠুর প্রতিবেশে কবি প্রেম দিতে এসেছিলেন, এসে বেদনা নিয়ে গিয়েছেন:

"আমি কবি হতে আসিনি — আমি নেতা হতে আসিনি — আমি প্রেম দিতে এসেছিলাম — প্রেম পেতে এসেছিলাম — সে প্রেম পেলাম না বলে আমি এই প্রেমহীন নীরস পৃথিবী থেকে অভিমানে চিরদিনের জন্য বিদায় নিলাম।" (উদ্ধৃত, আব্দুল মান্নান সৈয়দ, ২০০১: ১২৪)

কাঙ্ক্ষিত প্রেম না পেয়ে ক্ষণিক প্রেমের আবেশে জড়িয়ে দূরে সরে যাওয়া এ প্রিয়াকে কতনামে কবি খুঁজেছেন তিনি, 'মহাশ্বেতা, শিরী, লায়লি, বকৌলি, তাজ, দেবী, নারী, প্রিয়া'! সাড়া মেলেনি, শুধু বৃথাই খুঁজে ফেরা। বিধাতার অভিশাপে অনন্ত বিচ্ছেদ এসেছে তাদের মাঝে। এ অনন্ত বিচ্ছেদেও প্রিয়ার কিছু স্মৃতিচিহ্ন খুঁজে পাবার ব্যকুল বাসনা তাড়া করেছে কবিকে। প্রিয়ার চরণ-রাঙা দুটি বালুকণা, একটি নূপুর, বেণি-খসা ফুল, ভাঙা রেশমি কাঁচের চুড়ি, দলিত মালা ইত্যাদির কিছু না কিছু পেতে চায় কবির প্রেম-বুবুক্ষু মন। এ যেন কিশোরের প্রথম প্রেমে বিচ্ছেদের আহাজারি। মানুষ প্রিয় মানুষের বিরহে তার স্মৃতিবিজরিত জিনিসপত্র রেখে দেয়, শারীরিক উপস্থিতি না থাকলেও সেসবের মাঝে প্রিয় মানুষের অশরীরী উপস্থিতি টের পায় সংবেদনশীল মন। কারো প্রতি যখন প্রগাঢ় প্রেম জাগ্রত হয় তখন সে প্রেম চরিতার্থতা পাবার জন্য আকুল হয়ে ওঠে। এ যাতনা, এ হাহাকার শুধু সেই হৃদয়ই উপলব্ধি করতে পারে যে হৃদয় পড়েছে এমন প্রেমে। কিছুই পাননি কবি, নিস্ফল হয়েছে তাঁর গভীরতম নিবেদন, ব্যর্থ হয়ে তা পরিণত হয়েছে গগনবিদারী হাহাকারে:

"কিছুই পাব না খুঁজি? কেবলি দুরাশা।
কাঁদিবে পরান ঘিরি? নিরুদ্দেশ পানে।
কেবলি ভাসিয়া যাব শ্রান্ত ভাটি-টানে?
তুমি বসি রবে ঊর্ধ্বে মহিমা-শিখরে
নিষ্প্রাণ পাষাণ-দেবী? কভু মোর তরে
নামিবে না প্রিয়া রূপে ধরার ধূলায়?"

(রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড, ২০১৫: ৩৩)

নামেনি সে আর ধরায়, ভুলে গেছে সে সন্ধ্যার লীলায়িত দেহের সুখলাজ। অথচ সে স্মৃতিকে কবি সাপিনীর মতো গলায় ও বুকে জড়িয়েছেন। ভুলে যাওয়া সে পরশও কি তার ভুল ছিল? তাই যদি হয় সে ক্ষণিক লীলার ভুল আরেকবার করতে চান কবি, হতে চান তিনি ভুলে বর আর করতে চান তাকে কনে। কিন্তু, সে অভিলাষ তো চরিতার্থ হবার না, হয়নি কবিরও। মেনে নিতে হয় আমাদের, মানিয়ে চলতে হয়, মেনে নিয়েছিলেন কবিও:

"তুমি মোরে ভুলিয়াছ, তাই সত্য হোক!
নিশি-শেষে নিভে গেছে দীপালি-আলোক!

সুন্দর কঠিন তুমি পরশ-পাথর,
তোমার পরশ লভি হইনু সুন্দর —-
তুমি তাহা জানিলে না!
... সত্য হোক প্রিয়া
দীপালি জ্বলিয়াছিল--গিয়াছে নিভিয়া!"

(রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড, ২০১৫: ৩৪)

১২.

আঘাত পেলে, বঞ্চিত হলে, প্রতারিত হলে অপরকে দোষারোপ করা মানব মনস্তত্ত্বের সহজাত বৈশিষ্ট্য। কিন্তু, আঘাত যে করে তার অবস্থান উপলব্ধি করার চেষ্টা সচরাচর আমরা করি না। নজরুল নার্গিসকে ছেড়ে এসেছিলেন। কোনো শক্তিশালী কারণ ছাড়া নব-বর কখনো বাসর রাতে নব-পরিণীতাকে ছেড়ে আসে না। যে ছেড়ে যায় আমরা বাহ্যত তার আপাত নিষ্ঠুরতাকে দেখি, দেখি না তার অন্তরের ক্ষত। যে নিজে মনোরম, আনন্দময় সে তো অপরকে আনন্দই দেয়, অপরদিকে যে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত সেই আঘাত করে অপরকে। কবি যখন এমনি সব প্রশ্নে জর্জরিত হয়েছেন, অভিযোগের সম্মুখীন হয়েছেন নার্গিসের তরফ থেকে তার উত্তর তিনি কাব্যভাষায় দিয়েছেন:

"তুমি কি বুঝিবে বালা,
যে আঘাত করে বুকের প্রিয়ারে তার বুকে কত জ্বালা!
ব্যথা যে দিয়াছে –---সম্মুখে ভাসে নিষ্ঠুর তার কায়া,
দেখিলে না তব পশ্চাতে তারি অশ্রু-কাতর ছায়া!"

(রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড, ২০১৫: ৩৫)

মানুষের মন অনেক সংবেদনশীল, খুব নরম মনই আঘাত পেতে পেতে পাষাণসম হয়ে ওঠে। অবহেলায়, অনাদরে 'কুসুম-হিয়া' কঠিন হয়ে যায়। তখন কঠিন হিয়ার প্রতিঘাতটাই সবার বাজে, পূর্বের করা আঘাত ভুলে যায় সবে। কেঁদে কাঁদিয়ে যে হৃদয় তার চারপাশে অশ্রুর গড়্খাই (পরিখা) তৈরি করে ফেলে সেই পরিখা পার হয়ে হৃদয়ে যে আসতে পারে

না তাকে তো মানায় না সে হৃদয়-সিংহাসনে। নজরুলের ক্ষেত্রেও বুঝি মানায়নি নার্গিসকে। সব ব্যথা সয়ে যখন কবি দূরে এসেছেন সরে তখন কেন বহুদিন পরে অভিযোগের নাড়া দিয়ে শুষ্ক মালার পবিত্র পাঁপড়িকে ঝরানো? কেন নেভা আগুন পুনরায় জ্বালানো? গানে তিনি বলেছেন, 'যারে হাত দিয়ে মালা দিতে পার নাই, কেন মনে রাখ তারে/ ভুলে যাও মোরে, ভুলে যাও একেবারে'। যার প্রেমমালা প্রেমমালা পায়ে দলে অপমান করে আঘাত করা হয় তার দিক থেকে সামান্য প্রতিঘাত আসলেই তাকে 'অমানুষ' আখ্যা দেয়া হয়। কবিকে অমানুষ বলা হয়েছে সেটা মেনে নিয়ে তিনি তাঁর মানুষের স্বীকৃতিটুকু চাইছেন। কারণ আগে তো তিনি মানুষ, পরে কবি। নজরুল-বিশ্লেষকের শিবরাম চক্রবর্তীরও একই ভাষ্য:

> "কাজীর কাব্যের চেয়ে বড়ো কাজী মানুষ। এত বড়ো প্রাণ আমি খুব কম সাহিত্যিকেরই দেখেচি। দু'একজন অতি বড়ো সাহিত্যিকের সঙ্গে মেশবার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য আমার হয়েছে, তার অভিজ্ঞতা থেকে, পৃথিবীতে যত প্রকারের হিংস্র প্রাণী আছে সাহিত্যিকেরা তার মধ্যে পড়ে কিনা, এই সভয় সন্দেহ আমার মনে জেগেচে।...সুখের বিষয় কাজী এই গোত্র ছাড়া; ও কেবল সাহিত্যিক নয়, ও মানুষও ও তার কাব্যে ও জীবনে সমান 'উন্নত শির'।" (উদ্ধৃত, সুশীলকুমার, ১৯৯৭: ৯৯)

কবি এই তীক্ষ্ণ প্রশ্নই করেছেন তাঁর প্রিয়াকে—'কবি অমানুষ –মানিলাম সব! তোমার দুয়ার ধরি/ কবি না মানুষ কেঁদেছিল প্রিয় সেদিন নিশীথ ভরি?/দেখেছ ঈর্ষা– পড়ে নাই চোখে সাগরের এত জল?/ শুকালে সাগর — দেখিতেছ তার সাহারার মরুতল!' নার্গিসকে লেখা পত্রে কবি তাঁর নিজের অবস্থান পরিষ্কার করে তার দেয়া ব্যথাকে মূল্যায়ন করেছেন। সেখানেও কবি মানুষ হিসেবেই উন্মোচিত করেছেন:

> "তোমার উপর আমি কোন 'জিঘাংসা' পোষণ করি না — এ আমি সকল অন্তর দিয়ে বলছি। আমার অন্তর্যামী জানেন, তোমার জন্য আমার হৃদয়ে কী গভীর ক্ষত, কী অসীম বেদনা! কিন্তু সে বেদনার আগুনে আমিই পুড়েছি — তা দিয়ে তোমার কোনদিন দগ্ধ করতে চাইনি। তুমি এই আগুনের পরশমানিক না দিলে আমি অগ্নি-বীণা বাজাতে পারতাম না— আমি ধূমকেতুর বিস্ময় নিয়ে উদিত হতে পারতাম না।" (পত্রাবলি, ১৯৯৫: ৯১)

কিন্তু কবিকে বোঝেনি কেউ, ভালোবেসে তো মানুষ ভিখারিও হয়, নিজেকে লুটায়ে দেয় প্রিয়পদতলে৷ কিন্তু, মানবমর্যাদা ক্ষুণ্ন হলে সে তো লাঞ্ছিত হয়ে থাকতে পারে না। আঘাতের বেদনা বুকে নিয়ে মানুষ সরে আসে, স্বার্থান্বেষীরা রয়ে যায় হীন আচরণ সয়েও। হীন আচরণ মেনে ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য পাশবিকতাকে প্রশ্রয় দিলে মানুষকে ছোট করা হয়, মানুষকে অমর্যাদা করা হয়। চির উন্নত যার শির সে তো অপমান মেনে নিয়ে রয়ে যেতে পারে না। সে কবি, তাই তাঁর ব্যথা কবিতা হয়ে ঝরে কেউ তা বোঝে বা না বোঝে। আঘাত সয়ে সয়ে বেদনা-বারি দিয়ে ফুল ফুটিয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করে; ফুলের সৌন্দর্যই দেখে সবাই, ফুলের আড়ালের কবিতার আড়ালের সে বেদনা কেউ দেখে না:

> "কবির কবিতা সে শুধু খেয়াল? তুমি বুঝিবে না রানি,
> কত জ্বাল দিলে উনুনের জলে ফোটে বুদ্‌বুদ-বাণী!..
> আজো সে ফিরিছে হাসিয়া গাহিয়া? — হায়, তুমি বুঝিবে না,
> হাসির ফুর্তি উড়ায় যে — তার অশ্রুর কত দেনা!"
>
> (রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড, ২০১৫: ৩৬)

১৩.

যেকোনো বিদায়ই বেদনার, কিন্তু বিদায় চিরন্তন। পূর্ব-অভিসার (চট্টগ্রাম) শেষ করে যখন দূরের দেশ হিম-গিরি-শিরে (মৃত্যু?) যাবেন কবি তখন পূবের প্রকৃতি আর প্রকৃতির আড়ালে মানুষ বিদায় ভারে ভারাক্রান্ত। নজরুল খুব সহজেই মানবমনের আবেগকে প্রকৃতির পটে এঁকে দেন, কী অনায়াস সাবলীল চিত্রায়ণ! বিদায়যাত্রার জন্য ঘাটে বাঁধা 'কেতকী পাতার তরী'; এদিকে তাঁর 'কপোল-পরশ না পেয়ে পাণ্ডুর কেয়া-রেণু', তাঁকে স্মরণ করে কাঁদে বেণু, কুমারীর ভীরু বেদনার প্রণয়-অশ্রুর মতো ঝরে শেফালী। উদাস আকাশ বিদায়পথে ছলছল চেয়ে আছে, কদম কেশর ঝরে ঝরে বিদায়পথে গালিচা করে দিচ্ছে, আদরে বড় করা বল্লরী দিবানিশি কাঁদছে— বিদায় বেলায় প্রকৃতির কী অসাধারণ বিদায় আয়োজন। মানুষের স্বভাব প্রকৃতির উপর কী অনবদ্য ভাবে আরোপ করেছেন তিনি, মনে হয় যেন নানান আবেগমিশ্রত মানবসম্পর্কের মতোই প্রকৃতির সম্পর্ক। কত আয়োজন চলে সেখানে! ভাদরের নদীর দুকূল ছাপিয়ে ছলছল কাঁদার আড়ালে বিদায়ব্যথায় কোনো মানবমন কাঁদছে। যে মন এমন কাঁদে তার কাছে ভালোবাসার দাবি

হলো সে যেমন করে তার প্রিয়কে ভালোবাসে এমন ভালো বাসবে না কেউ। জীবনের কঠিন প্রয়োজনে বা সম্পর্কের শিথিলতায় প্রিয়রা দূরে চলে যায়, কিন্তু উৎকণ্ঠিত স্নেহময়ী মন ভাবিত থাকে তাকে নিয়ে, বিচলিত থাকে:

"যাবে যবে দূরে হিম-গিরি-শিরে, ওগো বাদলের পরি,
ব্যথা করে বুক উঠিবে না কভু সেথা কাহারেও স্মরি?
সেথা নাই জল, কঠিন তুষার, নির্মম শুভ্রতা,--
কে জানে কী ভাল বিধুর ব্যথা — না মধুর পবিত্রতা!
সেথা মহিমার ঊর্ধ্ব শিখরে নাই তরলতার হাসি,
সেথা রজনীর রজনীগন্ধা প্রভাতে হয় না বাসি।
সেথা যাও তব মুখর পায়ের বরষা-নূপুর খুলি,
চলিতে চকিতে চমকি উঠো না, কবরী উঠে না দুলি।

সেথা রবে তুমি ধেয়ান-মগ্না তাপসিনী অচপল,
তোমার আশায় কাঁদিবে ধরায় তেমনি 'স্ফটিক-জল'!

(রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড, ২০১৫: ৩৭-৩৮)

১৪.

মৃত্যুচেতনা রোম্যান্টিক কবিদের স্বভাব ধর্ম। কঠিন তুষার, নির্মম শুভ্রতা, মধুর পবিত্রতা, তরল হাসির অনুপস্থিতি, রজনীগন্ধার প্রভাতে বাসি না হওয়া, চলতে চকিতে চমকে না উঠা, অচপল তাপসিনী হয়ে ধ্যান করা— সবই যেন হিমশীতল মৃত্যুদেশের ইঙ্গিত। বাস্তবে যাকে পাওয়া যায়নি তাকে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পাবার এক ধরনের বাসনা মানুষের বিশেষত রোমান্টিক মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। এই না পাওয়া থেকেই পূবদেশ থেকে 'বর্ষা-বিদায়' শেষে কবি কি মৃত্যুদেশের যাত্রী হতে চাইছেন? পরবর্তী কবিতায় তো আর কোন অস্পষ্টতা নেই। কবির যত বিরহ আছে, না পাবার বেদনা আছে মৃত্যু উৎসবে বর সেজে তা পেতে চাইছেন। রাঙা মৃত্যু রানী হয়ে আসবে কবির কাছে, সেই আশাতেই বর সাজা। স্বল্প সময়ের পরিচয়ে ফজিলাতুন্নেছার সাথের প্রগাঢ় প্রেমানুভব ব্যর্থ হয়েছে।

নার্গিসকে পেয়েও হারিয়েছেন তিনি। এতো বেদনা, না-পাওয়ার মাঝে মৃত্যুতে চির-জনমের প্রিয়াকে পাবার আশা করছেন তিনি। তার কাছে কবি ব্যথার প্রকাশ করছেন:

"কেমনে বুঝাই কী যে আমি চাই, চির-জনমের প্রিয়া!
কেমনে বুঝাই—এত হাসি গাই তবু কাঁদে কেন হিয়া!
আছে তব বুকে করুণার ঠাঁই,
স্বর্গের দেবী —- চোখে জল নাই!
কত জীবনের অভিশাপ এ যে, কতবার জনমিয়া–
পারিজাত-মালা ছুঁইতে শুকালে — হারাইলে দেখা দিয়া।"

(রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড, ২০১৫: ৩৯)

এসব না পাওয়ার বেদনায় কবির অন্তর ক্ষত-বিক্ষত! বিদায়বেলায় সেই ক্ষত উন্মোচন করছেন তিনি। তিনি এবং তার বিদায়সাথী প্রিয়া দুজনেই রক্তাক্ত-হৃদয়ের:

"হেনার মতন বক্ষে পিষিয়া করিনু তোমারে লাল,
ঢলিয়া পড়িলে দলিত কমল জড়ায়ে বাহু-মৃণাল!
কেঁদে বলি, 'প্রিয়া, চোখে কই জল?
হলো না তো ম্লান চোখের কাজল!'
চোখে জল নাই–উঠিল রক্ত–সুন্দর কঙ্কাল!
বলিলে, বন্ধু, চোখেরই তো জল, সে কি রহে চিরকাল?"

(রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড, ২০১৫: ৩৯)

এসব বঞ্চনা, বিরহ, ব্যথা মৃত্যু জগতে নাই।

"মরণ ও বিবাহ, মৃত্যু ও বর--এর রূপকে নজরুল ব্যর্থ প্রেমের, চিরন্তন বিরহের যে চিত্রকল্প সৃষ্টি করেছেন 'সাজিয়াছি বর মৃত্যু উৎসবে' কবিতায় তা এক বেদনাবিধুর ও করুণ আবহের সৃষ্টি করেছে। মরণের মাঝে বিবাহের নহবতের সুর অত্যন্ত বেদনাদায়ক। নজরুলের কোন কোন গানেও ঐ আবেগের ছোঁয়া পাই। যেমন 'দিতে এলে ফুল কে তুমি সমাধিতে মোর' অথবা 'পাষাণের ভাঙালে ঘুম কে তুমি সোনার ছোঁয়ায়', এ সব গানেও একই আবেগের পরিচর্যা, জীবনে যাকে পাওয়া যায়নি মরণের পরে সে তাকে স্মরণ করবে, তার সমাধিতে পুষ্পার্ঘ দিয়ে জানাবে, পাষাণের ঘুম ভাঙাবে।" (রফিকুল, ২০১৮: ৫৯৮)

জীবনে যত না-পাওয়া আছে তার জন্য হতাশা বা হাহাকার নিয়ে জীবন থেকে বিদায় নেওয়ার চেয়ে আশা রাখা অনেক ভালো। মৃত্যু নিয়ে রোমান্টিক ভাবনা অনেক কবিদেরই ছিলো। মৃত্যুচেতনার মধ্যেই জীবনপ্রেম নিহিত থাকে। মৃত্যুতে জীবনের শেষ নয়, একটা রূপান্তর মাত্র। সেই রূপান্তরিত জীবনে একটা আশাবাদ ধরে রাখলে যাত্রাটায় মনোরম প্রবেশ সম্ভব। নজরুলও আশা রেখেছেন তাঁর অপ্রাপ্তি হয়তো মৃত্যুতে প্রাপ্তি হিসেবে আসবে:

"মুছি পদধূলি বুকে লবে তুলি মরণের পারে কবে,
সেই আশে, প্রিয়, সাজিয়াছি বর মৃত্যু উৎসবে!
কে জানিত হায় মরণের মাঝে
এমন বিয়ের নহবত বাজে!
নব-জীবনের বাসর-দুয়ারে কবে 'প্রিয়া' 'বধূ' হবে–
সেই সুখে, প্রিয়া, সাজিয়াছি বর মৃত্যু উৎসবে!"

(রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড, ২০১৫: ৪০)

১৫.

'তুমি মোরে ভুলিয়াছ' কবিতায় যেমন নজরুল তাঁর একপাক্ষিক প্রেমের হাহাকার তুলে এনেছেন, তেমনি 'অপরাধ শুধু মনে থাক' কবিতায় সেই একপাক্ষিক প্রেমের দায়ভারও নিজের উপর নিয়েছেন।

"যেহেতু প্রেমের আবেগ উৎসারিত হয়েছিল এককভাবে সেই জন্যেই বুঝি অপরাধের কথা আসে, কিন্তু প্রেম যে একান্তভাবেই অবুঝ কোন যুক্তি, নীতি, বিধি-নিষেধ মানতে চায় না, প্রেমের কুঁড়ি প্রতিদান না পেলেও ফুল হয়ে ফুটে ওঠে ব্যর্থতার বেদনা তাতে রস সিঞ্চন করে,প্রেমিকের হৃদয়ে প্রেমবৃক্ষ দিনে দিনে বেড়ে ওঠে।" (রফিকুল, ২০১৮: ৫৯৫)

ভালো যে বাসে ভালোবাসার যাতনা সেই ভোগ করে। যার জন্য প্রাণাবেগ উৎসারিত হয় আবেগ যদি তাকে না ছোঁয় তাহলে তো মূল্যায়ন পাবে না। এমন অমূল্যায়িত আবেগের দায় বহন করতে হয় নিজেকেই। কবিও চান না কদর, নীরবে সরে আসাই নজরুলের

স্বভাব। এহেন প্রত্যাখানের বেদনায় তাঁর যে অশ্রু নির্গত হয় সে অশ্রুলেখা তিনি না পড়তে বলেছেন প্রিয়াকে। তাঁর ব্যথা-বেদনা নিয়ে তো তিনি আড়ালে চলে যান, বিড়ম্বনায় ফেলেন না কাওকে:

"তোমার পাখির ভুলাইতে গান
আমি তো আসিনি, হানিনি তো বাণ,
আমি তো চাহিনি, কোনো প্রতিদান,
এসে চলে গেছি নিরবাক।
অপরাধ শুধু মনে থাক!

(রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড, ২০১৫: ৪১)

নির্বাক ফিরে এসে কবি মহাজাগতিক দিশেহারা তারার মতো ব্যোমপথে একলা বিহার করে বেড়ান। ঝরা ফুল, খসে পড়া তারা, পাষাণে শুকানো ঝরনা বা আধ-পথে লীন হওয়া নদীর মতো তিনিও চান তাঁর সে একপেশে প্রেমস্মৃতি মুছে যাক। আঙিনায় ফোটা যে প্রিয়াফুলে তিনি বাতাস হয়ে দোলা দিয়েছিলেন সে বাতাদ দীর্ঘশ্বাস হয়ে থাক। প্রিয়াফুলশাখে অন্য পাখি গান গাক। আলেয়ার মতো তিনি নিভে পুনরায় জ্বলবেন; কিন্তু এ ভালোবাসার বাসনা যেহেতু একলাই তাঁর মনে জাগ্রত হয়েছিল এ দায় একলাই নিচ্ছেন:

"প্রিয় মোর প্রিয়, মোরই অপরাধ,
কেন জেগেছিল এত আশা সাধ!
যত ভালোবাসা, তত পরমাদ,
কেন ছুঁইলাম ফুল-শাখ।
অপরাধ শুধু মনে থাক!

(রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড, ২০১৫: ৪১)

১৬.

যৌথ ইশারাতেই প্রেম অঙ্কুরিত হয়, দুজনের যত্নে-লালনে-প্রচেষ্টায় বিকশিত হয়। কিন্তু, মাঝপথে নানা কারণে সম্পর্কে শিথিলতা আসলে সম্পর্কের সম্পৃক্ততা অস্বীকার করে অনেকেই। দোষারোপ করে অন্যজনের উপর। দোষ মেনে নিয়ে হয়তো নীরবে সরে যায়

একজন কিন্তু তারও বলবার অনেক কিছু থাকে। কত প্রশ্ন, কত জল্পনা, কত অভিযোগ, কত প্রতীজ্ঞা অব্যক্তে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় তার চেতনায়। এমনই সব অব্যক্ত ভাবনাকে কবিতায় এনেছেন নজরুল 'আড়াল' কবিতার মাধ্যমে। এমন অভিযোগ হেনে ভুলে যাওয়া প্রিয়াকে কবি প্রশ্ন করেছেন তার (প্রিয়ার) পূজা আয়োজনে তিনি কি ঝড় হয়ে এসে সব ভেঙে দিয়েছেন? প্রিয়ার স্বর্গে তিনি কি মর্তের অভিশাপ হয়ে এসেছিলেন? মূলত সম্পর্ক যখন উষ্ণতা হারাতে হারাতে হিম হয়ে আসে তখন সম্পর্কের তিক্ততাই সামনে আসে, মধুরতা আড়ালে পড়ে যায়। সম্পর্কে বেদনা থাকে কিন্তু, প্রাপ্তিও তো কম থাকে না! যে প্রিয়/প্রিয়া আঘাত করে সে তো ভালোও বাসে; নেয় যদি বা কিছু দেয়ও তো:

"ভুল করে যদি এসে থাকি ঝড়, ছিঁড়িয়া থাকি মুকুল,
আমার বরষা ফুটায়েছে তার অনেক অধিক ফুল!
পরায়ে কাজল ঘন বেদনার
ডাগর করেছি নয়ন তোমার...
দস্যুর মতো হয়তো খুলেছি লাজ-অবগুণ্ঠন,
তব তরে আমি দস্যু, করেছি ত্রিভুবন লুণ্ঠন!"

(রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড, ২০১৫: ৪২)

কিন্তু, ভুলে যাওয়া অকৃতজ্ঞ প্রিয়/প্রিয়া তো অতীতের ভালোকে মুছে দিয়ে মন্দকেই লালন এবং উপস্থাপন করে। অব্যাহতি নিয়ে নেয় সম্পর্কের সকল দায় থেকে। অভিযোগের পর অভিযোগের তীর হানে অপর পাশের মানুষটির দিকে। কিন্তু, সেও তো প্রেমে উন্মুখ ছিল; প্রগাঢ় ব্যাকুলতা ছিলো তারও:

"তুমি না চাহিতে আসিয়াছি আমি– সত্য কি এইটুক?
ফুল ফোটা-শেষে ঝরিবার লাগি ছিলে না কি উৎসুক?
নির্মম-প্রিয়-নিষ্ঠুর হাতে
মরিতে চাহনি আঘাতে আঘাতে?
তুমি কি চাহনি মিলনের মাঝে নিবিড় পীড়ন-জ্বালা?
তুমি কি চাহনি কেহ এসে তব ছিঁড়ে দেয় গাঁথা-মালা?

(রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড, ২০১৫: ৪৩)

সকল অনুযোগের ভার মাথায় নিয়ে কবি সরে আসেন। মুক্ত করে দেন তাকে যে চায়নি তাঁকে। অন্যকে বুকে করে প্রিয়া জীবন অতিবাহিত করলেও তিনি রয়েই যান নীরবে নিভৃতে 'অন্তর-তলে'। এখানেই তাঁর আড়ালে রয়ে যাওয়া। চর্মচক্ষুর গোচরে থাকছেন না তিনি কিন্তু অন্তর্জগতে ঠিকই রবেন।

> "কবিতাটিতে ঈর্ষা ও প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি প্রকাশ পেয়েছে। নিঃস্বার্থ আদর্শ হলেও সবক্ষেত্রে তা ঘটে না। 'He hates most who loves most' – যার প্রেম নেই, তার বিদ্বেষও নেই। অতি প্রবল পিপাসা প্রখর প্রেম (Passionate love) প্রত্যাখানের আঘাতে দারুণ প্রতিহিংসায় পরিণত হয়। তা ঐ প্রেমের একটা বিকৃত রূপ — প্রেমে যাকে পায়নি, দারুণ শত্রুতায় তাকে বেঁধে রাখবে।" (আতাউর, ১৯৯৭: ৯৭)

দূরাকাশের তারালোকের ক্রন্দন মাঝে, দূরে পথিকের কণ্ঠে তাঁর রচিত গানের মাঝে তিনি রয়ে যাবেন। নিত্য কাজের ফাঁকে তাঁকেই খুঁজবে গতপ্রিয়া সে বিশ্বাস তাঁর আছে, দূরে গেলেও তিনি তাঁকে ভুলতে দেবেন না; তাঁর মনোবেদনা গানের মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে যাবেন নিখিল বিশ্বের মাঝে, বেজে যাবে তা অনন্ত কাল ধরে:

> "নিষ্ঠুর আমি– আমি অভিশাপ, ভুলিতে দিব না, তাই
> নিশ্বাস মম তোমারে ঘিরিয়া শ্বসিবে সর্বদাই।
> তোমারে চাহিয়া রচিনু যে গান
> কণ্ঠে কণ্ঠে লভিবে তা প্রাণ,
> আমার কণ্ঠ হইবে নীরব, নিখিল-কণ্ঠ-মাঝে
> শুনিবে আমারি সেই ক্রন্দন সে গান প্রভাতে সাঁজে!"
>
> (রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড, ২০১৫: ৪৪)

প্রখ্যাত শিল্পীরা এজন্যই কালের পর কাল টিকে থাকেন যে তাঁরা মানুষের মনের ভাব ও আবেগকে ভাষা দেন বা চিত্রায়িত করেন। তাঁদের প্রকাশ হয়ে ওঠে নিখিল মানবের অব্যক্ত মনের কথার প্রকাশ। নজরুল সাধারণ মানুষ ছিলেন এবং সাধারণ মানুষের কবি ছিলেন। তাঁর জীবনযাপনের সাধারণত্বের মতোই ছিল তাঁর সাহিত্যের সাধারণত্ব। অভিশাপ কবিতাটি যেমন একেবারেই মনে হয় বঞ্চিত সকল প্রেমিক-প্রেমিকার ব্যথিত মনের কথা তেমনি নজরুলের গানের অমরত্ব এবং সর্বজনীনতা নিয়ে গবেষক বলেছেন:

"কবি তাঁর প্রিয়াকে নিখিল বিশ্বের সমস্ত সুষমা-সৌন্দর্য দিয়ে সাজিয়েছেন। তাঁর প্রেমেই প্রিয়ার প্রেমের মুক্তি ঘটেছে। প্রিয়াকে ঘিরে রচিত তাঁর গানের কখনো মৃত্যু হবে না। কবির মৃত্যুর পরেও তাঁর গান নিখিল-কণ্ঠের মধ্যে ধ্বনিত হবে। এখানে কবির সৃষ্টি সম্পর্কে একটি চিরন্তন সত্য আভাসিত হয়েছে। ব্যক্তিকে নিয়ে সৃষ্ট কবির গান সমষ্টির অনুভূতির সামগ্রি হয়ে ওঠে এবং এখানেই তার অমরতা।" (সুশীলকুমার, ১৯৯৭: ১৮৮)

১৭.

নদীপারের যে বালিকার প্রতি কবির প্রণয় অঙ্কুরিত হয়েছিল তা অব্যক্ত বা অচরিতার্থ থাকলেও কবি রয়ে যেতে চান বালিকার কিছুতে না কিছুতে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে। নদী পারে ভ্রমে বেড়ানো সে মেয়ের প্রতি কবির জিজ্ঞাসা তিনি যে তাকে উদ্দেশ্য করে তাঁর গানের কমল ভাসিয়ে দেন তা কি তার চরণ ছোঁয় নিত্য সাঁঝে? খোঁপায় কনক-চাঁপা গুজে, গলায় টগর-মালা দিয়ে, হেনার গুছি হাতে যখন নদীকূলে বেড়ায় বালিকা তখন কি তাকে চেয়ে কবির যে গানের গীতি তা কি সে শুনতে পায়? ভোরবেলা শীতল জলে গোছল করে ফুলের সাজি হাতে দাঁড়ানো রাঙা প্রিয়াকে তিনি রাঙা ঊষার সতীন বলেছেন। প্রিয়ার রূপের স্নিগ্ধ অনবদ্য তুলনা! সেই রাঙা প্রিয়া কি তাঁর বনের কুসুম তুলে আর কেশে পরে? এমনি কত প্রশ্ন সেই দূরের প্রিয়ার তরে। মানুষের থাকে মানুষের মাঝে থাকার আকণ্ঠ ব্যাকুলতা। মানুষ তাঁর কীর্তিতে, প্রেমে, অবদানে, সৃষ্টিতে থেকে যেতে চায় মানুষের মাঝে। সে চায় কেউ তাকে বুঝুক, তার বুকের জ্বালা কেউ উপলব্ধি করুক:

"নদীপারের মেয়ে!
আমার কমল অভিমানের কাঁটায় আছে ছেয়ে।
তোমার সখায় পুজো কি মোর গানের কমল তুলি?
তুলতে সে-ফুল মৃণাল-কাঁটায় বেঁধে কি অঙ্গুলি?
ফুলের বুকে দোলে কাঁটার অভিমানের মালা,
আমার কাঁটার ঘায়ে বোঝো আমার বুকের জ্বালা?"

(রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড, ২০১৫: ৩৬)

১৮.

'চক্রবাক' কাব্যের একমাত্র অন্য ধাঁচের কবিতা '১৪০০ সাল'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আজি হতে শতবর্ষ পরে ' কবিতার প্রতিত্তোরে তিনি এটি রচনা করেছিলেন। বিচিত্র বর্ণনে নজরুল তাঁর পূর্বসূরির ঋণ স্বীকার করেছেন। প্রেমের প্রধানতম ধারক যে যৌবন তা বাদ যায়নি এ কবিতাতেও। নজরুল মূলত যৌবন বন্দনারই কবি তা সে বিপ্লবে হোক বা প্রেমে। কবিগুরু তাঁদের (নজরুলদের) দূরন্ত যৌবনে এসেছেন গান হয়ে, কবিতা হয়ে। নব-বসন্তের প্রভাতবেলায় গান হয়ে তিনি (রবীন্দ্রনাথ) এসেছেন পরবর্তীদের যৌবনমেলায়। আনন্দের পাশাপাশি বেদনা যাপনেও তিনি থাকেন:

"আজি মোরা শতবর্ষ পরে
যৌবন-বেদনা-রাঙা তোমার কবিতাখানি
পড়িতেছি অনুরাগ-ভরে।
জড়িত জাগর ঘুমে শিথিল শয়নে
শুনিতেছে প্রিয়া মোর তোমার ঈঙ্গিত-গান
সজল নয়নে।"

(রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড, ২০১৫: ৪৬)

১৯.

পুরো কাব্যজুড়ে যে চক্রবাকীকে কবির খুঁজে ফেরা তারই সারাংশ 'চক্রবাক' কবিতায় ধ্বনিত। এ কাব্য সম্পর্কে সমালোচক আব্দুল মান্নান সৈয়দ বলেছেন:

> "দ্রোহপ্রধান কবিতার উচ্ছ্বসিত মুকুলমঞ্জরী *অগ্নি-বীণা,* পরিণত পরিপক্ক ফল 'জিঞ্জির'। তেমনি প্রেম-প্রকৃতিপ্রধান কবিতার সূচনা *দোলন-চাঁপা,* পরিণতি *চক্রবাক*। এদিক থেকে নজরুলের প্রেম-প্রকৃতিপ্রধান কবিতা তাঁর দ্রোহপ্রধান কবিতার একেবারে বিপরীত বাসিন্দা: জাগরমুখ্য কবিতায় যদি থাকে পবিত্র রোষ, এখানে আছে বিশুদ্ধ অশ্রু।"
> (মান্নান, ২০১৬: ৭০)

এই অশ্রুকে সঙ্গী করে 'মধ্যে অকূল রহস্য পারাবার' নিয়ে সততই কাঁদছে 'চক্রবাক সে চক্রবাকীর লাগি'। কোনো এক সুখদিনে সাথীকে পাবার পর নেমে এসেছে চির বিরহের

রাতি তাদের মাঝে। তার পরে রয়ে গেছে শুধু অনন্ত হাহাকার আর অনন্ত বিচ্ছেদ বেদনা। এ বেদনা নিয়ে বাকি জীবনপথ পাড়ি দিতে কতো ভালোবাসা, স্নেহসুধার সাথে সাক্ষাৎ হয়; কিন্তু সেই যা তাকে না-পাবার বেদনা বুকে বেজেই চলে:

"এ পারে বৃথাই বিস্মরণের কূলে
খোঁজে সাথী তার, কেবলি সে পথ ভুলে।
কত পায় বুকে কত সে হারায় তবু–
পায়নি যাহারে ভোলেনি তাহারে কভু।"

(রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড, ২০১৫: ৪৯)

এ কবিতা প্রসঙ্গে মনে পরে সেই ক্রৌঞ্চমিথুনের কথা যাদের বিচ্ছেদ দেখে বাল্মিকীর মুখে উচ্চারিত হয়েছিল প্রথম শ্লোক।

২০.

এ না-পাওয়া গান, কবিতা, সুর, শিল্প হয়ে প্রকাশিত হয়। 'অমর অশ্রু-লেখা' হয়ে যুগ যুগ টিকে রয়। কবির জিজ্ঞাসা তাঁর এ গান-কবিতার আড়ালে তাঁকে কেউ দেখতে পায় কি না। অমর সঙ্গীতসুধার আড়ালে যে ব্যক্তিমানুষ রয়েছেন তিনি তো সদাই 'তৃপ্তি-হারা'। তাঁর সৃষ্টির অমর সুধা সবাই পান করে তাঁর বেদনা কেউ নেয় না। এ যেন রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতার অনুরণন। সৃষ্টিকেই সবাই আরাধনা করে স্রষ্টাকে নয়। স্রষ্টার বেদনা একলা তাঁকেই বহন করতে হয়। এ বেদনা বহন করেই 'চক্রবাক' কাব্য সমাপ্ত:

"তোমরা আমায় দেখতে কি পাও আমার গানের নদী-পারে?
নিত্য কথার কুহেলিকায় আড়াল করি আপনারে।
সবাই যখন মত্ত হেথায় পান করে মোর সুরের সুরা,
সবচেয়ে মোর আপন যে জন সে-ই কাঁদে গো তৃষ্ণাতুরা।
আমার বাদল-মেঘের ভরল নদী সপ্ত পাথার,
ফটিক-জলের কণ্ঠে কাঁদে তৃপ্তি-হারা সেই হাহাকার!
হায় রে, চাঁদের জ্যোৎস্না-ধারায় তন্দ্রাহারা বিশ্ব-নিখিল,
কলঙ্ক তার নেয় না গো কেউ, রইল জুড়ে চাঁদেরি দিল্!"

(রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড, ২০১৫: ৫০)

গবেষকের ভাষায় এ কাব্য সম্পর্কে সর্বোপরি বলা যায়:

> "বিষাদ 'চক্রবাক'-এর ভিতরবাহী সুচিক্কণ অন্তঃস্রোত; নজরুলের অপর প্রেমকাব্যগুলিতে ঝরেছে ফোঁপানো বেদনা ও অশ্রু। সেই অশ্রুপাতের পরিবর্তে বেদনা যখন গভীরতর হয়ে উঠেছে, কবিতাও তখন হ'য়ে উঠেছে গভীরসঞ্চারী ও চিত্ততল থেকে পদ্মের মতো জাগ্রত এবং সেই সঙ্গে দেখা দিয়েছে প্রাকরণিক নিবিড়তা, আত্মঘোষণার স্থলে আত্মগোপনের শিল্পিত অভ্যাস। প্রথম পর্যায়ী শরীর পার হয়ে এখন তাঁর অধিবাস আত্মায়; অথবা এরকম বলা যায় যে, শরীরকে তিনি আত্মায় গালিয়ে নিয়েছেন। নিসর্গের মধ্যে আপন বাসনারক্তিমাকে সঞ্চার করতেন একদিন; দ্বিতীয় পর্যায়ে এখন চারিয়ে দিচ্ছেন সম্পূর্ণ সত্তাকে– ফলে পাখি বা তটিনীর ছদ্মবেশ আপন আননে এঁটে নিতে অসুবিধা পোহান না। সমস্ত মিলে " চক্রবাক"-কে সার্থক ও শালীন প্রেমকাব্যে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে। এটি অন্তত নিঃসংশয় যে নজরুল প্রেমকাব্যে বহুবিবর্তিত। এবং পরিণতও।" (আব্দুল মান্নান সৈয়দ, ২০১৬: ৭৭)

এ কাব্য সম্পর্কে পরিশেষ কথা এমন বলা যায় নজরুল তাঁর ছোট বেলা থেকেই যেন এক আহত চক্রবাক। পরিবার-পরিবেশ থেকে শুরু করে সর্বত্রই তাঁর যে পাওনা জুটেছে তার মধ্যে বেদনার ভাগটাই যেন বেশি। এ বেদনা নিয়ে তিনি একাকী নদীতীরে সর্বদাই যেন কেঁদে কেঁদেই ফিরেছেন। জীবন তাঁকে এ কান্না থেকে মুক্তি দেয়নি। তাই 'চক্রবাকে'র প্রতিটি কবিতা যেন হয়ে উঠেছে নজরুলের এবং আহত সকল হৃদয়ের প্রতিরূপ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পূবের হাওয়া

১৯২৫ সালে প্রকাশিত এ কাব্যগ্রন্থে বর্তমানে ১১ টি কবিতা স্থান পেয়েছে। বেশ ঝরঝরে মেজাজের এই ১১ টি কবিতার মধ্যে বিরহের চেয়ে প্রেমের চাপল্য এবং মধুরতার ভাগই বেশি। মানুষের মধ্যে এক ধরনের কাল্পনিক প্রাপ্তি বা নির্মাণের প্রত্যাশা থাকে বলেই মানুষ বেদনায় আক্রান্ত হয়। নজরুলেও তাই, তাঁর মধ্যে তো প্রেম নিয়ে হোক আর পরিপার্শ্ব নিয়ে হোক এক ধরনের আকাঙ্ক্ষার ছবি ছিলো। সেই দূরন্ত ঝলমলে ছবির কিছু ঝলক এ কাব্যের কবিতায় দেখা যায়, আর তার অপূর্ণে যে ব্যথা তো নজরুলের কবিতার সহজাত বৈশিষ্ট্য।

১.

মানবমনে প্রকৃতির পট পরিবর্তনের সাথে সাথে কতশত অনুভূতির উদয় হয় অথবা ঠিক মনের সেই সেই অনুভূতি প্রকৃতির সেই সেই পটেই জাগ্রত হয়। শ্রাবণ সন্ধ্যার বৃষ্টির ভেজা হাওয়ায় স্নেহকাতর, যত্নবুভুক্ষু মনে কত কথাই মনে পরে। 'শাওনও রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে...' নজরুলেরই তো হৃদয়-বেঁধা গান। শ্রাবণের বারিধারার সাথে বিজলি শিখায়ও জাগিয়ে যায় একের পর এক কথা। উতলা ঝড়ের কাতর শব্দে কবির বুক গুমরে ওঠে, গুমরে ওঠে বিরহকাতর প্রিয়হারা মানুষেরও বুক। জলো হাওয়ার ঝাপটা মনে জাগিয়ে যায় অনেক স্মৃতি, অনেক কথা। এহেন মেদুর দিনে বিরহী যে জন, ভালোবাসা বঞ্চিত যে জন, উদাস যে মন সেখানে এমনটাই চলে খুব গহনে:

"পরান আমার বেড়ায় মেগে,
একটু যতনে।
এই শাঙন-সাঁঝের ভেজা হাওয়ায় বারির পতনে।।"

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৯৯)

২.

পরবর্তী 'বাদল-প্রাতের শরাব' কবিতায় শুরুতে প্রকৃতির পটে প্রিয়াকে এনেছেন, 'বাদলা-কালো' মেঘ তাঁর স্নিগ্ধা কান্তাস্বরূপ; বৃষ্টির রিনিঝিনি ধ্বনিতে তার নুপুরের শিঞ্জিনী বাজে। দ্রাক্ষারস আর শিরিন শরাবের মাদকতায় জীবনের উদ্দাম ভোগবাদীতার চিত্র আছে এ কবিতায়। ফারসি কবি হাফিজ এবং ওমর খৈয়ামের প্রভাব এই ধাঁচের কবিতাগুলোতে খুব স্পষ্ট বোঝা যায়। হাফিজ-ওমরের ভোগাকাঙ্ক্ষা নজরুলে যেভাবে ভাষা পেয়েছিল:

"বাদলা-কালো স্নিগ্ধা আমার কান্তা এল রিমঝিমিয়ে,
বৃষ্টিতে তার বাজল নুপূর পায়জোরেরই শিঞ্জিনী যে।
ফুটল ঊষার মুখটি অরুণ, ছাইল বাদল তাম্বু ধরায়;
জমল আসর বর্ষা-বাসর, লাও সাকি লাও ভর-পিয়ালায়।
ভিজল কুঁড়ির বক্ষ-পরাগ হিম্-শিশিরের আমেজ পেয়ে,
হমদম! হরদম দাও মদ, মস্ত্ করো গজল গেয়ে!"

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ৯৯)

নজরুল আলোচক রফিকুল ইসলাম এ কবিতা প্রসঙ্গে বলেন:

"কবিতার শুরুতে বর্ষার মধুর রসাবেশের সৃষ্টি ক'রে কবি বর্ষা বাসর, জমাট আসর এবং পরিপূর্ণ পেয়ালা ও সাকীর উল্লেখে কবিতার ঐতিহ্যে ফারসী কবিতার রস সৃষ্টি করেছেন। কবিতার পঞ্চম পঙক্তিতে বাঙলাদেশের বর্ষাপ্রকৃতির একটি কোমল ও পেলব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। হিম শিশিরের আমেজ পেয়ে কুঁড়ির বক্ষ-পরাগ সিক্ত হওয়ার চিত্রকল্পে গজল গেয়েও সেই আমেজটিকে রক্ষা করেন।" (রফিকুল, ২০১৮: ৫১৬)

৩.

মান করে মলিন মুখে আছে যে প্রিয়া ফুলের সাথে তার কি চমৎকার উপমায়ন। দীর্ঘ সময়ান্তে প্রিয়র সাথে দেখার আনন্দ নেই এমন বেদনায় মুহ্যমান মান করা মলিন মুখের অনুপম প্রকাশ ফোটার আগেই শুকিয়ে থাকা ফুলের সাথে। যে কুঁড়ির হাসির রাশি নিয়ে বিকশিত হবার কথা তাকে মলিন মুখে রাখতে পারে যে তাকে কবি বলেছেন 'কাফের

আশেক বেদীন'। একটা প্রথাগত প্রেমানুভূতি নিয়ে লেখা কবিতায় নজরুল অনায়াসে ইসলামি ধর্মীয় শব্দবন্ধ নিয়ে এসেছেন, এটা নজরুলকে দিয়েই সম্ভব:

"মূক করে ওই মুখর মুখে লুকিয়ে রেখো না,
ওগো কুঁড়ি, ফোটার আগেই শুকিয়ে থেকো না!
নলিন নয়ান ফুলের বয়ান মলিন এদিনে
রাখতে পারে কোন সে কাফের আশেক বেদীনে?"

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ১০০)

পারুল বনে একলা জুঁই হয়ে কাঁদা প্রিয়ার বিরহব্যথা কবিকে ছুঁয়ে যায়। এই ব্যথিত প্রিয়ার প্রেমপরশ পেতে আকুল কবির কাছে মলিন-প্রিয়ার মুখ বেহেশতের মধ্যে আবছা ব্যথার রেশের মতো মনে হয়। এই মানিনী প্রিয়ার মানভাঙা পরশ কবি প্রার্থনা করেছেন। এ প্রার্থনা যেন দীর্ঘ অদর্শনের পর কাছে আসা প্রতিটি প্রেমিক হৃদয়েরই কথা:

"বরষ পরের দরশনের কই সে হরষণ,
মিলবে না কি শিথিল তোমার বাহুর পরশন?
শরম টুটে ফুটুক কলি শিশির-পরশে
ঘোমটা ঠেলে কুণ্ঠা ফেলে সলাজ হরষে।"

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ১০০)

৪.

হারিয়ে যাওয়া, পথ ভোলা, বিপথ-গামী, কলঙ্কিনী প্রিয়তমাকে পথের শেষে প্রিয় করে পাবার আশা নিয়ে 'আশা' কবিতাটি। চির-সাথী যে জন সে তো চিরতরে মুখ ফিরিয়ে চলে যায় না, অন্তত নজরুল তা বিশ্বাস করেন না। 'কুটিল হাসি হেসে' দূরে থেকে নানান রূপে সে প্রিয়তমা ডাকে, এই বেদনায় কবির 'জান ওঠে হায় মোচড় খেয়ে' এবং পথ চলতে টলে পড়েন। যে প্রিয়কে তিনি শুরুতে সম্বোধন করেছেন 'মহান তুমি প্রিয়' নামে তাকে পরবর্তী পঙক্তিগুলোতে 'কলঙ্কিনী' বলে বারবার সম্বোধন করেছেন। প্রেমের ধরন এমন যে বিপথ-গামী কলঙ্কিনী প্রিয়/প্রিয়াকে ভালো বাসলেও তার মতো কলঙ্কি হতে চায় না কেউ। কিন্তু, মনের মধ্যে আশা ধরে রাখা হয় যেন 'চির-সুন্দর' হয়ে কলঙ্কি প্রিয়তমা ফিরে

আসে অথবা পথের শেষে কবি নিজেই সে কলঙ্কি প্রিয়র মতো হবার আশাবাদ করেছেন। নজরুল স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে তিনি আশাবাদের আধার:

"তুমি কি চাও তোমার মতোই কলঙ্কী হই আমি?
তখন তুমি সুদূর হতে আসবে ঘরে নামি –
হে মোর প্রিয়, হে মোর বিপথগামী!

পথের আজও অনেক বাকি,
তাই যদি হয় প্রিয় –
পথের শেষে তোমায় পাওয়ার যোগ্য করেই নিয়ো॥"

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ১০১)

৫.

''হোলি' কবিতায় প্রেমের চাপল্য ও মুখরতার মাত্রাধিক প্রকাশ ঘটেছে'। রাধা-কৃষ্ণের রূপকে এখানে রঙচাপল্যের প্রকাশ করেছেন কবি। কবি এখানে রাধা-ভূমিকায় অবতীর্ণ। সব সখী মিলে শ্যামকে ঘায়েল করার জন্য সইদের আহ্বান করছেন তিনি। হোলি খেলাতে আবির মেলে রঙের ছড়াছড়িতে যে প্রাণোচ্ছল রূপ প্রকাশিত হয় তার আবহ ধারণ করেছে কবিতাটি। কবির ভাষায়:

"বসন-ভূষণ ফেল লো খুলে,
দে দোল দে দোল দোদুল-দুলে,
কর্ লালে-লাল কালার কালো
আবির হাসির টিটকিরিতে।।

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ১০২)

৬.

'বে-শরম' কবিতাতেও রাধা-কৃষ্ণের অনুষঙ্গ এবং প্রেমের চপল-মধুর রূপের প্রকাশ। প্রিয়-মিলনের জন্য বা প্রিয়র সাথে রং-তামাশা করার জন্য মনকে বেশরম বানাতেই হয়। সখিদের সাথে ক্রীড়া-কৌতুকের মাধ্যমে কবি এই লাজকথার প্রকাশ করেছেন।

৭ ও ৮.

ইরানের জীবনবাদী কবি ওমর খৈয়ামের রুবাই বা কবিতা অবলম্বনে এই অনুবাদগ্রন্থ রচনা করেন কাজী নজরুল ইসলাম। ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বরে রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। জীবনবাদী ওমর খৈয়াম নজরুলকে খুব আকর্ষিত করেছিলেন। ওমর খৈয়াম এ মধুময় পৃথিবীকে ভালবেসেছেন। ভালবেসেছেন ভাগ্যের হাতের ক্রীড়ানক পৃথিবীর সকল প্রাণী জগৎকে। জয়ধ্বনি করেছেন, যৌবনের প্রশান্তি গেয়েছেন, স্রষ্টার নিষ্ঠুর নিয়তিকে মেনে নিয়েছেন, অবধারিত মৃত্যুকে করেছেন স্বীকার। ধরার ধূলোয় বসে ধরনীর জয়গান গেছেন। ওমর খৈয়ামের সঙ্গে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মিল সেখানেই। নজরুলের কিছু কিছু কবিতায় জীবনের সৌন্দর্য উপভোগ বা ভোগবাদিতার যে নিদর্শন দেখা যায় তাতে ওমর খৈয়ামের প্রভাব আছে বলে মনে হয়। 'সোহাগ' এবং 'শরাবন্ তহুরা' কবিতাতে আমরা তা খুঁজে পাই:

"নার্গিস্-বাগ্ মে বাহার কী আগ্ মে ভরা দিল্ দাগ মে –
কাঁহা মেরি পিয়ারা, আও আও পিয়ারা।
দুরু দুরু ছাতিয়া ক্যায়্সে এ রাতিয়া কাটুঁ বিনু সাথিয়া
ঘাব্রায়ে জিয়ারা, তড়পত জিয়ারা।
দরদে দিল্ জোর, রঙিলা কওসর
শরাবন্ তহুরা লাও সাকি লাও ভর,
পিয়ালা তু ধর্ দে, মস্তানা কর্ দে, সব্ দিল্ ভর্ দে
দরদ্ মে ইয়ারা – সঙ্গ—দিল্ ইয়ারা।" (রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ১০৩)

৯.

আলুথালু বিরহী প্রিয়া প্রিয়-বিরহে যে নীরস জীবন যাপন করেন তার বর্ণনা করেছেন কবি 'বিরহ-বিধুরা' কবিতায়। প্রিয় নাই তাই সকল সাজ-সজ্জাই যেন অহেতুক। অভিমানী প্রিয়া আয়নাতে মুখ দেখবে না, চোখে সুরমা রেখার কাজল দিবে না, হাত মেহেদি-হেনায়

রাঙাবে না, চুলে চিরুনি দিবে না, 'চুম-হারা ঠোঁট পানের পিকের হিঙুল রঙে রাঙবে না', শয্যা সাজাবে না ইত্যাদি। প্রিয়বঞ্চিত জীবন নিমের মতো তেতো। মনের সাথে মন মেলে যে মানুষের সে-মানুষের অনুপস্থিতিতে জীবন নির্জীব এবং নিরস। কবিতাটিকে বিপরীত অর্থে পড়লে একটা মেয়ে কিভাবে নিজেকে সাজায় নজরুলের চোখে তা দেখা যাবে। স্নেহ-ভালোবাসা পূর্ণ জীবন হলে স্বর্গসমই অনুভব হয়, অন্যথা নরকযন্ত্রণা পায়। কবির ভাষায়:

"সবাই বলে, চিনির চেয়েও শিরিন জীবন, – হায় কপাল!
পীতম-হারা নিম-তেতো প্রাণ কেঁদেই কাটায় সাঁঝ সকাল।

যেথায় থাকো খোশহালে রও, বন্ধু আমার – শোকের বল!
তুমি তোমার সুখ নিয়ে রও, – থাকুক আমার চোখের জল!"

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ১০৪)

১০.

'প্রণয়-নিবেদন' কবিতায় এক কিশোরী কুমারীর প্রতি কবি প্রেম নিবেদন করেছেন। তাঁর পিয়াসী মন কিশোরীর একটি গোপন চুমা মেগেছেন। বালকের প্রথম যৌবনের কাঁপা কাঁপা প্রণয়ের ছোঁয়া এ কবিতায় ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের সাথে নজরুলের প্রেম প্রকাশের স্পষ্ট ভিন্নতা এখানে। নজরুল স্পষ্ট শরীর প্রেমের কবি এবং এই প্রেমের প্রকাশ তিনি কোনোভাবেই অতিন্দ্রীয়ভাবে করেন না। মনের স্বাভাবিক আবেগকে কোনো আবডাল ছাড়াই সহজ ভাষায় প্রকাশ করেন তিনি। বালিকার প্রতি প্রেম নিবেদনে তাঁর ভাষা:

"অফুট তোমার অধর ফুলে
কাঁপন যখন নাচন তুলে
একটু চাওয়ায় একটু ছুঁলে গো!
তখন এ-মন যেমন কেমন-কেমন কোন্ তিয়াসে কোঙারি? –
ওই শরম-নরম গরম ঠোঁটের অধীর মদির ছোঁয়ারই।"

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ১০৪)

১১.

'ফুল-কুঁড়ি বুকের মধ্যে প্রেমের অরুণস্পর্শ অনুভব করেছে বলে স্বাভাবিক লজ্জায় সে কুন্ঠিত ও নিজেকে উন্মোচিত করতে দ্বিধাগ্রস্ত।' কিন্তু, কবির বারবার করা প্রণয় চেষ্টা যখন ব্যর্থ হয় তখন যেমন শব্দবন্ধ এসেছে — 'আর পারিনে সাধতে লো সই এক ফোঁটা এই ছুঁড়িকে/ ফুটবে না যে ফোটাবে কে বল লো সে ফুল-কুঁড়িকে।' যে ফুল ফুটবে না বলে পণ করেছে মিছে বারবার অলি গিয়ে সেধে আসল, সকাল-সন্ধ্যা রবি কলির কপাল ছুঁয়ে আসল। জংলা বধূ জল ঢেলে যায়, মৌমাছি মধু দিয়ে যায় কিন্তু বালিকা শরম চাদর খুলবে না বলে পণ করেছে। অলিরূপী পথিক কবির ভালোবাসার নিবেদন ব্যর্থ হলো। এতো প্রচেষ্টার পর যে বালিকার শরম টুঁটে নি তার প্রতি কবির অন্য সন্দেহ কাজ করছে; তাহলে কি তার হৃদয় সিংহাসনে অন্য কেউ আসীন?:

"কে জানে বোন পথ-ভোলা কোন
তরুণ চোখের করুণ চাওয়ায় চোখ ঠেরেছে ছুঁড়িকে –
বসে আছে লো
এই লজ্জাবতীর বধির বুকের সিংহ-আসন জুড়ি কে?"

(রচনাবলি, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১৫: ১০৫)

সর্বোপরি দেখা যায় নজরুলের মধ্যে যে এক চপল বালক ছিল সেই যেন এ কবিতার কবিতাগুলোতে এসে ধরা দিয়েছে। বাস্তবতার নিষ্ঠুর আক্রমণ তাঁকে বারবার আক্রান্ত করলেও পুরোপুরি ভারাক্রান্ত করতে পারেনি কখনোই। বিভিন্ন সময়েই তাঁর পাখির পালকের মতো হালকা উড়ুউড়ু মন প্রকাশিত হয়েছে শব্দের চাপল্যে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
‘জিঞ্জির’, ‘নতুন চাঁদ’, ‘বার্ষিক সওগাত’

'জিঞ্জীর' কাব্যটি ১৯২৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। 'জিঞ্জীর' অর্থ শেকল, বন্ধন বা গ্রন্থি। কাব্যটি মূলত নজরুলের প্রেম-প্রকৃতির বিপরীত ধারার কাব্য। কাব্যের ৩ টি কবিতার (বার্ষিক সওগাত, অঘ্রাণের সওগাত এবং এ মোর অহঙ্কার) কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে এসেছে প্রেম ও প্রকৃতি। শেষের দিকের প্রেম বিষয়ক কবিতায় নজরুলের প্রেম-দর্শন অনেক বেশি প্রাজ্ঞ। প্রকৃতির পটে প্রেম থাকলেও শেষের দিকে তিনিই যেন প্রকৃতি আবার সে প্রকৃতি আর আকাশ, বাতাস, সিন্ধু, বৃক্ষ, ফুলের মাঝে থাকে নি। ছড়িয়ে পড়েছে নভোমণ্ডলে। নক্ষত্র থেকে জ্যোতিষ্কে। পরবর্তীতে 'নতুন চাঁদ' এবং 'শেষ সওগাত' কাব্যের কবিতার আলোচনায় তা বিস্তারিতভাবে আসবে। 'জিঞ্জীরে'র উক্ত কবিতা ৩ টির বিশ্লেষণ করা যাক।

১.

'সওগাত' শব্দটি নজরুলের সাথে বেশ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। 'সওগাত' পত্রিকায় তিনি অনেক লেখালেখি করেছেন এবং এ শব্দ সংশ্লেষে একাধিক কবিতা এবং একটি কাব্য রয়েছে। 'সওগাত' অর্থ উপহার, আর 'বার্ষিক সওগাত' হিসেবে সাকি যা আনছেন তা 'বর্ষার সওগাত' এবং সেই সওগাত বা উপহার হচ্ছে দীর্ঘ বিরহের পরে 'প্রিয়-মিলনের রাত'। দীর্ঘ বিরহের কাল পার হয়ে যে মিলন-রাত্রি এসেছে সেখানে সওগাত হিসেবে এসেছে নজরুল-চেতনার নান্দনিক সব অনুষঙ্গ। ফারসী শব্দ-ঐশ্বর্যে এসেছে ইরানী অনেক উপাদান। যে প্রিয়ার সাথে সাথে পরম আকাঙ্ক্ষার মিলন সংঘটিত হবে তার 'লালা-ফুল সম দাগ-খাওয়া দিল, নার্গিস-ফুলি আঁখ,/ ইস্পাহানির হেনা-মাখা হাত, পাতলি পাতলি কাঁখ!/ নৈশাপুরের গুলবদনির চিবুক গালের টোল,/ রাঙা লেড়কির ভাঙা ভাঙা হাসি, শিরিন শিরিন বোল।'। নজরুল-চেতনা অনেকখানি পারস্য সাহিত্য ও ঐতিহ্য দ্বারা শাসিত ছিল বলে কবিতার উপমা-প্রতীকেও এর সাক্ষ্য মেলে। অথচ তাঁর সমকালের আরেক নন্দিত কবি জীবনানন্দের কবিতায় অনুষঙ্গ হয়ে এসেছে 'সিংহল সমুদ্র থেকে মালয় সাগর', 'বিম্বিসার অশোকের ধূসর নগরী', 'শ্রাবস্তীর কারুকার্য', এশিরিয়া, বেবিলনের

মৃত সুন্দরীরা। নজরুলের নায়িকার 'সুর্মা-কাজল স্তাম্বুলি চোখ, বসোরা গুলের লালি', আর সে নায়িকা হলেন 'নব বোগদাদি আলিফ-লায়লা, শাজাদি জুলফ-ওয়ালি।' আর এই মিলনোপহারে খাবার হিসেবে এসেছে পাকা খেজুর, ডাঁশা আঙুর, টোকো-মিঠে কিসমিস, যবের ফিরোজা শিস। নজরুল-বোদ্ধা রফিকুল ইসলাম বলছেন:

> "জীবনের শুষ্ক মরুভূমির ঊষরতা এ কবিতায় প্রত্যাখ্যান, কৃষ্ণনগরে কবির রোগ, শোক, দুঃখ-দৈন্য জর্জরিত জীবন যন্ত্রণা থেকে এ কবিতার সৃষ্টি। তাই কবিতার শুরুতে কবি যেমন বন্ধু সাকীর কাছে দীর্ঘ বিরহের পরে প্রিয় মিলনের রাতকে বরষের সওগাত বা উপহার স্বরূপ কামনা করেছেন, কবিতা শেষ করার আগে তেমনি আশা ভরা মুখ, তাজা বুক, যৌবনের গান গেয়েছেন! কবি আরবের প্রাণ, ফারেসের গান, নৌ-তুর্কীর বাজু, আফগানের দরাজ দিল কামনা করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে এক চরম হতাশার মধ্যে তিনি এক সজীব, প্রাণবন্ত, আশাময় জীবনের স্বপ্ন দেখেছেন। স্মরণীয় যে নজরুলের অবিস্মরণীয় গজল গানগুলি আর 'দারিদ্র্য' কবিতার সৃষ্টি একই সময়ে একই পরিবেশে। প্রতিকূল পরিবেশেও প্রতিভাবানের সৃষ্টি কত সুষমামণ্ডিত হতে পারে, নজরুলের উপরিউক্ত সৃষ্টি তার প্রমাণ।" (রফিকুল, ২০১৮: ৫৮৩)

কিন্তু, চোখের জল যে নজরুলের প্রেমের কবিতার অন্যতম সম্বল, তাই যে ভাব আর যে রস দিয়েই কবতা শুরু হোক না কেন চোখের জলের প্রসঙ্গ কদাচিৎ বাদ যায় তাঁর কবিতা থেকে। গুলিস্তান, ইস্পাহান, নৈশাপুর, ইস্তাবুল, বসরা, বাগদাদ, আফগানের রোমান্টিক মনোহারি জগৎ থেকে ঘুরে এসে তাঁর 'আশা-ভরা মুখ', 'তাজা তাজা বুক', 'নৌ-জোয়ানির গান', 'দুঃসাহসীর মরণ-সাধনা', 'জেহাদের অভিযান' সবই এসে মিলিত হয় চোখের জলে। বেদনা-সাগর মন্থন করে কবি একটু সুখের সন্ধান করতে প্রচেষ্ট হলেও তা যেন বুদবুদে মিলায় এবং ব্যথার জোয়ার এসে তা ভাসিয়ে নিয়ে যায়:

> "তাঞ্জাম-ভরা আঞ্জাম এ যে কিছুই রাখোনি বাকি,
> পুরানো দিনের হাতে বাঁধিয়াছ নতুন দিনের রাখি।...
> চোখের পানির ঝালর-ঝুলানো হাসির খাঞ্চাপোশ
> – যেন অশ্রুর গড়খাই-ঘেরা দিল্‌খোস ফেরদৌস –
> ঢাকিয়ো বন্ধু তব সওগাতি-রেকাবি তাহাই দিয়ে,
> দিবসের জ্বালা ভুলে যেতে চাই রাতের শিশির পিয়ে!
> বেদনার বানে সয়লাব সব, পাইনে সাথির হাত,

আনো গো বন্ধু নূহের কিশতি– 'বার্ষিকী সওগাত!'"

(রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, ২০১৫: ১১৩)

২.

'বার্ষিক সওগাত' কবিতায় কবির প্রেম-বাসনা পূর্তির সকল আয়োজন থাকলেও পরবর্তী কবিতা 'অঘ্রাণের সওগাত' এ বাঙালি কৃষক পরিবারের নবান্নের বিশুদ্ধ চিত্র অঙ্কন করেছেন তিনি। অগ্রহায়ণে নতুন ধান কাটা হয়, ঘরে ঘরে নব অন্নের উৎসব শুরু হয়। ক্ষুধা মানুষের অন্যতম জৈবিক বৃত্তি, অনেক কিছু অস্বীকার বা দমন করা গেলেও ক্ষুধা দমন কঠিন এবং প্রায় অসম্ভব। তাই খেটে খাওয়া গ্রামের চাষি পরিবারে যখন এই অন্নের সংস্থান নতুন ধান ঘরে আসে তখন সে খুশি মাত্রাতীত। অগ্রহায়ণ মাসে স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টিকে খাদ্যের সংস্থান হিসেবে সওগাত বা উপহার দেন। এসময় উৎসব পার্বণে মুখরিত ওঠে গ্রামের পর গ্রাম। পরিবারের ছেলে বুড়ো সকলের মধ্যে বয়ে যায় খুশির জোয়ার। নানান সুস্বাদু খাবার, মেলার আনন্দ আয়োজন মানুষকে উৎফুল্ল করে তোলে। সঞ্জীবনী শক্তিতে ভরে ওঠে প্রাণ। নতুন চালের ফিরনি রান্না করে গিন্নি 'হাসিতে হাসিতে দিতেছে স্বামীরে'। গোলা ভরে যখন নতুন ধান ওঠে তখন খুশির জোয়ার বয়ে যায় মনের সকল কোণে, ঘরের সকল প্রাণে। বাড়ির কর্তা-বিবিদের সাথে যোগ দেয় ছেলে-বুড়ো সবাই। 'পাড়ার দস্যি ছেলের দল', 'ময়নামতির শাড়ি-পরা মেয়ে', 'চাষা বৌ' সবাই যার যার মতো আনন্দে মাতে। জারিগান, গাজির গানের আয়োজন, পিঠা-পুলির আয়োজন, মেলা থেকে নানান জিনিস কেনা, ইত্যাদিতে প্রাণ মেতে ওঠে। বাংলার বারো মাসের ছয় ঋতুতে প্রকৃতি সাজে আলাদা আলাদা রূপে। বৈচিত্র্যময় ফুল-ফসলে ভরে ওঠে বাংলার পট। মানুষ পায় আলাদা আলাদা উপহার প্রকৃতির কাছ থেকে। অগ্রহায়ণ আমাদের নতুন ধান দিয়ে যখন বিদায় নেয় তখন প্রকৃতিতে বিদায়-কাঁদন আসে। রাখাল ছেলের বাঁশি আর বধূর পায়ের পরশে কাঠের ঢেঁকি অন্যরকম প্রাণ পায় নজরুলের হাতে:

"মাঠের সাগরে জোয়ারের পরে লেগেছে ভাটির টান।
রাখাল ছেলের বিদায়-বাঁশিতে ঝুরিছে আমন ধান!
কৃষক-কণ্ঠে ভাটিয়ালি সুর
রোয়ে রোয়ে মরে বিদায়-বিধুর!

ধান ভানে বউ, দুলে দুলে ওঠে রূপ-তরঙ্গে বান!
বধূর পায়ের পরশে পেয়েছে কাঠের ঢেঁকিও প্রাণ!"

(রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, ২০১৫: ১১৪)

বাঙালি পরিবারের এই আনন্দঘন পরিবেশের পাশাপাশি মেজো জামাই যে অনেকদিন আসে না স্নেহময়ী মায়ের সেই উৎকণ্ঠা আর ছোট মেয়ের 'আম্মা গো, রোজ কাঁদে মেজো বুবুজান' - এর মধ্য দিয়ে বেদনাঘন দিকটাও আড়ালে থাকেনি। তবে নবান্নের আনন্দে মানুষের মধ্যে যেন নতুন প্রাণের সঞ্চার হয় তেমনি কিছু সময় পরেই নবীনের লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে আসে নব নব কিশলয়, এটাকে নজরুল বলেছেন 'রিক্ত শাখার জয়' হিসেবে। বাকি সারা বছরের সঞ্চয় হিসেবে গোলা ভরে ধান রাখার পাশাপাশি হাসিও সঞ্চয় করে রাখতে বলেছেন। হেমন্ত-প্রকৃতির রূপ তুলে ধরতে নজরুল অসাধারণ কিছু চিত্রকল্প তৈরি করেছেন এ কবিতায়:

"হেমন্ত-গায় হেলান দিয়ে গো রৌদ্র পোহায় শীত!
কিরণ-ধারায় ঝরিয়া পড়িছে সূর্য – আলো-সরিৎ!
দিগন্তে যেন তুর্কি কুমারী
কুয়াশা-নেকাব রেখেছে উতারি।
চাঁদের প্রদীপ জ্বালাইয়া নিশি জাগিছে একা নিশীথ!
নতুনের পথ চেয়ে চেয়ে হল হরিত পাতারা পীত।"

(রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, ২০১৫: ১১৪-১১৫)

৩.

'ব্যথা-গরব' কবিতার মতো একই বিষয়ের কবিতা 'এ মোর অহঙ্কার'। কিন্তু পূর্বের কবিতার চেয়ে কবি এখানে আরো বেশি শিল্পীর পরিচয় দিয়েছেন। 'ব্যথা-গরবে'র মতো হাহাকার অশ্রুপাত এখানে তিনি করেন নাই। না-পাওয়া প্রিয়াকে কবি নিজের কবিতার বিষয় করে চিরস্মরণীয় করে রাখছেন এবং শুধু তিনিই নয়, পরবর্তীতে যারাই এ কবিতা পাঠ করবে তাদের মনে সে-প্রিয়ার অবয়ব কল্পিত হবার মধ্য দিয়ে চিরন্তন করে গেলেন প্রিয়াকে। আর যারা সাধারণ মানুষ তারা তো প্রিয়া চর্মচক্ষু দিয়ে দেখে নিমেষেই ভুলে যাবে, কিন্তু কবির মানস-আসনে সে 'নিখিল রূপের রানি'। না-পাওয়ার মধ্য দিয়েই ধ্রুব

করে পাওয়া নজরুলের প্রণয়দর্শন। প্রিয়ার দেয়া ব্যথা নিয়ে দূরে বসে তার স্তব রচনা করে তাঁর গান এবং কবিতার মাঝে প্রিয়াকে রেখে গিয়েছেন। সেই গান-কবিতার মাঝে প্রিয়া হয়ে উঠেছে কালের পর কালের জীবন্ত সত্তা। প্রিয়ার যখন দৈহিক অবসান ঘটবে তখন সবাই সাময়িক সময় পর ভুলে যাবে, কিন্তু কবির কবিতা ও গানে সে পাবে নব নব প্রাণ:

"রাখতে যেদিন নারবে ধরা তোমায় ধরিয়া,
ওরা সবাই ভুলবে তোমায় দুদিন স্মরিয়া,
আমার গানের অশ্রুজলে
আমার বাণীর পদ্মদলে
দুলবে তুমি চিরন্তনী চির-নবীনা!
রইবে শুধু বাণী, সেদিন রইবে নাকো বীণা!"

(রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, ২০১৫: ১৬৩)

কবির এ অহঙ্কারের বাস্তবিক প্রতিফলন আমরা দেখি, মূলত শিল্প সাহিত্যের মাধ্যমেই একমাত্র মানুষকে অমর করে রাখা যায়। উৎকৃষ্ট লেখনীর উপাদান হয়ে যে সকল ব্যক্তিত্ব এসেছে তারা মানুষের কাছে জীবন্ত থাকবেন কালের পর কাল। এই প্রিয়া এক লহমার বধু (নার্গিস?) হয়ে কবির জীবনে এসেছিল। সেই মুহূর্তকালকে কবি অক্ষয় করে রাখলেন। কবির ভাষায় 'এই তো আমার চোখের জলে,/ আমার গানে সুরের ছলে,/ কাব্যে আমার, আমার ভাষায়, আমার বেদনায়,/ নিত্যকালের প্রিয়া আমায় ডাকছ ইশারায়!...'। এবং জাগতিক প্রেমের কবি নজরুলের দেবীর দয়া অপেক্ষা প্রিয়ার আঁখিজল বেশি প্রার্থনীয়। আধুনিক কবিরা প্রেমকে জাগতিক করে এনেছিলেন, পূর্বে কতকগুলো ধরা-বাঁধা কাঠামোর মধ্যেই ছিল মনের সকল আবেগের প্রকাশ। এ কবিতা প্রসঙ্গে আলোচক বলেন:

"এ মোর অহঙ্কারে'র মধ্যে প্রেমের একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব প্রকাশিত। প্রেমিকের কল্পনা প্রেমিকাকে নুতন রূপে মণ্ডিত করে। প্রিয়া নিখিল রূপের রাণীমূর্তিতে কবির স্বপ্নে প্রতিভাত হয়। তাঁর কাব্যে প্রিয়ার শাশ্বত যৌবনরূপ ধরা পড়ে। তিনি প্রিয়াকে নিয়ে মাটির পৃথিবীতেই স্বর্গ গড়ে তুলতে ইচ্ছুক। তাঁর সঙ্গে প্রিয়ার সম্পর্ক নিত্যকালের। যদি পৃথিবীতে চিরকালের প্রিয়া পূর্ণভাবে ধরা নাও দেয়, তবুও প্রিয়ার স্মৃতি তাঁর পৃথিবীকে আলোকোজ্জ্বল করে রাখবে। প্রিয়া তখন তাঁকে ভুলে গেলেও কিছু যায় আসে না, কেননা

তিনি প্রিয়ার জন্য গান রচনা করে যাবেন, এই অহঙ্কারের আনন্দেই তিনি উল্লসিত।" (সুশীলকুমার, ১৯৯৭: ১৮৪)

নতুন চাঁদ

নজরুলের শেষের দিকে প্রকাশিত কাব্যগুলোর একটি 'নতুন চাঁদ' (১৯৪৫)। এ কাব্যের কবিতাগুলোও 'জিঞ্জির' কাব্যের কবিতার মতোই মিশ্র বিষয়ের কবিতা। প্রেম বিষয়ক কবিতার পাশাপাশি এসেছে ইসলামি ঐতিহ্য ও অনুষঙ্গের বিভিন্ন কবিতা। এ সময়ের প্রেমের কবিতায় আমরা অনেক বেশি স্থিত এবং প্রাজ্ঞ নজরুলকে পাই। বিরহ আছে কিন্তু সেই উদ্বেলিত তরঙ্গ নেই, গভীর থেকে গভীরতর প্রবহমানতা নিয়ে বেদনা এখানে মিশে গিয়েছে সৃষ্টি এবং স্রষ্টার অনুষঙ্গে। নজরুল হয়ে উঠেছেন অনেক বেশি আধ্যাত্মিক, যেন খুঁজে পেয়েছেন জীবনের পরম সত্য এবং স্বরূপ।

১.

কাব্যের দ্বিতীয় এবং নজরুলের প্রেম বিষয়ক কবিতাগুলোর মধ্যে অন্যতম 'চির-জনমের প্রিয়া'। নজরুলে প্রেমকে শরাবের সাথে তুলনা করে তাকে গেলাস, পেয়ালা, ভৃঙ্গারে খাওয়ার বহুচারিতার ধারণা যেমন আছে, তেমনি প্রেমাকাশে এক প্রিয়াকে ধ্রুব করে দেখার বিষয়টিও আছে। তাঁর শুরু থেকে শেষের প্রেমকবিতায় যে বিষয়টি অপরিবর্তিত রয়ে গিয়েছে তা হলো তাঁর হাহাকার। প্রেমে অতৃপ্তিই নজরুলের নিয়তি। তাই শেষের দিককার কবিতাতেও তাঁর পাঁজরভাঙা হাহাকার 'আরো কতদিন বাকি?/ বক্ষে পাওয়ার আগে বুঝি, হায়, নিভে যায় মোর আঁখি!' এবং তিনি এখন আর নিজের প্রেমসত্তাকে ফুল, পাখি, নদী, বৃক্ষের মাঝে প্রথিত করেন না, তাঁর বিরহী আঁখির তারা হয়ে ওঠে আকাশের দীপ্যমান তারকা, যারা কালের পর কাল খুঁজে ফেরে প্রিয়াকে৷ বারে বারে কবির জীবনপ্রদীপ নিভেছে, কিন্তু প্রিয়াকে দেখবার আকাঙক্ষা নিয়ে আঁখির প্রদীপ নেভেনি। এই আঁখি আর আঁখিজলের বন্দনায় কবি প্রিয়াকে মহিমান্বিত করে রাখছেন এবং অপ্রাপ্তির হাহাকার যেভাবে করছেন:

> "ওরা তারা নয়, অভিশপ্ত এ বিরহীর ওরা আঁখি,
> মহাব্যোম জুড়ে উড়িয়া বেড়ায় আশ্রয়-হারা পাখি!
> আঁখির আমার ভাগ্য ভালো গো, পেয়েছিল আঁখিজল,

তাই আজো তারা অমর হইয়া ভরে আছে নভোতল!
বাহু দিয়া মোর কণ্ঠ যদি গো জড়াইতে কোনোদিন,
আঁখির মতন এই দেহ মোর হইত মৃত্যুহীন!
তোমার অধর নিঙাড়িয়া মধু পান করিতাম যদি,
আমার কাব্যে, সংগীতে, সুরে বহিত অমৃত-নদী!"

(রচনাবলি, ষষ্ঠ খণ্ড, ২০১২: ৭)

গাছে গাছে যত ফুল ফুটেছে সেগুলো কবির 'কোটি জনমের ছিন্ন অশ্রু-হার'। লোক-লোকান্তরে কবি প্রিয়াবিরহে যত অশ্রুজল ফেলেছিলেন সেসব অশ্রু ফুল হয়ে এসেছে প্রিয়ার পদতল ছুঁইতে। ফুলের ঝরে পড়া, শুকিয়ে যাওয়া সবকিছুর সাথেই কবির বেদনা-বিরহ-অভিমান জড়ানো। বিশ্বজগতের সকল ঘটনাকে কবি এনে মিলিয়ে নিয়েছেন তাঁর ব্যক্তি অনুভবের সাথে। কোটি জনমের কবির অপূর্ণ সাধ জমে জমে আকাশের চাঁদ হয়ে স্থান নিয়েছে এবং চাঁদের বুকের কলঙ্ক সে প্রিয়ার স্মৃতির ছায়া। প্রাণহীন দেহ চাঁদকে আকাশে রেখে কবি ফিরে আসেন 'গোমতী পদ্মা যমুনা তীরে'। নজরুল বাস্তব প্রেমের কবি তাই তাঁর প্রেম শুধুই ভাবজগতে বিরাজ করে না, তিনি বায়বীয় অনুভবের প্রেম থেকে ভূমির প্রেমকেই বেশি আরাধনা করেছেন। তবে এই জাগতিক প্রেমের সুধাসাগরে তিনি এক বঞ্চিত আত্মা। তাঁর প্রিয়া হয়ে যায় 'ভবনের বঁধু' তিনি যান 'বন-পথে'। বনপথে গিয়ে তাঁর অশান্ত আত্মা ফিরে এসেছে শ্রাবণ-ঝড়ের অসহ্য রোদন হয়ে। তাঁর ক্ষুব্ধ সত্তা তিনি প্রক্ষিপ্ত করেছেন ঝড়ের উদ্দাম তাণ্ডবের মাঝে। তিনি প্রিয়াকে রবীন্দ্রনাথের মতো শুধু হৃদয় মাঝারে পেয়েই শান্ত নন, তিনি তাঁর প্রিয়াকে অন্যের বুক থেকে ছিনিয়ে আনতে চান। মহাপ্রলয়ের তাণ্ডবলীলা চালিয়ে তিনি নিজের প্রাপ্য বুঝে নেবার দর্শনে বিশ্বাস করলেও বাস্তবে তা পারেননি, তাঁর ক্ষুধিত প্রেম হয়ে উঠেছে আকাশের বিজলি-প্রদীপ:

"বিশ্বের ঘুম ভেঙে দিয়েছিনু! যেখানে যে ছিল সুখে
যেখানে প্রিয় ও প্রিয়া ছিল – সেথা বজ্র হেনেছি বুকে!
ঝড়ের বাতাসে আমার নিশাসে নড়িল না মহাকাল,
মোর ধূমায়িত অশ্রুবাষ্প রচিল জলদ-জাল।

অঝোর ধারায় ঝরিনু ধরায় খুঁজিলাম বনভূমি
ফুরাইল আয়ু, থির হল বায়ু, সাড়া দিলে নাকো তুমি!
আমার ক্ষুধিত সেই প্রেম আজো বিজলি-প্রদীপ জ্বেলে
অন্ধ আকাশ হাতড়িয়া ফেরে ঝঞ্ঝার পাখা মেলে!
তুমি বেঁচে গেছ, অতীতের স্মৃতি ভুলিয়াছ একেবারে,
নইলে ভুলিয়া ভয় – ছুটে যেতে মরণের অভিসারে!"

(রচনাবলি, ষষ্ঠ খণ্ড, ২০১২: ৯)

প্রেমকে, প্রিয়াকে একান্ত করে না পেয়ে তাঁর বিরহী সত্তা ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্ব চরাচরে। উদাসীন হাওয়া হয়ে ছুটে ফিরেছেন পৃথিবীর পথে পথে। যেখানে দেখেছেন ফুল প্রিয়া ভেবে ছুটে গিয়েছেন সেখানেই। গোপন হাওয়ার বেশে প্রিয়া চুল-চুড়ি-অঞ্চল ছুঁয়ে এসেছেন। নজরুলের পরিব্রাজী জীবন এই হাওয়াতেই যেন যথাযথ রূপায়িত হয়েছে। সুফীবাদের অন্যতম প্রাণপুরুষ জালালুদ্দিন রুমির 'তুমি যাঁকে খোঁজো, তিনি তোমাকেই চান' দর্শনের মতো নজরুলের প্রিয়া অন্যগৃহে গিয়ে নজরুলকে বিস্মৃত হতে পারে না। সেও কবির বিরহের আঘাতের ব্যথার অংশী। বিরহের ছায়া তার চোখের কোলেও দোলে। সেই বিচ্ছেদী শাশ্বত প্রিয়ার প্রেমের প্রতিশ্রুতিতে কবি হয়েছেন নজরুল। তাঁর কবিত্বের কৃতিত্ব তিনি সর্বদা নারী শক্তিকেই দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আলোচক শাহাবুদ্দীন আহমদ বলেন:

> "নজরুলের প্রথমা স্ত্রী নার্গিস আসার খানম-এর সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়ার পনেরো বছর পর তিনি এক চিঠিতে নার্গিসকে বলেছিলেন যে, নার্গিসের বিরহ-বেদনাই তাঁকে 'অগ্নি-বীণা' ও 'বিষের বাঁশী'র মতো কাব্য লিখতে অনুপ্রাণিত করেছে। আমরা নজরুল ইসলামের যে বিখ্যাত নারী-স্তোত্রমূলক কবিতা 'নারী' পাঠ করি, সেখানেও দেখি নজরুল লিখেছেন, 'নারীর বিরহে, নারীর মিলনে নর পেল কবি-প্রাণ।' সুতরাং নজরুলের কবি-সত্তার সৃষ্টিতে নারীর প্রেমময় ভূমিকা যে অনেকখানি তাতে কোন সন্দেহ নেই। নজরুল অনেক সময় মনে করেছেন তাঁর যে কাব্য বা তাঁর যে কবিতা সে তাঁর মানসলোকের স্বপ্নচারিণী নারী। তাঁর মানসচারিণীর রূপ কবিতা রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। সুন্দরী নারীর রূপ তিনি মুগ্ধচিত্তে অবলোকন করেন এই জন্যে যে, তার প্রতি অঙ্গে কাব্যের ছন্দ, রূপ, রস, অলংকার দেখতে পান। এমনকি তাঁর মনে হয়, বাইরের যে প্রকৃতি তিনি দেখেন সেই প্রকৃতির সৌন্দর্য নারীর মধ্যে বিকশিত। এই আকাশ, এই সাগর, এই বনভূমি, এই শ্যামল

প্রকৃতি, চাঁদ, তারা, তৃণলতা, ফল ও ফুল সবই নারীর সৌন্দর্যের ছোঁয়া পেয়ে সুন্দর হয়ে উঠেছে। নারীকে মনে হয়েছে তাঁর কবিতারই মতো এক জীবন-রহস্যের আধার। তাই তিনি রূপলাবণ্যময়ী নারীর দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকেন, তার থেকে চোখ ফেরাতে পারেন না।" (সম্পাদিত, মান্নান, ২০০১: ১৫১-১৫২)

২.

পরবর্তী কবিতা 'আমার কবিতা তুমি'তে নজরুল সরাসরিই বলছেন 'প্রিয়া-রূপ ধরে এতদিনে এলে আমার কবিতা তুমি,/ আঁখির পলকে মরুভূমি যেন হয়ে গেল বনভূমি!' — কবিতা লিখতে তিনি পেয়েছেন প্রিয়ার প্রেরণা আর সেই প্রেরণায় প্রিয়াই এসেছেন কবিতার রূপে। মিলনের মাধুরীতে প্রেম পায় অভ্যস্ততা, ধীরে সে তার সেই গভীর আবেদন হারায়, হয়ে ওঠে নিস্তরঙ্গ দিনে দিনে। বিরহে প্রেম তার শত মঞ্জরি নিয়ে বিকশিত হয়, হৃদয় পিষে ফুটিয়ে তোলে নন্দিত সব অঞ্জলি। ঝিনুকের অন্তর্যাতনায় যেমন মুক্তা তৈরি হয় তেমনি মানবহৃদয়ের দাহ থেকে তৈরি হয় অমূল্য সব শিল্প, সাহিত্যকর্মসহ বিবিধ মনোরম বিষয়। এই বিরহবোধ শুধুই যে নারীর জন্য নরের বিরহ বা নরের জন্য নারীর বিরহ তা নয়, সেটা স্থূল ভাসমান একটা বোধ মাত্র। মানুষ এর চেয়েও গভীর বোধ নিয়ে বিরহ নিয়ে নিজের সাথে নিজের অবিরাম বোঝাপড়া করে। যে বোধকে জীবনানন্দ দাশ কবিতায় আনবার চেষ্টা করেছেন। বৈষ্ণব তত্ত্বে বা সুফিবাদে স্রষ্টার সাথে বিচ্ছেদের মুহূর্ত থেকেই মানুষের এই অনন্ত বেদনা শুরু। সেই বেদনা মানুষ তার গভীর থেকে গভীরতম সত্তায় নিজে বয়ে বেড়ায়। জাগতিক সব বিরহ বঞ্চনায় সেই ব্যথা জেগে ওঠে। মানুষ ভাবে দৃশ্যত যা তাকে আহত করছে তা পেলেই বোধ হয় তার পূর্ণতা আসবে কিন্তু এ এক বিশাল ভ্রম। নজরুলও নারীর প্রেম থেকে ধীরে ধীরে তাঁর কবিতা নিয়ে গিয়েছেন স্রষ্টার প্রেমের দিকে। বিশেষ থেকে নির্বিশেষ হয়ে ওঠে তাঁর প্রেমিকা। শুধুই হৃদয় জানে কোন বোধ থেকে সে কী তৈরি করে। মানুষ তাকে খুঁজতে গিয়ে বৃথায় বিভিন্ন তত্ত্ব দাঁড় করায়, আদৌ তা কতখানি যথাযথ হয় তার মূল্যায়ন করার অবকাশ বা সুযোগ কোনোটাই আর থাকে না। নজরুল যে বিরহে পুড়েছেন তা থেকেই সাহিত্য রচনা করেছেন। কবিতার শরীরে তিনি রেখে গিয়েছেন তাঁর ব্যক্তি অনুভব এবং নিবিড় বেদনার ছাপ। নজরুলের সাহিত্যই নজরুল। 'তুমি' সম্বোধনে যে প্রিয়া বা প্রিয়াবোধকে তিনি লালন

করেছেন তাই তাঁর সকল কর্মের প্রেরণা। তার চলার ছন্দে কবির কবিতা পেয়েছে ছন্দ, তার দূরন্ত গতিতে তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে নবপ্রাণ; তাঁর সকল সৃষ্টি তা সেই প্রিয়াবোধেরই দান:

"জরাগ্রস্ত জাতিরে শুনাই নব জীবনের গান,
সেই যৌবন-উন্মাদ বেগ, হে প্রিয়া তোমার দান।
হে চির-কিশোরী, চির-যৌবনা! তোমার রূপের ধ্যানে
জাগে সুন্দর রূপের তৃষ্ণা নিত্য আমার প্রাণে।
আপনার রূপে আপনি মুগ্ধা দেখিতে পাও না তুমি
কত ফুল ফুটে ওঠে গো তোমার চরণ-মাধুরী চুমি!
কুড়ায়ে সে ফুল গাঁথি আমি মালা কাব্যে-ছন্দে-গানে,
মালা দেখে সবে, জানে না মালার ফুল ফোটে কোনখানে!"

(রচনাবলি, ষষ্ঠ খণ্ড, ২০১২: ১২)

যে অতৃপ্ত তৃষ্ণা নজরুলকে স্থির হতে দেয়নি সেই তৃষ্ণার কারণেই যুগে যুগে মানুষ সকল সৃষ্টিশীল কাজ করেছে, আবিষ্কারের নেশায় মেতেছে। প্রতিটি মানুষের ভেতরে আলাদা আলাদা রকম তাড়না কাজ করে, সেই তাড়নাই তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। নজরুলের প্রিয়া তার চিরসুন্দর রূপে বারবার তাঁকে অসুন্দরের পথ থেকে ফিরিয়ে এনেছে। কিন্তু ধরা দেয়নি এসে, মূলত কখনো দেয়না ধরা এমন প্রেম। হৃদয়ের মাঝে যে অনির্দেশ্য নির্দেশনা আসে সে পথে মানুষ পতঙ্গের মতো ছুটতে ছুটতে একসময় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে, তার গন্তব্য আর মিলে না। মানুষের জন্য পরম মমতা অনুভব করে, মানুষের যাতনা-বেদনা উপলব্ধি করে মানুষ যুগে যুগে মহানুভবতার স্বাক্ষর রেখেছে। তাঁদের অন্তর্ধানের পর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানবতা পান করে যাচ্ছে সেই প্রেমমধু। মহৎ শিল্প-সাহিত্যকর্ম তৈরি হয়েছে মানুষের যাতনা থেকে, বড় বড় সেবা সংগঠন তৈরি হয়েছে প্রেমের নির্যাস নিয়ে, কালে কালে আর্ত-মানবতা বেঁচেছে হৃদয়ের প্রেম-যাতনার রস পিয়ে। এই যাতনা স্থির হতে দেয় না মানুষকে, তাকে নিঙড়ে রসসিঞ্চন করে যায় ধরার প্রবহমানতা সঞ্জীবিত রাখতে। নজরুলে সেই রসধারা প্রকাশিত হয়েছে যমুনা নদীর রূপকে। রাধাবিরহের সাথে তাঁর বিরহকে একীভূত করে তিনি ভাষা দিয়েছেন:

"সবার তৃষ্ণা মিটাইতে আমি যমুনা হইয়া ঝরি,

জানে না পৃথিবী, কোন নিদারুণ তৃষ্ণা লইয়া মরি!
বড়ো জ্বালা বুকে, বলো বলো প্রিয়া – না-ই পাইলাম কাছে,
এই বিরহের পারে তব প্রেম আছে আজও জেগে আছে!
যদি অভিমান জাগে মোর বুকে না বুঝে তোমার খেলা,
দূরে থাক বলে ভাবি যদি তারে অনাদর অবহেলা –
কেঁদে কেঁদে রাতে যদি মোর হাতে লেখনী যায় গো থামি,
বিরহ হইয়া বুকে এসে মোর কহিয়ো – 'এই তো আমি।'"

(রচনাবলি, ষষ্ঠ খণ্ড, ২০১২: ১৪)

৩.

কবিপ্রিয়া কবিবুকে বিরহ ব্যথা দিয়ে নিজে 'নিরুক্ত' থেকে গিয়েছেন। হৃদয়-জগতে নিরুক্ত বা অব্যক্ত কথার কদর থাকলেও তা নিয়ে তো বাস্তব জগৎ চলে না। এখানে হৃদয়ের চেয়ে মুখের কথার মূল্য বেশি। তাই অনুভবের ভাষা দেয়াটাও গুরুত্বপূর্ণ। ভাষাহীন অনুভবই যদিও খাঁটি অনুভব তবুও জাগতিক হিসেব-নিকেশে সর্বদাই ওষ্ঠাগত শব্দেরই মূল্যায়ন হয়। এই ওষ্ঠাগত শব্দের স্বীকৃতি চেয়েই এ কবিতায় কবির আকুতি। জীবন তো সবই চায়; শুধু হৃদয়ের নিবেদন দিয়ে দেবতার পূজা হয়, মানুষের না। যে আড়াল টানে প্রিয়া সে কি লজ্জায়? না কি অবহেলায়? প্রাথমিকভাবে সেটা লজ্জা বা জড়তা বলে প্রতীয়মান হলেও পরে তা তো অবহেলা-অনাদরেই প্রতিপন্ন হয়। স্বীকৃতি বিহীন হৃদয়ের নিবেদন শঠতা বলেও প্রমাণিত হয়। কারণ ভীরুতায় প্রেম থাকে না, সমাজের কাছে প্রেমাষ্পদকে উপস্থাপিত করার শক্তিটুকু যে হৃদয়ের থাকে না সে হৃদয়ে তো প্রেমের বসত নয়; তা বেনিয়াবৃত্তির হৃদয়। প্রিয়মুখের না-বলা কথা শোনার জন্য উৎকণ্ঠিত নজরুল, তাঁর সেই উৎকণ্ঠা তিনি সঞ্চারিত করে দিয়েছেন গ্রহ-তারা-চন্দ্রের মাঝে; এ যেন মদনভস্মের ছাই ছড়িয়ে পড়বার মতোই:

"না-বলা তোমার সে কথা শোনার লাগি
শত সে জনম কত গ্রহ-তারা আড়ি পেতে আছে জাগি!
সে কথা না শুনে তিথি গুনে গুনে চাঁদ হয়ে যায় ক্ষয়,
শুনিবে আশায় লয় হয়ে চাঁদ আবার জনম লয়!

আমার মনের আঁধার বনের মৌনা শকুন্তলা,
কোন লজ্জায় কোন শঙ্কায়, যায় না সে কথা বলা?
তুমি না কহিলে কথা
মনে হয়, তুমি পুষ্প-বিহীন কুণ্ঠিতা বনলতা!
সে কথা কহিতে পার না বলিয়া বেদনায় অনুরাগে
তব অঙ্গের প্রতি পল্লবে ঘন শিহরণ জাগে।"

(রচনাবলি, ষষ্ঠ খণ্ড, ২০১২: ১৫)

বিপ্লব-বিদ্রোহে নজরুল আক্রমণাত্মক হলেও প্রেমে তিনি ভিখারী। এ ভিখারী কোনো ভিক্ষা চায় না, নিজেকে ভিক্ষা দিতে চায় প্রিয়া পদতলে। কত অনুনয় বিনয় করে প্রিয়ার কাছে তাঁর নিজেকে তুলে ধরবার প্রয়াস কবিতার মাধ্যমে। নীরবে যে প্রেম অব্যক্ত থাকে তা প্রকাশিত হয় না অনেক সময়, কত হিসেবের বেড়াজালে বন্দী হয়ে তা নিরুক্তেই মরে যায় তারই শব্দভাষ্য যেন নজরুল রেখে গিয়েছেন এ কবিতায়।

৪.

নজরুলের স্রষ্টা প্রেমের সরাসরি প্রকাশ ঘটেছে 'সে যে আমি' কবিতার মধ্য দিয়ে। পূর্বের অনেক কবিতায় প্রচ্ছন্নভাবে বা রূপক-প্রতীকে আসলেও এ কবিতায় মূর্তরূপে ধরা পড়েছে। কবি আর স্রষ্টা এখানে প্রেমের দুই পক্ষ এবং গোটা সৃষ্টি এই বিশ্বপ্রেমিকের বিভিন্ন প্রেমাবস্থার অভিব্যক্তির প্রকাশ। কবির জিজ্ঞাসা সেই দুরন্ত সুন্দর প্রিয়র কাছে কার পরে রাগ মরে তারার মুক্তা-মালিকা ছিড়ে গগন ভরে ছড়িয়ে দিয়েছে সে। প্রভাত সূর্যের লাল রূপ ধরে কার অনুরাগে লাল হয়ে নিজেকে প্রকাশে বা কাকে না পেয়ে সে এঁকে দিয়েছে চাঁদের বুকে কালো কলঙ্ক-রেখা। এমনি ভাবে জগতের সকল কিছুকেই তিনি দেখেছেন স্রষ্টার প্রেমভাবনার প্রকাশ হিসেবে। তাঁর প্রেমভাবনা কেবল চাঁদ-ফুল-পাখির মধ্যেই সীমিত থাকে নি, কালের প্রেক্ষিতে তা ছড়িয়ে পড়েছে আরো বিস্তৃত পরিসরে এবং পরিশেষে তা স্রষ্টায় গিয়ে মিলেছে। গভীর অনুভূতিপ্রবণ বিশ্বাসী প্রেমিক হৃদয়ের সংবেদনশীল মানুষেরা এই সংযোগ খুব স্পষ্টভাবেই অনুভব করে যে জগতের কোনো কিছু দিয়েই তাঁর পূর্ণতার অনুভব আসে না। এই অপূর্ণতার অনুভব থেকেই

সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'তুই ফেলে এসেছিস কারে মন মনরে আমার, তাই জনম গেলো শান্তি পেলি না...।' স্রষ্টার সাথের এই প্রেমানুভব মানুষের মনে একধরনের বৈরাগ্য আনে। জাগতিক ক্ষুদ্রতা থেকে সে এক ধরণের মুক্তি লাভ করে বৃহৎ সত্যের সন্ধান পায়। অধরা, অপ্রকাশ্য স্রষ্টার সাথে এমন কথোপকথনে কবিতাটি লিখছেন তিনি যেন সৃষ্টিকর্তা প্রত্যক্ষ বিরাজমান। কোনো জটিল গূঢ় তত্ত্বের মাধ্যমে তিনি তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেননি। মনের কথা সহজ শব্দে সহজে প্রকাশ করেছেন। তাঁর কবিতার এই সারল্য সম্পর্কে জীবনানন্দ দাশ বলেন:

> "নজরুলের কবিতার এমন অনেক গুণ আছে, যে-সবের সঙ্গে আজকের বাংলা কবিতার একটা প্রধান প্রাণতরঙ্গ মোটেই সমধর্মী নয়। এক কথায় বলতে পারা যায় যে, অনেক আধুনিক বাংলা কবিতারই মর্মবাণী ভেদ করা কঠিন, কিন্তু নজরুলের কবিতা হৃদয়ঙ্গম করা যায়; হৃদয় একটু অবসর চাইলে– অতর্কিত হয়ে পড়লে, সে কবিতা আবৃত্তি করে যে তৃপ্তি পাওয়া যায়, তাকে দৈবতস্বাদ বলে মনে করাও অসম্ভব নয়। কিন্তু তবুও নজরুলের কবিতায় অর্থসারল্য আছে, ওজস্‌ও রয়েছে এক হিসেবে, কিন্তু অর্থগভীরতায় এসব কবিতা আধুনিককালের প্রাজ্ঞ আত্মজিজ্ঞাসু মনকে ক্বচিৎ তৃপ্ত করে।"
> (সম্পাদিত, মান্নান, ২০০১: ৬১)

স্রষ্টার এই সৃষ্টিলীলা কি কারো প্রেম লাগি? তবে সেজন কবিই। তাঁর ধ্বংসে, সৃষ্টিতে, সংহারে, স্থিতিতে কীসের বার্তা দেয়, সেও কি বিরহী কবির মতোই? তাই যদি হয় তো সে বিরহীর প্রতি কবির নিবেদন:

> "আমি যে তোমার শক্তি হে প্রিয়, প্রকাশ বহির্জগতে,
> আমারে না পেয়ে দুঃখের রূপে কাঁদিছে স্বর্গে-মরতে।
> কলঙ্ক দিয়া আমার ধর্মে কলঙ্কী নাম নিলে হে,
> দুই হয়ে তব রটে অপযশ, একাকী তো বেশ ছিলে হে।
> তব সুন্দর-ছায়া মায়া রচে, মায়াতীত হয়ে তাহাতে–
> কেন আসক্ত হলে তুমি, তারে জড়ায়ে ধরিলে বাঁ হাতে?
> রূপ নাই, তবু রূপের তৃষ্ণা কেন তব বুকে জাগে,
> এত রূপ রসে ঝরিয়া পড়িছ বলো কার অনুরাগে?
> খেলা-শেষে মহাপ্রলয়ের বেলা আমার দুয়ারে থামি
> জানাবে পরম-পতি আমারে কি –

আমি, প্রিয়, সে যে আমি!"

(রচনাবলি, ষষ্ঠ খণ্ড, ২০১২: ১৯)

৫.

পূর্বের কবিতায় স্রষ্টার সাথে প্রেমানুভবে মিলে 'অভেদম'-এ এসে সৃষ্টি আর স্রষ্টাকে এক ও অবিচ্ছেদ্য সুঁতোয় বেঁধে ফেলছেন। সৃষ্টি এবং স্রষ্টা এক ও অভিন্ন, সৃষ্টি মূলত স্রষ্টারই প্রকাশ — এই মতবাদই এই অভেদ তত্ত্বের মূল কথা। শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শনে 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ' নামে যে তত্ত্ব বিদ্যমান তার সারৎসার এই একই কথা। নিরূপ-নিরাকার স্রষ্টা সৃষ্টির রূপে রূপেই বিদ্যমান। আর এটা কখনোই চিন্তা দিয়ে অনুভব করা যায় না, যুক্তি দিয়েও ব্যাখ্যা করা যায়; এ এক হৃদয়ানুভব। এ অনুভবেই লালন গেয়েছেন 'সে আর লালন এক সাথে রয় তবু লক্ষ-যোজন ফাঁক রে...'। সুফিজমের ফানাফিল্লাহ বা বাকাবিল্লাহ এই ধারণার উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই অনুভবকে কোনো তত্ত্বের আড়ালে নয়, কাব্যের সহজ ভাষায় প্রকাশ করেছেন নজরুল। যোগসাধনার মূল কথাও এটাই, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাথে নিজের মেলবন্ধন ঘটানো। মহাগ্রন্থ আল-কোরআনও সে স্বীকৃতি দেয় যে আল্লাহ মানুষের হৃদয়ের মধ্যে বাস করেন। সে ভাবকে নজরুল ভাষা দেন 'আমি তুমি যে অভেদ, কভু প্রভু বলে ছুটি।' এই যে স্রষ্টার সাথে অভেদ অনুভূতিতে মেলেন তিনি সেই অনুভূতি থেকে তাঁর দৃষ্টিকোণ হয়ে ওঠে স্রষ্টার দৃষ্টিকোণ। তাঁর কণ্ঠস্বরে শব্দরূপ পায় স্রষ্টার কথা:

"আপনারে ভোগ করিতে জন্মি বিপুল তৃষ্ণা হয়ে।
যত ভোগ করি তত আপনার তৃষ্ণা বাড়িয়া যায়
অমৃত-মধু মদ হয়ে উঠে তৃষ্ণায় পিয়ালায়!
বন্ধু! কেমনে মিটিবে তৃষ্ণা পূর্ণেরে নাহি পেলে,
আমি যে নিজেই অপূর্ণরূপে এসেছি পূর্ণে ফেলে!
সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার – এই তিন রূপই যাঁর লীলা,
সেই সাগরের আমি যে ঊর্মি, বিরহিণী ঊর্মিলা!

দুখ শোক ব্যাধি নিজে লই সাধি, – কখনও অত্যাচারী-

অসুর সাজিয়া কেড়ে খাই – পুন দেবতা সাজিয়া মারি!
বিদ্বেষ নাই, আসক্তিহীন শুধু সে খেলার ঝোঁকে
অসাম্য করি সৃজন – আবার সংহার করি ওকে।
খেলিতে খেলিতে সহসা চকিতে দেখি আপনারই কায়া
শ্রী ও সামঞ্জস্যবিহীন এ কী কুৎসিত ছায়া!
সেই কুৎসিত শ্রীহীন অসুরে তখনই বধিতে চাই,
মোর বিদ্রোহ সাম্য-সৃষ্টি – নাই সেথা ভেদ নাই।"

(রচনাবলি, ষষ্ঠ খণ্ড, ২০১২: ২০-২১)

নজরুলের এ সময়কার প্রবণতা সম্পর্কে গবেষক বলছেন:

"এই সময়কার কয়েকটি কবিতা, গদ্যভাষণ, চিঠিপত্র যা সংরক্ষিত হয়েছে, সেগুলি বিশ্লেষণ করলে মনে হতে পারে, যৌবনের সেই অকুতোভয় বিপ্লব-চেতনার সঙ্গে সম্প্রতি-অর্জিত একটি গভীর আস্তিক্যবোধ ও ঈশ্বরানুগত্যকে সর্বদা এক অসম সম্পর্কে মেলাতে চেষ্টা করে চলেছেন তিনি। সেই অসম-মিলনে তাঁর কবিতা, গান, বক্তৃতায় যেন একটা বিরোধাভাস ফুটে উঠেছে — একটি ক্লান্তির ধূসরতা, একটি সংশয়-সন্দিগ্ধতা, একপ্রকার আত্ম-অবিশ্বাসের বাষ্প লেগেছে।...এই নজরুলকে আমাদের কাছে অনেকটাই অভ্যাসবশীভূত, কৃত্রিম ও যান্ত্রিক লাগে।" (অরুণকুমার, ২০১৯: ৫৯১-৫৯৩)

৬.

'আর কতদিন?' কবিতায় কবির ব্যাকুল প্রতীক্ষা আর অন্বেষণ সেই প্রিতমের লাগি যাঁকে তিনি স্থিরভাবে পেয়েছেন তাঁর সকল সত্তা জুড়ে। মানুষকে দিয়ে মানুষের হৃদয় জুড়ায় না, তাই অন্বেষী মানুষ খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে থেমেছেন পরম স্রষ্টার কাছে। যে প্রিয়র লাগি এ কবিতাতে নজরুলের প্রতীক্ষা সকলেই যেন মর্মে মর্মে সেই প্রিয়র লাগিই উতলা। এ-প্রিয়র সন্ধানে কতজন অবলম্বন করেছেন কতশত উপায়। তিনি এ জগৎকে বেষ্টন করে রাখা অদৃশ্য সত্তা। যাঁর অস্তিত্ব ইন্দ্রিজ উপলব্ধিতে না আসলেও হৃদয়লোকে তিনি আছেন, আত্মায় চলে তাঁর জন্য নিত্য হাহাকার, অন্তরের শূন্যতা পরিপূর্ণরূপে পূর্ণ হয় না তাঁকে ছাড়া। অনন্ত জীবনজিজ্ঞাসায় সংবেদনশীল মানুষ সর্বদাই নিজের অস্তিত্বের মূল সন্ধান করে ফেরে। নজরুলও করেছিলেন তাই। জীবনের শোক, তাপ, বঞ্চনা, আঘাত, মৃত্যু, দেখে দেখে মানুষ বুঝতে শেখে যে এই পৃথিবী তাকে চূড়ান্ত প্রশান্তি দিতে পারবে না,

এই পৃথিবী তার চূড়ান্ত বাসস্থান নয়। কোথায় যেন কাকে ফেলে এসেছে সে, ছিঁড়ে এসেছে কোন বন্ধন। তার ব্যথার ব্যথী অদৃশ্যে কেউ আছেন। এই অদৃশ্য আধ্যাত্মিক সংযোগকে একেকজন একেকভাবে প্রকাশ করেছেন। ব্যথাভরা জীবনে নজরুলের ব্যথা পাবার ভাগই বেশি। প্রেমে বিরহ, সন্তানের মৃত্যু, মানুষের কাছ থেকে পাওয়া নির্মম আঘাত, রাজনীতিক ও শাসকগোষ্ঠীর দেওয়া যাতনা সব সময়ই তাঁকে একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয় খুঁজতে তাড়িত করেছে। জীবনকে গভীরভাবে অনুধ্যান করা প্রতিটি মানুষই এই অন্বেষণ করেছেন। নবী-রাসুলগণ(সা.) থেকে শুরু করে প্রায় সকল সাধকই এই অন্বেষণ করেছেন। নজরুলের ভাষায়:

"দূর গিরি হতে কে ডাকে, ওকি মোর কোহ-ই-তুর-ধারী?
আমারই মতো কি ওরই ডাকে মুসা হল মরু-পথচারী?
উহারই পরম রূপ দেখে ইশা হল না কি সংসারী?
মদিনা-মোহন আহমদ ওরই লাগি কি চির-ভিখারি?
লাখো আউলিয়া দেউলিয়া হল যাহার কাবা দেউলে,
কত রূপবতী যুবতি যাহার লাগি কালি দিল কুলে,
কেন সেই বহু-বিলাসীর প্রেমে, সাকি, মোরে মজাইলি,
প্রেম-নহরের কওসর বলে আমারে জহর দিলি?

জান সাকি, কাল মাটির পৃথিবী এসেছিল মোর কাছে,
আমি শুধালাম, মোর প্রিয়তম, সে কি পৃথিবীতে আছে?
'খাক' বলিল, না, জানি না তো আমি, 'আব' বুঝি তাহা জানে
জলেরে পুছিনু, তুমি কি দেখেছ মোর বঁধু কোনখানে?
আমার বুকের তসবির দেখে জল করে টলমল,
জল বলে, আমি এরই লাগি কাঁদি গলিয়া হয়েছি জল।"

(রচনাবলি, ষষ্ঠ খণ্ড, ২০১২:৩৩)

নজরুল জীবনীকার অরুণকুমার বসু এ কাব্য সম্পর্কে বলেন:

"সম্বিৎহারা নজরুলের ছন্নছাড়া লগ্নভ্রষ্ট সাহিত্য-জীবনের এবড়ো-থেবড়ো জমিতে ১৯৪৫ সাল নাগাদ গজিয়ে উঠল তাঁর অষ্টাদশতম মুদ্রিত কাব্য *নতুন-চাঁদ*। আয়োজনহীন

> উপচারহীন অপ্রস্তুত উৎসবের ক্লিষ্ট আকাশী সূচনা: *নতুন-চাঁদ*। বড়ো নিরুত্তাপ, কুয়াশাম্লান সেই চাঁদটি। যেন তার আবির্ভাব অনেক ধূলিম্লান মেঘের পর্দা সরিয়ে।... *নতুন-চাঁদ* মেঘাবৃত আকাশের মতো ম্লান কাব্যগগনের ছায়া। আপন ব্যাধি ও ক্রমবর্ধমান উপসর্গে দিনে দিনে নিষ্প্রভ হয়ে আসছিলেন কবি।... *নতুন-চাঁদ*-এর অন্তর্গত আমার কবিতা তুমি, নিরুক্ত, সে যে আমি, অভেদম্, অভয়-সুন্দর কবিতাগুলিতে ভিন্ন এক নজরুল যেন ভেসে ওঠে, যাঁর আত্মপ্রকাশের ভাষায় মরমিয়াবাদের আভাস লেগেছে।" (অরুণকুমার, ২০১৯: ৬৫৭-৬৫৮)

সর্বোপরি বলা যায় 'নতুন-চাঁদ'-এ এসে আমরা এক পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক নজরুলকে পাই। তাঁর প্রেম এখন আর ভূমণ্ডলীয় কাণ্ডকে কেন্দ্র করে ঘোরে না, তিনি এখানে একমাত্র চরম ও চূড়ান্ত সত্তার জন্য আকুল। এইটাই হয়তো সতত জিজ্ঞাসু সকল মানুষের চূড়ান্ত গন্তব্য। মানুষের মন কখনো শূন্য থাকে না, সর্বদাই কোন না কোন কিছুতে সে বিভোর থাকে। কিন্তু সৃষ্টিকর্তা বা চরম-চূড়ান্ত সত্তা ব্যতীত কোনো অবলম্বনই দীর্ঘসময় ধরে তাকে আচ্ছন্ন রাখতে পারে না। তাই শেষ আশ্রয় হিসেবে অনেক অন্বেষণ শেষে এই বিন্দুতে এসে অনেকেই স্থিত হয়েছেন, হয়েছেন নজরুলও।

শেষ সওগাত

'শেষ সওগাত' (১৯৫৮) নজরুলের শেষের দিকে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের অন্যতম। এ কাব্যের কবিতাগুলোতে 'নজরুলের পুরনো স্বর ও সুরেরই রোমন্থন রয়েছে'। বিভিন্ন ধাঁচের কবিতার মধ্যে প্রেম ও প্রকৃতি বিষয়ক কিছু কবিতাও এ গ্রন্থে রয়েছে। সংখ্যায় অল্প হলেও নজরুলের প্রেমভাবনা বোঝার জন্য কবিতাগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম।

১.

'নারী' শিরোনামে নজরুলের আরেকটি জনপ্রিয় কবিতা রয়েছে 'সাম্যবাদী' কাব্যে। নারীকে তিনি বিভিন্নভাবে মহিমান্বিত করেছেন অনেক কবিতাতেই। বিরহ-বেদনার জায়গা থেকে নারীকে আক্রমণও তিনি করেছেন। এ কবিতার শুরুতেই নারীকে তিনি 'ফিরদৌসের ফুল' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ কবিতায় প্রধানত তিনি নারীকে প্রেমদাত্রী হিসেবেই দেখেছেন। কবিতাটিতে বারংবার 'রস' শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে বোঝা যায় পুরুষের কামনাবাসনার সঙ্গী বা উপাদান হিসেবেই নারীকে তিনি এ কবিতায় চিত্রিত করেছেন। তাঁর ভাষায়:

> "অনন্ত-ধারা প্রেমের ঝর্ণা কোথায় লুকাইয়া ছিলে?
> উদাসীন গিরি-পাষাণের হিয়া রসে ভাসাইয়া দিলে!
> পাথরের বিগ্রহ হয়েছিল নিস্তেজ আদি-নর,
> তেজোময়ী আদি-নারী সে পাষাণে কাঁপাইলে থরথর।
> নিষ্কাম ঘন অরণ্যে সেই প্রথম কামনা — জুঁই
> আঁখি মেলি যেন দেখিল সৃষ্টি, হেসে এক হল দুই!...
> সালাম লহ গো প্রণাম লহ গো প্রকৃতি পুণ্যবতী,
> তব প্রেম দেখায়েছে গো চির আনন্দ-ধামের জ্যোতি!..
> নারীর পুণ্য প্রেম আনন্দ রূপ রস সৌরভ

আজো সুন্দর করিয়া রেখেছে বিধাতার গৌরব!"

(রচনাবলি, ষষ্ঠ খণ্ড, ২০১২: ৬২)

নারীকে স্বতন্ত্র মানুষ হিসেবে দেখাটা কঠিন হয়েছে অনেকের জন্যই, পুরুষরা তো পুরোপুরিভাবে পারেইনি, নারীর অধিকাংশ সময়ই পুরুষের দৃষ্টিতেই তাকে দেখেছে। নারীর স্বতন্ত্র মর্যাদা, অবদান ও অবস্থানের জায়গাটার মূল্যায়ন সবসময়ই যেন উপেক্ষিতই থেকেছে। 'সপ্ত আকাশ রসে ডুবাইয়া প্রেম ও মাধুরি লয়ে' যে নারীর আগমন ঘটানো হচ্ছে কবিতায় তাকে তো পুরুষের রসযোগানদাতা হিসেবেই দেখা হবে।নারীর প্রতি নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গিকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে গবেষক বলছেন:

> "প্রেয়সী কল্পনার ব্যাপারে আমরা নজরুলকে নিতান্ত মধ্যযুগীয় বলে দেখতে পাই। তাঁর প্রেয়সীদের মধ্যে এক 'পূজারিণী' এবং দ্বিতীয়ত 'চক্রবাক'-এর নায়িকা ছাড়া আর সকলেই অভিন্ন — এক ছাঁচে ঢালা কামনা-সহকারী সাকী। এই এক পরিচয় ভিন্ন তাঁদের স্বতন্ত্র কোনো সত্তা নেই। কল্যাণীও নন তাঁরা (একমাত্র মাতৃজাতীয়া কয়েকজনের কল্যাণীরূপ পাওয়া যায় নজরুল-কাব্যে)। নজরুলের সাধারণ প্রেয়সীরা কেবল পুরুষদের মরুতৃষা মিটাবার মধুকরী। তাঁরা কখনোই মাথার ঘোমটা ছিঁড়ে ফেলে কামনার দাসত্ব শৃঙ্খল ভেঙে ফেলেন না। তাঁদের মনের কোনো বালাই নেই — হৃদয়ের সমৃদ্ধি বলতে নেই কিছু — নওরোজের রূপের হাটের পসারিণী রূপেই তাঁরা নজরুলের কল্পনাকে উজ্জীবিত করেছেন। এইখানে এসে নজরুলের চোখে পুরুষ-রমণীর ভেদ দুস্তর। প্রথম — ভোক্তা, দ্বিতীয়া — ভোগ্যা।" (সনজীদা, ২০২০: ১৫৪-১৫৫)

২. 'তুমি কি গিয়াছ ভুলে?' কবিতায় নজরুল তাঁর চিরচেনা রূপে চিরকালীন হাহাকার আর বেদনামেশা প্রশ্ন নিয়ে এসেছেন। নজরুলের প্রেম বিষয়ক কবিতার শুরু থেকে প্রায় শেষ অবধি এই হাহাকার একই মাত্রা ও ব্যঞ্জনা নিয়ে আসীন। আর শূন্য হৃদয় বা একাকী মনের প্রতিরূপ হিসেবে একাকী পাখি, শূন্য নদীতীর, শূন্য আকাশ প্রভৃতি প্রকৃতির অনুষঙ্গ এসেছে শুরু থেকেই। বাঙালির শ্বাশত প্রেমের বিরহের মূর্তিই যেন এ কবিতা। সহজ কথায় তুলে এনেছেন নিজের মনের কথা এবং হাজারো মনের অব্যক্ত কথা:

> "কতদিন সাঁঝে হইয়াছে মনে, তোমারে বা দেখিয়াছে,

তরণিতে কার চেনা বাঁশি শুনে আসিয়াছ কাছাকাছি।
আঁচল ভরিয়া জলে-ভেজা রাঙা হিজলের ফুলগুলি
কুড়াতে তোমার ঘোমটা খসেছে, এলোখোঁপা গেছে খুলি!

সর্পিল বাঁকা বেণি,
ওর সাথে ছিল মোর আঙুলের কতই না চেনাচেনি!
ওই সে বেণির বিনুনিতে মোর বাঁধা পড়েছিল হিয়া,
কতদিন তারে ছাড়াতে চেয়েছে আমার আঙুল দিয়া! –
দাঁড়ায়েছ আসি, সোনাগোধূলিতে আকাশ গিয়াছে ভরে,
পিছনের কালো-বেণিতে সন্ধ্যা বাঁধা পড়ে কেঁদে মরে!"

(রচনাবলি, ষষ্ঠ খণ্ড, ২০১২: ৬৮)

৩. 'সুখবিলাসিনী পারাবত তুমি' কবিতা নজরুলের আরেকটি অন্যতম ব্যথাতুর কবিতা। তাঁর ব্যথাভরা সুখবিলাসিনী পায়রাদের কাছে তিনি সবসময়ই অবাঞ্ছিত ছিলেন। তিনি সহজে এ দায়ভার স্বীকার করে নিচ্ছেন যে তাঁর বেদনানদীতীরে সুখের আশায় আসা কেউ নীড় বাঁধবে না সেটাই স্বাভাবিক। জীবনের সহজ স্বাচ্ছন্দ্যের কাছেই মানুষ ধরা দেয়। সংবেদনশীল মনের মানুষেরা বস্তুগত হিসাবের বাইরে জীবনকে দেখে বলে তাঁদের ব্যথা পাবার ভাগটাও বেশি। নজরুলের আজীবনের সঞ্চিত বেদনার সারৎসার করলে বোধ হয় এমনই দাঁড়ায়। কিন্তু নজরুল অপরপক্ষকে দোষারোপ করার পরিবর্তে নিজেকে খোঁজার একটা প্রয়াস প্রায় সব কবিতাতেই রাখেন। তাঁর ভাষায়:

"আমার গানের চির-দাহ যাহা সে আছে গো নীলকন্ঠে মম,
চিরশেষে এল যে অমৃতবাণী, দিনু তা তোমারে হে প্রিয়তম!
আমার শাখায় কন্টক থাক, কাঁটার ঊর্ধ্বে তুমি যে ফুল –
আমি ফুটায়েছি তোমারে কুসুম করিয়া, সে মোর সুখ অতুল।
বিদায়-বেলায় এই শুধু চাই, হে মোর মানস-কানন-পরি,
তোমার চেয়েও তব বন্ধুরে ভালোবাসি যেন অধিক করি।"

(রচনাবলি, ষষ্ঠ খণ্ড, ২০১২: ৭৫)

পরিশেষে বলা যায়, ব্যথার কবি নজরুলের নিয়তিতে যেন ব্যাথা পাবার ভাগটাই বেশি। নিজে কাঁটার ব্যথা ভোগ করে সর্বদাই অন্যকে ফুলের সুবাস তিনি দিতে চেয়েছেন, দিয়ে গিয়েছেন। এ কবিতাটিও যেন সেসবের মর্মকথা বহন করে।

অধ্যায় সাত

প্রেম-প্রকৃতির কবিতায় নজরুলের প্রবণতা ও স্বাতন্ত্র্য

নজরুল ছিলেন স্বভাবকবি। তিনি তাঁর নিজের হৃদয়ে আহবান ছাড়া আর কোন আহবানে সাড়া দেন নাই। সাহিত্যে প্রকরণ বা তত্ত্বের ভার তিনি তাঁর লেখার উপর চাপাননি। তাঁর সত্য এবং আপন হৃদয়ের অকৃত্রিম বোধই তাঁর তত্ত্ব। বৈষ্ণব কবিদের প্রেমপ্রকাশ যেমন রাধা-কৃষ্ণের তত্ত্ব দিয়ে আক্রান্ত, রবীন্দ্রনাথ সুদূর গগনে বিহারী কিন্তু নজরুল এ পৃথিবীর রক্তমাংসের মানুষের প্রেমে বিভোর, একান্তই মানবীয় প্রেম তাঁর কবিতার উপজীব্য। সমকালে যতীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, জীবনানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্রসহ আরো অনেক প্রথিতযশা কবিরাই সামনের সারিতে ছিলেন। কিন্তু, নজরুলের একটা স্বাতন্ত্র্য ছিলো। নজরুলে ছিলো অকৃত্রিম আবেগ এবং তার অকুণ্ঠ প্রকাশ, তা দিয়ে তিনি সহজেই পাঠকমন আবিষ্ট করতে পারতেন। ক্ষেত্রবিশেষে নজরুলের ভঙ্গিতে প্রভাবিত হয়েছে সমকালীন লেখকরা। 'অকৃত্রিম বোহেমিয়ানিজম, দারিদ্র্যবিলাস, দুঃখলীলা, মৃত্যুবিহার, ওমর খৈয়ামসুলভ ইহবাদী ভোগবাদ এবং সর্বোপরি মানবতার প্রতি অকুণ্ঠ মমতা ও শ্রদ্ধার মধ্য দিয়েই 'কল্লোল' গোষ্ঠীকে প্রভাবিত করেছিলেন'। নজরুলের সমকালীন লেখকদের সাথে নজরুলের মিলের প্রসঙ্গে গবেষক বলছেন:

> "কিন্তু এঁদের সঙ্গে নজরুল-প্রতিভার কোনো বিশেষ সাযুজ্য ছিল না। এমন কি শরৎ-প্রতিভার সঙ্গে নজরুল-প্রতিভার কোন অন্তরঙ্গতা নেই। রবীন্দ্র-প্রভাবের গভীরতা ও প্রখরতা বাদ দিলে সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, এবং যতীন্দ্রনাথের সঙ্গেই নজরুল-মানসের ভাবধারা ও প্রকাশরীতির অন্তরঙ্গ সহৃদয়তা আবিষ্কার করা যায়। এঁদের মধ্যে মোহিতলালের সঙ্গেই নজরুলের ব্যক্তিগত বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল।" (সুশীলকুমার, ১৯৯৭: ২৬)

নজরুলের সমসময়ে যাঁরা কবিতা লিখেছেন তাঁদের কবিতার তুলনায় নজরুলের কবিতা আলাদা ধাঁচের। না নজরুল ছিলেন কোনো দলের অনুসারী, না তাঁর ছিলো কোনো অনুসারী দল। অগ্রজ মাইকেল মধুসূদন দত্তের মতোই তিনি একাই একটা সাহিত্যকাল এবং ধরণকে ধারণ করে ছিলেন। বৈষ্ণব পদাবলীর অতিলালিত্য, গীতিকবিদের একচ্ছত্র

গীতময়তা এবং রবীন্দ্রনাথের ভাবলোকের বিহার থেকে এক নতুন ধারার উন্মোচন নিয়ে কাব্যাকাশে এলেন তিনি। সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে প্রমুখদের কবিতা যখন সাধারণ পাঠকদের বোধগম্যের বাইরে তখন নজরুলের কবিতার ভাষা যেন সাধারণ মানুষেরই মুখের ভাষা। প্রচণ্ড সরল ভাষায় তিনি সাধারণ কথা প্রকাশ করেছেন কোনো কৃত্রিম আবরণ ছাড়াই। তাঁর কবিতার শিল্পগুণ নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন এবং নানাবিধ মন্তব্য করেছেন। তাদের উত্তরে তিনি 'আমার কৈফিয়ত' কবিতায় বলছেন:

"বন্ধু গো, আর বলিতে পারি না, বড় বিষ-জ্বালা এই বুকে!
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে।
রক্ত ঝরাতে পারি না ত একা,
তাই লিখে যাই এ রক্ত-লেখা,
বড় কথা বড় ভাব আসে না ক' মাথায়, বন্ধু, বড় দুখে!
অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু, যাহারা আছ সুখে!"

(আমার কৈফিয়ত, সর্বহারা)

এই কৈফিয়তেই লুকিয়ে আছে নজরুলের স্বাতন্ত্র্য। ঠিক এমন স্বতঃস্ফূর্ত আবেগই তাঁর কবিতার শব্দে শব্দে প্রবাহিত। তাঁর কবিতার মূল যে দুইটা ধারা সেই দুই ধারার কবিতাতেই এই স্বতঃস্ফূর্ততা প্রবলভাবে লক্ষ্যণীয়। যেখানে তাঁর বিদ্রোহের বাণী ঝংকৃত হয়েছে সেখানে তিনি যেমন তাঁর সবটুকু সত্তা নিয়েই কবিতার আত্মায় বিরাজমান, তেমনি তাঁর প্রেমের কবিতাগুলোর দিকে লক্ষ্য করলেও দেখা যায় সেখানে একদমই মুখোশহীন অকৃত্রিম আবেগেরই স্ফূরণ। তাঁর প্রায় সকল সাহিত্যকর্ম ও সঙ্গীতের দিকে মনোনিবেশ করলে অনায়াসেই বোঝা যায়। এক 'পূজারিণী' কবিতাতেই প্রেমের বহুবর্ণিল আবেগ এসে স্থান পেয়েছে। মানুষের মনের যে বাঁকবদল তার এমন সহজ ভাষ্য নজরুল ছাড়া অন্যদের জন্য দেয়া কঠিন। মানুষের মন পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে সংবেদনশীল জিনিসগুলোর অন্যতম। এই মনকে কোনো নির্দিষ্ট কাঠামোয় বাঁধা চলে না, কিন্তু বাঁধা না চললেও সাহিত্যকর্মে তার সত্য প্রকাশ খুব কমজনেই করেছেন। বাংলা সাহিত্যের জগতে ওই সময়ে বিদ্যমান শক্তিশালী, প্রতিষ্ঠিত ধারার বাইরে যাঁরা নতুনত্ব নিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে নজরুল অন্যতম। এ সম্পর্কে নজরুল-গবেষক সুশীলকুমার বলছেন:

> "সত্যেন্দ্রনাথের পরেই রবীন্দ্র-রোমান্টিসিজমের বিরুদ্ধে প্রকৃত বিদ্রোহ ঘোষিত হল। তদানীন্তন কাব্যের রহস্যময়তা, শুচিতা, সৌন্দর্যময় অতীন্দ্রিয়তা, আত্মকেন্দ্রিক ভাবতন্ময়তা প্রভৃতির স্থলে নূতন জীবনদর্শন নিয়ে এগিয়ে এলেন যতীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল ও নজরুল। বাঙলা কাব্যের ক্ষেত্রে পালা-বদলের শুভশঙখধ্বনি শোনা গেল।" (সুশীলকুমার, ১৯৯৭: ৩২৬)

এই স্বাতন্ত্র্য আনতে গিয়ে নজরুল অবশ্যই তাঁর শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হননি। তাঁর সাহিত্যিক বৃক্ষ পুষ্টি আহরণ করেছে চারপাশে শিকড় বিস্তার করেই। বর্ধমান জেলার বৈচিত্র্যময় ধর্মীয় সহাবস্থান নজরুলের মনন গড়তে অন্যতম ভূমিকা রেখেছিল। পারিবারিক ঐতিহ্যে পেয়েছিলেন ইসলাম ধর্মের উত্তরাধিকার, সনাতন ধর্ম, বৈষ্ণব মতবাদ প্রভৃতির রস পুষ্ট করেছিল নজরুল মননকে। ফলে তাঁর গান-কবিতায় হিন্দুয়ানী ঐতিহ্য যেমন এসেছে, এসেছে ইসলামি ঐতিহ্যও। পঠন-পাঠন ও অন্যান্য সূত্র ধরে পেয়েছিলেন ইংরেজি, পারস্য প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যের ছোঁয়া। ফলে সমকালীন সকল সাহিত্যিকের বৈশিষ্ট্য ছাপিয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন অনন্য। এ সম্পর্কে গবেষক আজহারউদ্দীন বলছেন:

> "নজরুলের প্রেমের কবিতা মোহিতলালের কোন কোন কবিতার কথা মনে করিয়ে দিলেও নজরুলের কবিতা যেখানে প্রেমোল্লাসে ঝর্ণার মতো চপল, মোহিতলালের কবিতা সেখানে গভীর জলের মতো গম্ভীর; রবীন্দ্রনাথ সত্যেন দত্তের বিচিত্র ছন্দোবদ্ধ পদলালিত্য শব্দঝংকার তাঁর কবিতায় পাওয়া গেলেও অনতিবিলম্বে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির জোরে তাঁদের প্রভাব এড়িয়ে যেতে সমর্থ হয়েছেন। জীবনানন্দের প্রেম শরীরী রক্ত-মাংসের হলেও তা যেন একটি বিষণ্নতার স্পর্শে নিরুত্তেজ। প্রেমের মধুর তিমিরে মগ্ন থাকার মধ্যে কোথায় যেন সামান্যতম গ্লানি রয়েছে — এ ধারণা ছিল জীবনানন্দের, অচিন্ত্যকুমারের। বরং নজরুলের স্বকালবর্তী কবি বুদ্ধদেব বসুর ভোগবাদে দৃঃসাহসিকতার ছাপ রয়েছে। প্রেম করা যে গ্লানিকর বিষয় নজরুল তা মনে করেন না।" (আজহার, ১৯৯৭, ৩৪৩)

নজরুল যেন সকল শেকল ভাঙতেই এসেছিলেন পৃথিবীতে। ভাঙতে চেয়েছেন ভারতবর্ষের দীর্ঘকালীন রাজনৈতিক শৃঙ্খল, চেয়েছিলেন ভাঙতে ধর্মীয় গোঁড়ামির শৃঙ্খল। নিজের জীবন দিয়ে তিনি তা করে দেখিয়েছেন এবং মৃত্যু অবধি লেখা ও গানে তার চেষ্টা

অব্যাহত রেখেছেন। নজরুল যেন সকল বন্ধন উড়িয়ে-গুড়িয়ে দিয়ে মুক্তির গানের পাখি হয়ে বাংলা ভাষার সাহিত্যজগতে উদিত হয়েছিলেন। নজরুলের এই প্রবণতা সম্পর্কে গবেষক বলছেন:

> "গোবিন্দদাসের ঋজু ভোগবাদ প্রথম আমাদের চমকিত করেছে। তার পূর্বে মাইকেলেও কখন কখন এই আবেগজনিত দুন্দুভিনিনাদের গুরু গুরু টের পাওয়া গেছে। কিন্তু পরোক্ষ প্রকাশ। ব্যক্তিগত বেদনার বাঁধ-না-মানা স্বতোচ্ছ্বাসিত আত্মপ্রকাশ নয়। নজরুল তাঁর অনুভূতির সমস্ত সততা নিয়ে এই চেতনার প্রবল অনুভূতিকে মুক্তি দিলেন। প্রাচীরভাঙা আবেগের বন্যা সংস্কারের জঞ্জাল ভাসিয়ে নিয়ে গেল। পূর্ববর্তীদের চাইতে ইনি আরও বিশিষ্ট এইজন্য যে, তিনি কামনার প্রথম সঞ্চারে তাঁর পাত্রনিরপেক্ষ দুঃসহ দুর্নিবার প্রকাশ-বেদনাকে রূপায়িত করলেন।" (সনজিদা, ২০১৮: ৩৪)

নজরুলের সকল বলিষ্ঠতা নিয়েই নজরুল কোথায় যেন একান্তই শিশু, এ শিশুত্ব তাঁর সততার এবং অকৃত্রিমতার। দীর্ঘদিনের চর্চিত নিয়মবাঁধা সাহিত্যধারাকে মুক্তি দিয়ে মানুষের অন্তর্জগতকে প্রাধান্য দিয়ে আসলেন রোমান্টিক কবিরা। রোমান্টিক কবিরা ব্যক্তির মনের গভীরে প্রবেশ করে তুলে আনতে চাইলেন বিভিন্ন অভিব্যক্তিকে। আর এই গহীনের অভিব্যক্তির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বিরহ। মানুষের পৃথিবীতে পদার্পণের মধ্য দিয়েই যেন তাঁর বিরহবোধ শুরু হয় আর শেষ হয় দেহত্যাগের মধ্য দিয়ে। নজরুল যেন তাঁর সবটুকু দিয়েই এই বিরহকে উপলব্ধি করেছিলেন এবং তার শব্দভাষ্যও রেখে গিয়েছেন ভবিষ্যতের মানব-মানবীর জন্য। তবে এই বিরহপ্রকাশেও তাঁর একটা নিজস্বতা ছিল, এ সম্পর্কে গবেষক বলছেন:

> "যাঁদের পড়াশুনার পরিধি দূরবিস্তৃত তাঁরা তাঁর প্রেমের কবিতায় বায়রণের অন্তর্দাহপ্রতপ্ত আবেগ, কীটসের স্পর্শকাতর চিত্ররূপ, শেলীর আদর্শবাদের কবোষ্ণ সান্নিধ্য কমবেশি অনুভব করবেন। তিনি প্রেমের মিলনের কবি নন, তিনি বিরহের কবি, ব্যথার কবি, চোখের জলের কবি। এ-বিরহ রাধিকার বুক ভাঙা বিরহ নয়, সংসার-অনভিজ্ঞ বাউন্ডুলে তরুণ-তরুণীদের ইচ্ছে করে পরস্পরের অভাবজনিত মন উদাস করে রাখা। এজন্য তাঁর বায়রণ কিংবা পোপের মত তিক্ততা ও বিরক্তি আসেনি, শেলী কীটসের স্পর্শ কাতরতা থাকলেও ব্যর্থতা ও বিক্ষোভের সুর উগ্র হয়ে ওঠেনি।" (উক্ত, আব্দুল কাদির, ২০০১: ১৫৭)

সমকালে অনেকেই নজরুলকে যেমন চিনতে পেরেছিলেন তেমনি পারেননিও অনেকে। রবীন্দ্রনাথ চিনেছিলেন তাঁকে। নজরুলের অনন্যতা ও অকৃত্রিমতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূল্যায়ন:

> "অরুগ্ন-বলিষ্ঠ-হিংস্র-নগ্ন-বর্বরতা তার অনবদ্য ভাবমূর্তি রয়েছে কাজীর কবিতায় ও গানে। কৃত্রিমতার ছোঁয়াচ তাকে কোথাও ম্লান করেনি, জীবন ও যৌবনের সকল ধর্মকে কোথাও তা অস্বীকার করেনি। মানুষের স্বভাব ও সহজাত প্রকৃতির অকুণ্ঠ প্রকাশের ভিতর নজরুল ইসলামের কবিতা সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে তার আসন গ্রহণ করেছে।" (উক্ত, আব্দুল মান্নান, ২০০১: ৫১)

নজরুল তাঁর সকল অনন্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটা আলাদা ধারাই তৈরি করে গিয়েছেন বাংলা সাহিত্যে। তাঁর সেই প্রবর্তিত ধারা পরবর্তীতে সচেতনভাবেও কেউ আত্মস্থ করতে পারেনি। অবশ্য যায়ও না করা। তবে নজরুলের শক্তি এবং স্বকীয়তার জায়গাটা বোদ্ধারা বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই। তাঁর পুরো জীবনটাই যেন এক অকৃত্রিম উচ্ছ্বাসে ভরপুর, কখনো তা বেদনায় উদ্বেলিত, কখনো অন্য আবেগে উদ্ভাসিত। বুদ্ধদেব বসু নজরুলকে মূল্যায়ন করছেন এভাবে:

> "বাংলা কাব্যের ইতিহাসে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পরে সবচেয়ে বড়ো কবিত্ব-শক্তি নজরুল ইসলামের। তিনি যখন সাহিত্যক্ষেত্রে এলেন তখন সত্যেন্দ্র দত্ত তাঁর খ্যাতির চূড়ায় অধিষ্ঠিত, সে-সময়ে তাঁর প্রভাব বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। নজরুলের রচনায় সত্যেন্দ্রীয় আমেজ ছিলো না তা নয় — কেনই বা থাকবে না, কিন্তু প্রথম থেকেই তিনি সুস্পষ্ট এবং প্রবলভাবে তাঁর স্বকীয়তা ঘোষণা করেছিলেন।" (বুদ্ধদেব, ২০১০: ১২৮)

সর্বোপরি বলা যায় নজরুল নিজেই এক স্বতন্ত্র কাব্যধারার প্রবর্তক এবং নিজেই এক যুগস্রষ্টা। এ কাব্যধারার মূল তত্ত্বের জায়গায় ছিলো ব্যক্তিমনের অকৃত্রিম আবেগ ও অবস্থা এবং প্রকরণে ছিলো সহজাত শব্দ এবং ছন্দ। বিদ্যমান খ্যাতিমান সাহিত্যিক এবং প্রতিষ্ঠিত পূর্বসূরিদের কাছ থেকে কিছু উপাদান নজরুল নিয়েছেন বটে কিন্তু নির্মাণ

করেছেন একান্তই তাঁর নিজস্ব ভুবন; যে ভুবন নতুন, একক এবং অনন্য। তাঁর ছিলো না কোনো খ্যাতির লোভ, ছিলো না কোনো আরোপিত চাপ; তিনি মুক্তমনে বিহার করা এক বিহঙ্গ। তাই তাঁর কলমের ধার দিয়ে বেরিয়ে এসেছে একের পর এক অকৃত্রিম লেখনী, যে লেখনীতে স্পষ্টভাবে ধরা দিয়েছে স্বচ্ছ, মুখোশহীন এক মানবাত্মা। যে আত্মায় প্রতিধ্বনিত হয় আবহমান কালের ব্যথিত মানুষের বঞ্চিত হৃদয়ের ধ্বনি। তাই নজরুল হয়ে উঠছেন যতটা না যুগমানব তারও চেয়ে বেশি সর্বকালীন মানব। ভেঙে গিয়েছে ভূখণ্ডের সীমানা, তাঁর বাণী হয়ে উঠেছে আপামর বিশ্বের সকল বঞ্চিত মানবের অব্যক্ত কথা। কালে কালে নজরুল টিকে থাকবেন তাঁর এই তত্ত্বভাররোহিত লেখনীর জন্য, যে লেখনী তাঁর কাল ছাপিয়ে হয়ে উঠেছে সর্বকালীন মানুষের আত্মিক কথকতার মুখপাত্র।

যবনিকা

সৃষ্টির মূল কথাই প্রেম। স্রষ্টাকে ভালোবাসলে যেমন মানুষকে ভালোবাসা যায় তেমনি মানুষকে ভালোবাসলেও সে ভালোবাসা স্রষ্টাতে গিয়েই পর্যবসিত হয়। সকল প্রাণকে ভালোবাসার যে অনুভূতি এটাই জগতের একমাত্র সত্য এবং চিরন্তন অনুভূতি। নজরুলের সকল কবিতা জুড়ে এই প্রেমের বাণীই ধ্বনিত। তিনি মাজলুম মানুষের বেদনায় কাতর হয়েছেন, বঞ্চিতের ব্যথাহত হৃদয় তাঁকে আহত করেছে জীবনভর। কলমের ক্ষুরধার লেখনীতে বেড়িয়ে এসেছে তাঁর ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের আর্তনাদ। সকল প্রাণের বেদনা যেমন তাঁকে আক্রান্ত করেছে তেমনি পুরুষ হিসেবে নারীর প্রেম তাঁকে আঘাত দিয়েছে। প্রেমে প্রশান্তির চেয়ে রক্তক্ষরণই পেয়েছেন বেশি তিনি। ফলে তাঁর প্রেমের কবিতার অধিকাংশই হয়ে উঠেছে বিরহী হৃদয়ের কণ্ঠস্বর। মানবীর প্রেম তাঁকে কাঁদিয়েছে এবং এই কান্না তাঁর জীবনজিজ্ঞাসাকে আরো বেশী শাণিত করেছে। শাণিত জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে খুঁজতে তাঁর প্রেম পৌঁছে গিয়েছে মানবী থেকে স্রষ্টায়। তাঁর শেষের দিকের কবিতাগুলোতে এ প্রবণতা বেশী।

প্রথম দিকের কবিতাগুলোতে তাঁর প্রেমের উচ্ছ্বাস, আবেগ, বেদনা খুব প্রকট আকারে ধরা দিয়েছে৷ তিনি প্রবল অভিমানী প্রেমিক, তবে প্রেমে আনন্দের চেয়ে বেদনার ভাগটাই যেন তিনি বেশি পেয়েছেন। নারীকে দেখেছেন একান্তই তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে৷ নারীকে যেমন মূল্যায়ন তিনি করেছেন তেমনি শব্দবাণে জর্জরিতও করেছেন। উপেক্ষা, ব্যথা-বেদনায় তিনি কখনো হয়েছেন ক্ষুব্ধ, কখনো হয়েছে ব্যথিত। সরল শিশুর সহজ আবেগের মতোই উচ্ছ্বাস, বেদনা, প্রতিবাদ সবই যেন সমান্তরালে এসেছে তাঁর প্রেমের কবিতায়। তাঁর সংবেদনশীল মনে যখন যে অনুভূতি এসেছে তার সৎ শব্দভাষ্যই যেন হয়ে উঠেছে কবিতাগুলো।

প্রেমিক নজরুলের এই প্রেম আর তার প্রকাশকে শাশ্বত মানবের প্রেমাবেগের মানদণ্ডে ফেলে অনায়াসেই পড়া যায়, ব্যাখ্যা করা যায়। ব্যক্তি নজরুলের অনুভূতিতে যেন বেজে

উঠেছে সর্বকালীন মানবমনের প্রেমানুভূতির ঝংকার। মানুষের মনের বহুবর্ণিল আবেগ খুব সহজেই ভাষা পেয়েছে নজরুলের শব্দে। বিরহ মনের মনের ক্লাসিক আবেগগুলোর মধ্যে অন্যতম, এর কোন স্থান নাই, কাল নাই, পাত্র নাই। নজরুলের বিরহের হাহাকার ধ্বনির মাঝে যেন হুহু করে বেজে ওঠে সর্বজনীন মনের এই ক্লাসিক আবেগটি। তাঁর শব্দে-কথায় আমরা ভাষা পাই আমাদের অনুভূতির। এই বিরহ নজরুলের অপ্রতিরোধ্য আত্মায় এসে হয়ে উঠেছে দুর্বার, মনকে ভাঙার বদলে করেছে আরো বেশি শক্তিশালী। 'শোক থেকে শক্তি'র পদযাত্রা যেন প্রেমে আমরা নজরুলের কাছ থেকেই দীক্ষা পাই।

বাংলা সাহিত্যে নজরুল বিরহের কবি হিসেবে স্মরিত হবেন দীর্ঘকাল। এই বিরহকে সুফিজমের ঘরানায় ফেলে পড়া যায় অনায়াসেই, ফেলা যায় বৈষ্ণব প্রেমতত্ত্বের ছাঁচেও। এই বিরহে তাঁর সাথে সঙ্গ দিয়েছে প্রকৃতি। আর সব রোমান্টিক কবিদের মতোই অসীম প্রকৃতির কোলে তিনি নিজের আশ্রয় খুঁজে পেয়েছেন। তিনি মানুষের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে একের পর এক আঘাত পেয়েছেন তখন তিনি প্রকৃতির কোলে নিজেকে দেখেছেন এবং প্রকৃতির প্রতীকেই তিনি তাঁর মনের গভীর বেদনাকে প্রকাশ করেছেন।

নজরুলের প্রেমিক সত্তাকে অনেকেই অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বের চোখে দেখেন কিন্তু প্রেমিক বলেই যে তিনি বিপ্লবী তা অনেকেই উপেক্ষাই যেন করেন। নজরুল তো এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আরেক হাতে রণতূর্য নিয়েই সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেছিলেন; তাঁর এক হাতকে বাদ দিয়ে আরেক হাতের মূল্যায়ন তো আংশিক মূল্যায়নই। পৃথিবীতে যতদিন মানুষ অন্যায়, অত্যাচার, অবিচারের সম্মুখীন হবে ততদিন তাঁর উচ্চকিত কণ্ঠের ন্যায় প্রতিষ্ঠার বাণী মন্ত্রের মতো করে উচ্চারিত হবে, পাশাপাশি যতদিন পৃথিবীতে মানব প্রবাহ অব্যাহত থাকবে এবং মানুষের বোধগম্য ভাষায় নজরুলের লেখনী থাকবে ততদিনই সংবেদনশীল প্রেমিক মনের বাণী হিসেবে তাঁর প্রেমের কবিতাগুলোও বন্দিত হতে থাকবে।

সমকালে হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্বে নজরুলকে পিষ্ট করা হলেও এখন চিন্তাশীল সংবেদী মন মাত্রেই বুঝতে পারে নজরুল মানুষ ছিলেন। যেখানে মানুষ আক্রান্ত হয়েছে সেখানেই তিনি উচ্চকিত হয়েছেন। স্থান-কাল-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষই ছিলো তাঁর আরাধনার বিষয়। এমন সহজাত, সৎ, স্বচ্ছ স্বভাবকবিকে মানুষ চিনতে ভুল করেনি; যদিও জীবদ্দশায় তিনি প্রাপ্যের তুলনায় অল্পই মূল্যায়িত হয়েছেন।

মানবজীবনের সার্থকতার মানদণ্ড যদি এই হয় যে পরবর্তী পৃথিবীর জন্য তিনি কতখানি প্রভাব রেখে যেতে পারেন তাহলে নজরুলজীবন সাধারণ পরিমাপের চেয়ে অনেকখানি বেশিই সার্থক। তাঁর জীবনাদর্শ এবং সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে তিনি নিশ্চয়ই মানবহৃদয়ে কালের পর কাল আসীন থাকবেন।

––●––●––●—

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

প্রাথমিক উৎস

১. নজরুল-রচনাবলি (প্রথম খণ্ড), ২০১২, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

২. নজরুল-রচনাবলি (দ্বিতীয় খণ্ড), ২০১৫, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৩. নজরুল-রচনাবলি (তৃতীয় খণ্ড), ২০১৫, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৪. নজরুল-রচনাবলি (চতুর্থ খণ্ড), ২০১৫, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৫. নজরুল-রচনাবলি (পঞ্চম খণ্ড), ২০১১, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৬. নজরুল-রচনাবলি (ষষ্ঠ খণ্ড), ২০১২, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

৭. নজরুল-রচনাবলি (নবম খণ্ড), ২০১৫, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

দ্বৈতীয়িক উৎস

অধ্যাপক এ. কে. এম. আমিনুল ইসলাম, ১৯৬৯, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি ও কাব্য, বুক স্টল, ঢাকা।

অরুণকুমার বসু, ২০১৯, নজরুল-জীবনী, আনন্দ পাবলিশার্স, কোলকাতা

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৯৫৯, রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

আজহারউদ্দীন খান, ১৯৯৭, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, সুপ্রিম পাবলিশার্স, কলকাতা।

আতাউর রহমান, ১৯৯৭, নজরুল কাব্যসমীক্ষা, শুভ্রা প্রকাশনী, ঢাকা।

আব্দুল মান্নান সৈয়দ, ২০১৬, নজরুল ইসলাম: কবি ও কবিতা, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পাদিত), ২০০১, কাজী নজরুল ইসলাম জন্মশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা।

আবদুল কাদির, ১৯৮৯, নজরুল প্রতিভার স্বরূপ, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, ২০১৬, যুগস্রষ্টা নজরুল, জোনাকী প্রকাশনী, ঢাকা।

গোলাম মুরশিদ, ২০২১, বিদ্রোহী রণক্লান্ত: নজরুল-জীবনী, প্রথমা, ঢাকা।

ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১৯, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

ড. আলী হোসেন চৌধুরী, ২০১০, নজরুল সৃষ্টিতে বাংলাদেশের মানুষ ও প্রকৃতি, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্ত, ১৯৯৭, নজরুল-চরিতমানস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

প্রণব চৌধুরী (সম্পাদিত), ২০০১, নজরুল: কবি ও কাব্য, লতিফ প্রিন্টিং প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ, ২০০৫, নজরুলমানস ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পাদিত), ২০১৬, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে (প্রথম খণ্ড), কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

বুদ্ধদেব বসু, ২০১০, কালের পুতুল, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা।

বেগম আকতার কামাল, ২০১৩, কবির চেতনা: চেতনার কথকতা, ধ্রুবপদ, ঢাকা।

মিনতি কুমার রায়, ২০১৬ সাহিত্য সমালোচনা তত্ত্ব, ভাষাপ্রকাশ, ঢাকা।

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পাদিত), ১৯৯১, নজরুল ইসলাম: নানা প্রসঙ্গ, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

মুহাম্মদ আব্দুল হাই, সৈয়দ আলী আহসান, ২০১৫, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।

মুহাম্মদ নূরুল হুদা (সম্পাদিত), ২০২২, বিদ্রোহী: শতবর্ষে শতদৃষ্টি, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মোবাশ্বের আলী, ১৯৬৯, নজরুল প্রতিভা, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (সম্পাদিত), ২০০০, নজরুল সমীক্ষণ, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, ১৯৬৯, নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।

যতীন সরকার, ২০১১, বাংলা কবিতার মূলধারা এবং নজরুল, রুক্কু শাহ্ ক্রিয়েটিভ পাবলিশার্স, ঢাকা।

রফিকুল ইসলাম, ২০০০, নজরুল প্রসঙ্গে, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

রাজিয়া সুলতানা, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, নজরুল-অন্বেষা (স্বরবর্ণ খণ্ড), মখ্দুমী অ্যান্ড আহ্সানউল্লাহ লাইব্রেরি, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

শাহাবুদ্দিন আহমদ, (সম্পাদিত), ১৯৯৫	নজরুলের পত্রাবলী নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।
সনজীদা খাতুন, ২০১৮,	নজরুল মানস, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা।
সনজীদা খাতুন, ২০২০,	শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, কথাপ্রকাশ, ঢাকা
সৈয়দ আকরম হোসেন, ১৯৮৫,	বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
হাবিবুর রহমান (সংকলন ও সম্পাদনা), ২০১৪	পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব: ধ্রুপদী ও আধুনিক, কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

<u>সমাপ্ত</u>